মূল্য : দশ টাকা

প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৩৫৮

প্রকাশক : প্রফুল্ল গ্রন্থাগারের পক্ষে শ্রীরথীন্দ্রকুমার নায়ক
৫।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট্, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট শিল্পী : সুনীল গুহ

মুদ্রাকর : গঙ্গা মুদ্রণ : শ্রীবিশ্বনাথ কবিরাজ
৫৪।১বি, শ্যামপুকুর স্ট্রীট্ : কলি-৪

মারকিন মুল্লুকে এক ধরনের গল্প উপন্যাস লেখা হয়—যার পাত্র-পাত্রীরা দুর্ধর্ষ, আদিম এবং অসামাজিক প্রকৃতির মানুষ। এগুলোকে বলা হয় 'ওয়েসটারন স্টোরিজ।' আমাদের দেশেও এমন মানুষ আছে। প্রেম-অপ্রেম ও জিঘাংসার দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত সেইসব মানুষদের কথা এই উপন্যাসে লেখা হয়েছে। তবে যেহেতু প্রেরণার উৎস 'ওয়েসটারন স্টোরিজ' সেইহেতু অনিবার্যত মৃদু ছায়াপাত রোধ করার প্রতি আমার স্বাভাবিক অনীহা ছিল। তা সত্ত্বেও মোটামুটিভাবে এ উপন্যাস আমার অভিজ্ঞতা ও কল্পনার ফসল। অধুনা এদেশে যা ঘটছে, তার সাথে মিলিয়ে নিলেই পাঠক বুঝবেন যে আমি তাঁদের জ্ঞানত ধোঁকা দেবার চেষ্টা করিনি।

লেখক

গৌরী মুখোপাধ্যায়
তপন মুখোপাধ্যায়
করকমলেষু

এই লেখকের

তৃণভূমি
বন্যা
নিশিমৃগয়া
নীলঘরের নটী
পিঞ্জর সোহাগিনী
জোয়ারের দিন
প্রেমের প্রথম পাঠ
নিশিলতা
কিংবদন্তীর নায়ক
জলতরঙ্গ
সবুজ নক্ষত্র
আসমানতারা
ছায়াপড়ে
বনকরবী
নিষিদ্ধ প্রান্তর
হিজলকন্যা
গোয়েন্দা কর্ণেল

এক

সেই একদিন আর আজ।

তেমনি ধূলিধূসর রাস্তা, রুক্ষ মাঠ, উন্মাদ ঝাঁঝাল বাতাস আর আকাশের বিশালতার সামনে নিজেকে তুচ্ছ লাগছে। তেমনি ভয়ঙ্কর গ্রীষ্মকাল। যখন জিভ শুকিয়ে খড়ের মতো লাগে, বুকে খিল ধরে যায়, মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। বারবার জল খেলেও গলার জ্বালা একটুও কমে না।

সব অবিকল তাই আছে। অন্তত তার মনে হচ্ছিল, বাইরে-বাইরে সবকিছু সেদিনের মতোই অবিকৃত। সেদিনও এই রাঙামাটির কাঁচা রাস্তাটার দুপাশে ছিল নিশিন্দাগাছের ঝোপঝাড়। দূর মাঠে দাঁড়িয়েছিল ওই বাজপড়া নেড়া তালগাছটাও। চারপাশের দিগন্তে মিশে থাকা অচেনা গ্রামগুলোর দিকে তাকিয়ে সেদিনও মনে হয়েছিল—তাহলে চারদিকে মানুষভরা পৃথিবীটা এখনও রয়েছে; নির্জনতায় নির্বাসন নয়—সামনে মানুষ আছে।

কিন্তু সেদিন সে আজকের মতো একা চলছিল না এ রাস্তায়। ছ্যাকড়া গরুর গাড়িটা তাকে বয়ে নিয়ে যেতে পারত, কিন্তু সে পায়ে হেঁটেই যাচ্ছিল পাশে-পাশে। গাড়িতে ছিলেন তার বাবা আর মা। উৎকট গরমে মায়ের অসুখটা এই ভয়ঙ্কর মাঠের মাঝামাঝি এসে হঠাৎ খুব বেড়ে গিয়েছিল। বাবা ছইয়ের সামনে কথা বলতে বলতে আসছিলেন। বাবার ওই স্বভাব। কথা বলতে থাকলে বাবা সবকিছু ভুলে যান। তাই পিছনে তাঁর রুগ্না স্ত্রীর দিকে খেয়াল ছিল না। তার ফলে···

অবশ্য খেয়াল থাকলেও কি কিছু লাভ হত? মা কি বাঁচতেন? মোটেও না। তাঁর সময় হয়ে এসেছিল, তিনি বুঝতে পারেন নি।··উঁহু, হয়তো বুঝেছিলেন। তা না হলে আগের দিন বিকেলে যখন সব বাঁধাছাদা হচ্ছিল, তিনি স্বামীকে কেন জিগ্যেস করেছিলেন যে ওখান থেকে গঙ্গা কতদূর? কেন তিনি তার আগেও অনেকবার স্বামীর আপত্তিতে কান দেননি? আড়াল থেকে সে শুনেছিল, মা কেঁদে-কেটে বলছেন—কোনদিন কোন একটা রাত্তিরও

কি আমি তোমার পাশটি ছাড়া শুয়েছি? বল, কখনও পরস্পর দূরে থেকেছি আমরা? এ আমার ইচ্ছে, মরার সময় তোমার কোলে মাথা রেখে যেন মরতে পারি। ওগো দোহায় তোমার, এ ইচ্ছেয় বাদ সেধো না! তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে রেখে তুমি যেও না।

বাবা বিরক্ত হয়েছিল। তাঁর আপত্তির যুক্তি ছিল। রাহুলের ফাইনাল পরীক্ষা তখন সামনে। ওই নতুন জায়গায় গেলে পড়াশুনার গোলমাল হবে—শুধু তা নয়, ওই নতুন পাণ্ডববর্জিত দুর্গম এলাকায় আদতে কোন হাইস্কুল নেই। কাজেই রাহুলের কী হবে? তুমি গেলে, ও থাকবে কোথায়? খাবে কার কাছে? ওর কেরিয়ারটা তুমি মা হয়ে নষ্ট করতে চাও?

মা তবু শোনেননি। আজ ভাবতে অবাক লাগে, মায়ের মাথায় সেদিন কি দারুণ জেদ চেপেছিল স্বামীর সঙ্গে থাকার। বাবা ও রাহুল দুজনেই ভেবেছিল, অনেকদিন অসুখে ভুগে মায়ের মাথাটা কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেছে। গতিক দেখে রাহুল সব মিটিয়ে ফেলল। সে বলেছিল, কিচ্ছু অসুবিধে হবে না। সে দিব্যি রাঁধতে পারবে। ও অভ্যাস তো তার আছেই। গরীব সংসারে রাঁধুনী রাখবারও ক্ষমতা নেই। বাবা সামান্য প্রাইমারি শিক্ষক—কাজেই দুবেলা একগুচ্ছের টিউশানি না করলে চলেই না। হয়তো চলত কোনরকমে। কিন্তু মায়ের অসুখের ওযুধ-বিষুধ, রাহুলের পড়ার খরচ —এত সব চালাতে একজন প্রাইমারি শিক্ষকের মাইনেতে কুলোয় না। যাই হোক, শেষ অব্দি দেখা গেল জেদটা মায়ের চেয়ে রাহুলেরই বেশি। মা বাবার সঙ্গে চলুন, সে একাই থাকবে। আর তাই শুনে মা ছলছল চোখে তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। বলেছিলেন, নিজের পায়ে দাঁড়াবার শিক্ষা পাবে বাবা। যদি মন খারাপ করে, মাঝে মাঝে গিয়া দেখে এসো। ছুটি পেলে উনিও আসবেন।

সন্ধ্যার ট্রেনে যাত্রা হবে স্থরু। হঠাৎ মা বলেছিলেন, বরং ও আমাদের পৌছে দিয়ে আস্থক না গো! কী বলো তুমি? জায়গাটা ওর চেনা হবে। তাছাড়া······

বাকি কথাটা বলেন নি মা। তাছাড়া আর কী হবে, জানতেও চায়নি বাবা আর ছেলে। আজ মনে হচ্ছে, কথাটা অনুমান করা উচিত ছিল। আজ মায়ের সেই অনুক্ত কথাটা টের পাচ্ছে রাহুল। মা জানতে পেরেছিলেন, হয়তো পথের মাঝেই মরণ এসে হাত ধরে বলবে, চলো। তাই যেমন স্বামীর সঙ্গ ছাড়তে চাননি, তেমনি ছেলেকেও শেষ মুহূর্তে পৌছে দিয়ে আসতে বলেছিলেন।

এই জায়গাটাতেই কি? বাবা দূরের দিকে তাকাতে তাকাতে বলেছিলেন,

কি ভয়ঙ্কর তেপান্তরে মাঠ রে বাবা ! মনে হচ্ছে যেন নির্বাসনে চলেছি জন-মানুষহীন কোন দেশে। রাহুল, তুমি কি বলো ? মনে হচ্ছে না তোমার ?

রাহুল তখন কী ভাবছিল, মনে পড়ে না আজ। বাবার পরের কথাটা আজও কিন্তু ভোলেনি। কারণ, কথাটা ছিল বেশ তাৎপর্যময়। বাবা পরক্ষণে বলেছিলেন, ছাখো, যেখানেই যাও—যত রাগ করে তুমি যত দূরেই যাও, মানুষকে ফেলে কোথাও হয়তো যাওয়া যায় না। আর গেলেও মানুষের ওপর রাগটা আর থাকে না। তখন মানুষকেই মনে হয় একমাত্র আশ্রয়। কোন গাছ নয়, পাহাড়ের গুহা নয়—মানুষই মানুষের অন্তিম আশ্রয়। …তারপর একটুখানি চুপ করে থেকে বলেছিলেন, মানুষের কাছে সারাজীবন অনেক দুঃখ পেয়েছি, রাহুল। মানুষ নামটা সময়ে-সময়ে আমায় প্রচণ্ড ঘেন্না ধরিয়ে দিয়েছে। মানুষের কাছে প্রবঞ্চনা আর আঘাতের যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে যেয়েই তো আজ দূরে পালিয়ে যাচ্ছি—অথচ রাহুল, ছাখো যাচ্ছি কোথায় ? না—মানুষেরই কাছে।

বাবা অস্ফুট হেসেছিলেন। ফের বলেছিলেন, অথচ এমন যদি হত যে এই রাস্তাটার শেষে কোন জনপদ নেই, তাহলে ? এই কথাটাই ভাবছিলাম, রাহুল। চারদিকটা ছাখো—ধু-ধু দিগন্তজোড়া প্রান্তর বললেই চলে। কোথাও জল নেই এ গ্রীষ্মে। কোথাও কেউ নেই। হঠাৎ নিজেকে এখানে দেখে ভয়ে বুক টিপ-টিপ করে ওঠে। কিন্তু দূরে ওই ধোঁয়াটে গ্রামগুলোর দিকে তাকালে মনে জোর বাড়ে। বুঝতে পারা যায়, ওখানে আশ্রয় আছে আমার। কারণ মানুষ আছে।……

আজ দশবছর পরে সেই একই রাস্তায় হাঁটছে রাহুল। সময়টাও গ্রীষ্ম। সেই দিনের মতো আজও এখানে নিজেকে দেখে সন্ত্রাসে বুক কেঁপে ওঠে, পরক্ষণে দূরের জনপদরেখা লক্ষ্য করে মনে জোর যায় বেড়ে।

আজ সে একা। পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। একটা সাইকেল যোগাড় করে নিলেও পারত সে—কিন্তু ফেরাটা অনিশ্চিত বলে কারো কাছে সাইকেল চেয়ে নেয়নি। ধুলোয়-ধুলোয় রাঙা হয়ে গেছে কাবুলী চপ্পল, প্যান্টটাও হাঁটু-অব্দি রেঙে গেছে। কাঁধে ঝোলা আর হ্যাভারস্যাক। হ্যাভারস্যাকটা বুদ্ধি করেই সে চেয়ে এনেছে এক বন্ধুর কাছে। বন্ধুটি বলেছে, বরং তোকে ওটা প্রেজেন্ট করলুম, রাহুল। বড়দা সেকেণ্ড গ্রেটওয়ারে মিলিটারিতে চাকরী করতেন—সেই আমলের জিনিস। খাঁটি বিলিতি। আজকাল এমন জিনিস আর কোথাও পাবি না।

হ্যাভারস্যাকের জল বুঝি শেষ হয়ে এল। রাঢ়বাংলার এই এলাকাটার

ভূ-প্রকৃতি ও পরিবেশ তার জানা। এই গ্রীষ্মের দিনে এদিকে পা বাড়ালে• সঙ্গে জল ছাড়া চলে না, সে আগেরবারই টের পেয়েছিল। শুধু একটা ব্যাপারে এখন তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। রোদ! দারুণ ঝাঁঝাল গনগনে রোদ! বাতাস বইছে উদ্দাম হু হু। কিন্তু বাতাসে রোদের তাপ প্রচণ্ড। আর ঘাম হচ্ছে না গায়ে। ফোস্কা পড়ছে খোলা জায়গাগুলোয়। গলার চামড়ায় নুন জমে রয়েছে। মাথায় চাপানো ময়লা লুঙিটা আর উত্তাপ থেকে রক্ষা করতে পারছে না। মাঝে মাঝে হঠাৎ তার হৃদপিণ্ড ধুক-ধুক করে উঠছে—সে পৌঁছতে পারবে তো? পথে যদি হঠাৎ তার মায়ের মতো—

থমকে দাঁড়াল রাহুল। সে জায়গাটা আর কতদূরে, যেখানে বাবা কথা বলতে বলতে হঠাৎ ঘুরে স্ত্রীকে মৃতা আবিষ্কার করেছিলেন। চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, রমা রমা! রাহুল, তোর মা হয়তো নেই।

বোঝা যাচ্ছে না। রাস্তার ধারে কোন গাছ নেই—ছিল না। কিন্তু দূরের ধূসর-গ্রাম রেখাটা চেনা যাচ্ছে। ওখানেই একটা ছোট্ট নদী আছে। সেই নদীর ধারেই অবশেষে দাহ হয়েছিল মায়ের। গ্রামের লোকগুলো ছিল অন্ত্যজ শ্রেণীর—চাষাভূষো-বাগদী-কুনাই তারা। খুবই গরীব। তাদের কাছেই জানা গিয়েছিল, পরের গ্রামটাও তাদের মতো ছোটলোক-টোটলোক গরীব মানুষের বসতি। রুক্ষ শুকনো পাথুরে মাটি, ফসল ফলে খুব সামান্যই। আর সম্বল বলতে ওই সরু নদীটা। বর্ষার পর দুটো মাস তারই দানে ওরা বেঁচে থাকে। বাবু ভদ্রলোক-বড়লোকের গ্রাম বলতে ওখান থেকে আর ছ মাইল দূরে সেই ময়নাচক। গরুর গাড়ি পৌঁছতে সন্ধ্যা পেরিয়ে যাবে। রাস্তাঘাট তো ভালো নয় মোটে।

তখন বাবা এক অদ্ভুত কাজ করে বসলেন। বললেন, রাহুল, বাবা, তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। বুঝতে পারছ তো অবস্থাটা? এরা যদি এখানে সাহায্য করে, তাহালে নদীর ধারেই তোমার মাকে—

রাহুলের ইচ্ছে করছিল, সে লাফিয়ে বাবার ঠোঁটদুটো চেপে ধরে। তার শুকনো ক্লান্ত বুকটা ফেটে যাবে মনে হচ্ছিল। কেন আর কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরতে পারছেন না বাবা? মায়ের মৃতদেহটা কি এত ভারি হয়ে উঠেছে? নাকি স্ত্রীর প্রতি তাঁর উত্তাল ভালবাসাই তাঁকে মৃত স্ত্রীর সঙ্গবাসে অস্থির করে ফেলেছে?

তখন তার বয়স সত্যি কম। আজ দশবছরে সে অনেক দেখেছে, জেনেছে, বুঝেছে এ পৃথিবীকে। মানুষ ও তার সমাজের সব সত্যই সে টের পেয়েছে।

তাই তার আজ এ পথে পাড়ি দেওয়া। কিন্তু সেদিন কিছু তলিয়ে বোঝেনি।

তার শুধু মনে হয়েছিল যে বাবার এ আচরণে কিছু উৎকট ধরনের অসঙ্গতি রয়ে গেছে। এ যেন চুপি চুপি কাকেও খুন করে পালিয়ে যাওয়া! বাবা শাস্ত্র-টাস্ত্র আচার-বিচার মানবার মতো মানুষ নন সেটা ঠিকই। বরং, হয়তো বা সারা জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলেই মানুষ সম্পর্কে সংশয়ী শুধু নয়, ঈশ্বরেও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন। নিজের নাস্তিক্যের বিষয়ে বাবার খুব গর্বও রয়েছে। বিজ্ঞান এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্পর্কে তাঁর আস্থাও ভারি দৃঢ়। তাঁকে রাহুলের যুক্তিবাদী মানুষ বলেই মনে হয়। তা সত্ত্বেও কোন মানুষের পক্ষে ওই আচরণ কি সম্ভব ছিল? অন্য কেউ নয়—নিজের স্ত্রী! স্ত্রীর মৃতদেহ।

সেই ছোট্ট গাঁয়ের গরীব লোকগুলো ভারি সরল আর উৎসাহী। তাদের পরোপকারী মনোবৃত্তি লক্ষ্য করে অবাক হয়েছিল রাহুল। নদীর ধারে তাদের নির্দিষ্ট শ্মশানেই দাহ করা হল মাকে। বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল সেদিন। ময়নাচকে পৌঁছতে রাত দুপুর হয়েছিল। তখন আরেক সমস্যা। কেই বা ভবানীবাবুর বাড়ী দেখিয়ে দেবে তখন? সারা গ্রাম নিঃঝুম ঘুমন্ত।·····

সেদিন তো ভুলে গিয়েছিল মায়ের মুখে শোনা প্রশ্নটা—ওখান থেকে গঙ্গা কতদূর গো? বাবাও কি ভুলে গিয়েছিলেন?

এই মুহূর্তে মায়ের প্রশ্নটা তীব্র হয়ে বাজছে কানের কাছে। যত হাঁটছে, তার মনে হচ্ছে, গঙ্গা কতদূর? আঃ, গ্রীষ্মের দুরন্ত দহন-জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে তৃষ্ণার্ত মুমূর্ষু মা হয়তো গঙ্গার কথাটা ভাবছিলেন। গঙ্গা! স্নিগ্ধ-সুন্দর কালোজলের অপ্রমেয় শান্তি—সে নদী হয়ে বয়ে চলেছে। তাদের গ্রামের নিচেই বয়ে যাচ্ছে সে। অনন্ত আরাম প্রবাহিনী সে। তাকে ফেলে স্বামীর সঙ্গে চলে যেতে হয়েছিল মাকে। কেন? তবে এ প্রশ্ন এখন থাক। এ রহস্যের কিছু জানা হয়তো যাবে না। কিন্তু শুধু ভাবতে হাতদুটো মুঠো হয়ে যাচ্ছে রাহুলের, মা মৃত্যুর মুহূর্তে—চেতনা ফুরিয়ে যেতে যেতে হয়তো চোখের সামনে দেখেছিলেন স্বপ্নের মধ্যে শান্তির প্রতিমা প্রবাহিনী গঙ্গাকেই। আর কাকেও নয়—না স্বামীকে, না ছেলেকে।

গঙ্গা!···হঠাৎ আরেকটা দৃশ্য ভেসে এল রাহুলের সামনে। ভেসে এল আরেক গঙ্গা। ময়নাচকের ভবানীবাবুর মেয়ে গঙ্গা।

কী আশ্চর্য ! গঙ্গার কথা তো তার আসবার সময় মনেও ছিল না। সারা পথও মনে পড়েনি তাকে। সে কি এখনও ওখানে আছে, নাকি অন্য কোথাও গেছে ? থাকা তো উচিতই—অল্পবয়সে বিধবা হয়েছে যে, মোটামুটি বড়লোকের ঘরের মেয়ে—যাবে আর কোথায় ? ওই সব গ্রামে বিধবা বিয়ের সম্ভাবনাও আশা করা বৃথা। সে ঠিকই আছে। আর এই দশটা বছরের পর সে আরও বড় হয়েছে। আরও বুদ্ধিমতী হয়েছে। সে চঞ্চল ছটফটে স্বভাবটাও নিশ্চয় এখন নেই। রাহুল অনুমান করেছিল, তখন তার বয়স বড়জোর ষোল—তার নিজের বয়সী। এখন তাহলে সে ছাব্বিশ। পূর্ণ যুবতী গঙ্গাকে সে দেখে কি আজ খুবই খুশি হবে সেবারের মতো ?

নিজের মনের মুখোমুখি হল রাহুল। সত্যিকার-প্রেম-ভালবাসা যা পুরুষ ও মেয়ের জীবনে একটা সময়ে ভারি জরুরী, যা যৌবনের বিশাল অগ্নিকুণ্ডে স্বতস্ক্রিয় হাপরের মতো বাতাস জোগায়—তা কি গঙ্গা ও রাহুলের মধ্যে দেখা দিয়েছিল সেদিন ? সমবয়সী দুজন কিশোর-কিশোরী ছিল তারা। ঐ সময়টা মোটেও অনুকূল ছিল না প্রেম-ভালবাসার পক্ষে। অথচ কী একটা ঘটে গিয়েছিল। একটা নিষ্ঠুর টান যেন দুজনকে বারবার কাছাকাছি হতে বাধ্য করেছিল। আর টের পাওয়া যাচ্ছে যে সেটা ছিল নিছক প্রকৃতির ষড়যন্ত্র। সেটা ছিল ভীতু বোকা-বোকা আড়ষ্ট যৌনতা মাত্র। সুযোগ যদিও বা ছিল নিরঙ্কুশ, তাকে কেউই চমৎকারভাবে ব্যবহার করতে পারেনি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই ঘরে দুজনে পাশাপাশি শুয়ে থাকলেও কেউ এসে পড়ার সম্ভাবনা ছিল না। আর টানটা ছিল গঙ্গারই বেশি। সে উত্ত্যক্ত করে মারত রাহুলকে। নখে আঁচড়াত। কামড়াত। রাহুলের মতো ছেলেকেও সে ভয় পাইয়ে দিতে পারত।

কিন্তু একটা পাপবোধ আচ্ছন্ন করে ফেলত রাহুলকে। হ্যাঁ—মাত্র রাহুলকেই। গঙ্গা যেন কিছুরই পরোয়া করে না। বড়লোক বাবার একমাত্র মেয়ে। মা নেই। ছেলেবেলায় মারা গেছে। তার মা মারা যাবার আগেই—গঙ্গার বয়স তখন সাত, রোগশয্যায় শুয়ে মেয়ের বিয়ে দেখে যেতে চেয়েছিল। কীর্তিচকের উকিল সত্যনারায়ণ বাবুর স্ত্রী ছিল গঙ্গার মায়ের সই—একই গাঁয়ের মেয়ে ছিল তারা। ছেলেবেলাতেই একঘড়া গঙ্গার জল ছুঁয়ে দুই সই দিব্যি করেছিল যে যদি তাদের ছেলেমেয়ে হয়, তাদের বিয়ে দেবে, আর যদি দুজনেরই ছেলে বা মেয়ে হয়—তাদের মধ্যে বন্ধুতা থাকবে। গঙ্গাকে বুঝতে পারলে তার মাকেও নাকি বোঝা যায়। জেদী বেপরোয়া একরোখা মেয়ে ছিল

গঙ্গার মা। আর গঙ্গা ফিক করে হেসে চাপাস্বরে বলেছিল, এই, জানো? আমার বাবা স্ত্রৈণ। রাহুল বলেছিল, স্ত্রৈণ মানে? গঙ্গা অবাক! সে কি গো! তুমি স্ত্রৈণ মানে জানো না? তুমি না উঁচু ক্লাশে পড়ো! হুঁঃ, আমি তো সেই পাঠশালা বাদে আর যা পড়েছি, তা বাড়িতে মাষ্টারের কাছে—আমি কথাটার মানে জানি, তুমি জানো না?···রাহুল লজ্জায় পড়ে গিয়েছিল। আর, আর একদিন কী কথায় গঙ্গা হঠাৎ তাকে বলে ফেলেছিল, এই! তুমি বড্ড স্ত্রৈণ। তখন থেকে বলছি—আমার আজ কিচ্ছু ভাল লাগে না, তবু তুমি সঙ্গ ছাড়ছ না!·· রাহুল শুধু লজ্জা নয়—রাগে দুঃখে অস্থির হয়ে চলে এসেছিল। গঙ্গা হঠাৎ অকারণ এমনি করে আঘাত করে বসত তাকে। গঙ্গার যেন কোন দুঃখ নেই। কোন হতাশা নেই। সে নির্বিকার। সে জানত, আর তার বিয়ে হবে না। কোন পুরুষকে সে এ জীবনে পাশে পাবে না। তবু তার কোন ভাবনা নেই।

একমাস মাত্র রাহুল ওখানে ছিল। তারপর তাকে চলে আসতে হয়েছিল। আসবার সময় গঙ্গা তাকে বলেছিল, আবার এসো কিন্তু। আসবে তো? আমার বড্ড খারাপ লাগছে। ছাই, কেন যে তোমার সঙ্গে মিশেছিলুম! আর শোন, চিঠি-টিঠি লিখো না কিন্তু। আমি বিধবা। ঢি ঢি পড়ে যাবে চাদ্দিকে।

রাহুল বলেছিল, লিখবো না।

হঠাৎ গঙ্গা তার হাতটা ধরে বলেছিল, তুমি তো কিছু বলছ না?

কী বলব?

আমাকে তোমার কেমন লাগল, শুনি? ভাল, না মন্দ? তেঁতো না মিষ্টি?

রাহুল একটু হেসে বলেছিল, উঁহু বড্ড ঝাল!

শুনে গঙ্গার সে কী হাসি!···ও মা গো! আমি ঝাল! কিসের ঝাল শুনি? ধানী লঙ্কার তো! গলাবুক জ্বালা করছে বুঝি!

হাসতে হাসতে ওর চোখে জল এসে গিয়েছিল। একটু পরে তার মুখের রঙ বদলে যেতে দেখেছিল রাহুল। গঙ্গা বলেছিল, তুমি বড্ড কম কথা বলো। যাক্ গে, শোন। আমি আবার খুব একলা হয়ে গেলুম।···আচ্ছা, এসো। তোমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।

সে চলে গিয়েছিল। বাবার নতুন বাসা—একতালা পুরনো ঘরের বারান্দায় উঁকি মেরে রাহুল দেখেছিল, গঙ্গা আগাছার জঙ্গলে ভরা ধ্বংসস্তূপের

ভিতর দিয়ে হনহন করে চলে যাচ্ছে। বাবা তখন বাইরে ছিলেন। ভবানীবাবুর সঙ্গে মাঠের দিকে বেরিয়েছিলেন। বাবার সময় ছিল না, তাকে বিদায় দেবার। বলে গিয়েছিলেন, ঘরের চাবিটা গঙ্গার কাছে রেখে যাস। রাস্তার মাটিকাটার জরীপ আছে কিছু—কাল সন্ধ্যা অব্দি শেষ করা যায়নি। আমি চললুম। কেমন? অসুবিধে হবে না তো?···

গঙ্গাকে চাবিটা দেবে বলেই ডেকেছিল, অথচ গঙ্গা হুট করে চলে গেছে। তাই ফের যেতে হয়েছিল তার কাছে। গঙ্গা নির্বিকার মুখে হাত বাড়িয়ে চাবিটা নিয়েছিল। আর একটিও কথা বলে নি। সে স্থির মৌন দাঁড়িয়ে থেকেছে।

তারপর যতদূর গেছে রাহুল, তার মনে হয়েছে গঙ্গা যেন তখনও দাঁড়িয়ে আছে। কষ্টটা তখনই এসেছিল মনে। যেন গঙ্গাকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে এল সে। সারাজীবন সে দাঁড়িয়ে রইল অমনি করে।

আর এই দুঃখময় অনুভূতিই কি প্রেম? কিন্তু তখন সে কিশোর। দেহের তীব্রতাটা নিয়েই সে ছিল ভাবিত, মনের তীব্রতা সে স্পষ্ট টের পায় নি। গঙ্গা তার অপরিণত ষোলবছরের শরীরে একটা জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল—সে জ্বালা শরীর ঘুরে-ঘুরে একদা একসময় নিভে গেল। মন ছিল আরও দূরে—আগুনের নাগালের বাইরে। মনে একটুও আঁচ লাগে নি।······

হ্যাভারস্যাকের ছিপি খুলে ঢকঢক করে জল খেল রাহুল! চোখ দুটো জ্বালা করছে। একটা গগলস থাকলে এত ভালো হত! সামনে-পিছনে দু'পাশে শস্যহীন ঢেউখেলানো ধুধু মাঠ আগুনে পুড়ে যেন ধোঁয়া বেরুচ্ছে। এত ক্লান্তি এত কষ্টের বিনিময়ে শুধু কিছু টাকা পাবার আশা আছে বলে এতক্ষণ উৎসাহী ছিল সে। কিন্তু এখন গঙ্গার কথা মনে পড়ে গেলে সে দেখল, টাকা পাওয়াটা খুবই তুচ্ছ লাগছে। একটু করে চঞ্চলতা তার মধ্যে জেগে উঠছিল। গঙ্গা আছে, গঙ্গা! আজ গিয়ে তাকে দেখবে যুবতী হয়ে উঠেছে। সম্ভবত আরো সুন্দর আরোও মারাত্মক হয়ে উঠেছে সে। কিন্তু এখনও কি সে তেমনি আছে আর? তেমনি উদ্দাম, বেপরোয়া আর দেহের দিকে অতি-সাহসিকা? সে-বয়সে নিজের নারীদেহের গুরুতর পরিণতি নিয়ে গঙ্গা একটুও উদ্বিগ্ন ছিল না যেন। আজ অবশ্যই তার পক্ষে এটা সম্ভব নয়। আজ নিশ্চয় সে জেনেছে যে, তার দুরন্ত মনের তৃষ্ণার কাছে ওই দেহটাই ভীষণ বৈরী। নিজের রক্তমাংসের অস্তিত্ব আজ তার সামনে দিকরোধকারী বিশাল পাহাড়। দুর্গে নিঃসঙ্গ বন্দিনীর মতো তার আজ কালযাপন!

গঙ্গার জন্যে আশ্চর্য সমবেদনায় অভিভূত হল রাহুল। তাকে দেখবার চেষ্টা করল। শ্যামবর্ণা ছিপছিপে অথচ নিটোল শরীর—ঢুটি টানা উজ্জ্বল চোখ, ডিমালো মুখ। ওর চেহারা দেখে রাহুলের মনে পড়ে যেত ইতিহাস বইতে দেখা অজন্তা গুহাচিত্রের সেই মা ও মেয়ে ভিখারিনীর কথা। গঙ্গার সঙ্গে সেই মায়ের চেহারার আশ্চর্য মিল! রাহুলের রঙটা বেশ ফরসা। গঙ্গা তার হাতে নিজের হাতটা মিশিয়ে বলত, ছ্যাঃ, আমি কী কালো দেখছ? রাহুল সান্ত্বনা দিয়ে বলত, না—তুমি ঠিক কালো নও তো। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। ওই রঙটাই তো ভালো! আমি যদি তোমার মতো রঙ পেতুম, খুব ভাল লাগত। গঙ্গা বলত, যাও। তোমার শুধু মনরাখা কথা।......

সেই গঙ্গা! তাকে কেমন করে ভুলে গিয়েছিল রাহুল? আউট অফ সাইট, আউট অফ মাইণ্ড, কথাটা তাহলে মিথ্যা নয়।

কিংবা আসলে সেটাও তুচ্ছ—রাহুলের জীবনে পরবর্তী ঘটনাগুলোই এই বিস্মৃতির জন্যে দায়ী।

কলেজে পড়তে পড়তে হঠাৎ পড়া ছেড়ে দিতে হল। বাবা আর এলেন না, সেই যে গেলেন। মাঝেমাঝে চিঠি লিখতেন—কিছু টাকা পয়সা পাঠাতেন। রাহুল কোন চিঠির জবাব দিত, কোনটার দিত না। সে টের পাচ্ছিল, বাবা যেন আস্তে আস্তে অন্য মানুষ হয়ে উঠছেন। একটা আবছা দূরত্বের স্পর্শ অনুভব করত রাহুল। ঢুঃখ বা অভিমান? হয়তো পেত—হয়তো পেত না। ততদিনে তার জীবনেও একটা পরিবর্তন স্বরু হয়েছিল। সেই পরিবর্তন একসময় নাটকীয়ভাবে তাকে অন্য চরিত্রের ভূমিকা দিল। এই ভূমিকার সঙ্গে সে এখন একাকার। তার বাইরে নিজের কোন অস্তিত্বই খুঁজে পেতে কষ্ট হয় মাঝে মাঝে।

বহরমপুরে আজ তার একটা তীব্রধরনের পরিচিতি আছে। কলেজে পড়ার সময় সেই যে নিজের গ্রাম ছেড়ে তাকে এই শহরে যেতে হয়েছিল। তখন থেকে গ্রামের ভিটেটা পোড়ো হয়ে গেছে। বহরমপুরেই বাস করছিল সে। কুখ্যাত নেপাল দাস—নেপো গুণ্ডার ডান হাত হয়ে উঠেছিল রাহুল। সে এক বিচিত্র উত্তেজনায় ভরা জীবন! আজ রাহুল আর সে-রাহুল নয়—কুখ্যাত 'রাহুল' গুণ্ডা। বার ঢুই ছোটখাটো জেল খেটেছে সে। তার ঢুর্দান্ত স্বভাব আরও ঢুর্দান্ত হয়েছে দিনে দিনে। জেল থেকে বেরিয়ে শুনেছিল, তার নেপালদা খুন হয়ে গেছে পুলিশের গুলিতে। বন্ধুরা কেউ জেলে, কেউ ফেরার। সে অসহায় হয়ে পড়ল। দাঁড়াবার জায়গা নেই কোথাও।

কেউ তাকে আশ্রয় দিতে চাইবে না। অগত্যা গ্রামে ফিরতে চেয়েছিল। একেবারে নিঃস্ব তখন সে। চা খাবার পয়সাও নেই। টাকা পয়সা যা কিছু ছিল, তা নেপালদার হাতে। ক্লান্ত শরীরে সে যখন ব্রীজ পেরোচ্ছে, হঠাৎ একটা আশ্চর্য যোগাযোগ ঘটে গেল। একটা জীপ যেতে যেতে থেমেছিল তার পাশে। আই.বি.র বড়কর্তা রাজেনবাবুর সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। রাজীববাবু তাকে ডেকেছিলেন—রাহুল না ?···

ঘটে গেল এই অদ্ভুত যোগাযোগ। রাহুলকে ময়নাচকের পথে পাড়ি দিতে হল। দায়িত্বটা গুরুতর। এর যে কোন পরিণতি ঘটতে পারে। মৃত্যুর যন্ত্রণা কিংবা জীবনের আনন্দ। মাঝামাঝি কোন পরিণতি কল্পনা করা যায় না এ কাজে। রাজেনবাবু বলেছেন, এ তুমিই পারবে। কারণ, আফটার অল—তুমি শিক্ষিত ছেলে, বুদ্ধিমান। তা ছাড়া সেবার ঝেণ্টুর মাগলিং র‍্যাকেট ভাঙতে যে সাহায্য তুমি করেছিলে, তা আর কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। কাজেই—এক্ষুনি তৈরি হও। মাইণ্ড দ্যাট, কাজ শেষ হলেই তুমি নগদ পাঁচ হাজার টাকা পেয়ে যাচ্ছ। তখন একটা ছোটখাট ব্যবসা করে সৎভাবে বাঁচার চেষ্টা করতে পারবে। আমি তোমাকে সাহায্য করব—আই এ্যাসিওর।······

রাজেনবাবু জানতেন, রাহুলের বাবা ময়নাচকে আছেন। রাহুলের সব ইতিহাসই তাঁর নখদর্পণে। কলেজে পড়ার সময় গুণ্ডামিতে রাহুল রপ্ত হয়ে গেলে বাবা তার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করেছিলেন—অবশ্য সেটা চিঠিতেই। বাবার কাছে তার কীর্তিকলাপের খবর কে নিয়মিত পৌঁছে দিত কে জানে! এটাও রহস্যময় ব্যাপার। আজ বাবার কাছেই সে আশ্রয় নেবে। নিতে হবে তাকে। কারণ, কাজটা কতদিনে শেষ করা যাবে—কিছু ঠিক নেই। বাবা তাকে আশ্রয় না দিলে কিন্তু সব প্ল্যান ভেস্তে যাবে। ময়নাচকে সে থাকবে কোন অছিলায় ?······

মাঝে মাঝে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে রাহুল। বাবা তার আবেগবিহ্বল অপরাধ-ক্ষমা-চাওয়া লম্বা চিঠিটা পেয়েছেন তো ? যদি না পেয়ে থাকেন। এইসব অজ পাড়াগাঁয়ে চিঠি পৌঁছতে এখনও অনেক বেশি সময় লেগে যায়। এই এলাকায় সরকারী উন্নয়নের কাজ খুব দ্রুত হয়নি। অশিক্ষিত চাষাভূষো মানুষের সংখ্যাই বেশি। দশ বছর আগে একটা হাইওয়ে বানানো হচ্ছিল। ময়নাচকের ভবানীবাবু তার পাঁচ মাইলের কণ্ট্রাক্ট নিয়েছিলেন। ভবানীবাবুর সঙ্গে কী সূত্রে পরিচয় ছিল বাবার। তার একজন বিশ্বস্ত লোক দরকার

ছিল। ভাল মাইনে ও থাকার জায়গা পাওয়া যাবে। বাবা সঙ্গে সঙ্গে চাকরী ছেড়ে ময়নাচকে চলে গিয়েছিলেন।

রাহুল একটু হেসে ভাবল, চিঠি না পেলেও—বাবা ইজ বাবা। ছেলেকে কি মুখের ওপর তাড়িয়ে দিতে পারবেন? রাহুল তাঁর পা জড়িয়ে ধরবে। কান্নাকাটি করবে। বলবে যে সে জেল থেকে বেরিয়ে পুরো সৎমানুষ হয়ে গেছে! আর পাপের ছায়াটিও মাড়াবে না। বাবা তাকে এবার ইচ্ছেমতো নিজের পথে চালান। তা ছাড়া বাবারও বয়স হয়েছে—একজন দেখাশোনার লোক দরকার। তার মত যোয়ান ছেলে থাকতে বাবার অসুবিধে কিসের! বরং ভবানীবাবুকে বললে একটা কিছু কাজও জুটে যেতে পারে। আর সেইটাই মস্তো সুবিধে। শক্ত প্ল্যাটফরম পাওয়া যাবে পা রাখবার এবং গোপনে কাজ করবার।

অন্যমনস্কতা কেটে গেল রাহুলের। সামনে সেই ছোট নদীটা। একটুও জল নেই। সেদিনের মতো ধুধু বালির চড়া। ওপারে সামান্য দূরে সেই শ্মশানটা। ঝোপঝাড়গুলো পিঙ্গল রঙ ধরেছে। একটা ঘোরতর রুক্ষতার ছাপ সবখানে। একটুও রস নেই—যেন প্রাণের চিহ্নও নেই কোথাও। এই নিরস নিষ্প্রাণ মাটিতে তার মায়ের দাহ হয়েছিল!......

সুতীব্র উত্তেজনা হঠাৎ তাকে নাড়া দিল। সে নদীর খাড়া পাড় বেয়ে এক দৌড়ে নেমে গেল বালির ওপর। কোথাও একটু জল নেই। ধুধু শুকনো বালি উড়ছে ঝাঁঝাল হাওয়ায়। জুতো না থাকলে পায়ে ফোস্কা পড়ে যেত। সে ওদিকের ঢালু পাড় বেয়ে উঠে গেল। খয়েরী বা পিঙ্গল সব ঘাস কাঁটাঝোপ এখানে ওখানে রোদে ধুঁকছে। তার মধ্যে পোড়া কাঠের টুকরো আর মাটির সঙ্গে জমাট হয়ে যাওয়া কালো ছাই দেখে শ্মশানটা চিনতে পারল সে। যেখানটায় মায়ের চিতা সাজানো হয়েছিল, তার পাশে সেই ভেঙেপড়া প্রকাণ্ড শ্যাওড়া গাছটা এখনও রয়েছে। আর কী যেন ছিল! একটু খুঁজতেই মনে পড়ল, হ্যাঁ—একটা শিমূল গাছ। সেটা নেই। শিমূল গাছটার গায়ে দীর্ঘ কয়েকফালি কালো দাগ দেখে বুঝেছিল ওটা বজ্রাহত। তাহলে পরে একদিন শিমূলগাছটা শুকিয়ে মরে গেছে। তখন গাঁয়ের লোকরা কেটে নিয়ে গেছে তাকে। হেলেপড়া শ্যাওড়াগাছের খসখসে সরু সরু পাতার ঝাঁপি—ছায়ার আয়তন সামান্যই, তবু সেদিনের মতো আজও রাহুল তার নিচে গিয়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে যেন সারা দেহ মন জুড়িয়ে গেল। এতক্ষণে পকেট

থেকে সিগারেট বের করল সে। ধরাল। হ্যাভারস্যাক খুলে শেষ জলটুকুও খেয়ে নিল।

তাহলে সে এজন্যেই পায়েহাঁটা দুর্গম ওই তেপান্তর মাঠের পথ পাড়ি দিয়েছে! তার মায়ের শ্মশানটা একবার দেখবার ইচ্ছে তাকে পেয়ে বসেছিল। জানে—কিছু আর পাবার নেই। কোন স্নেহবিহ্বল কণ্ঠস্বর কোন সাড়া আশা করা বৃথা। তবু কী দুর্দমনীয় আকর্ষণ তাকে এই পথে টেনে এনেছে। ময়নাচকে পায়ে না হেঁটে পৌছতে হলে হয়তো অনেকটা ঘুরে যেতে হয়—ট্রেনে কাটোয়া, কাটোয়া থেকে ছোটলাইনে কিছুদূর—তারপর আজকাল সেই হাইওয়েতে বাস চলছে সারাক্ষণ—কোন অসুবিধে ছিল না। দিব্যি চোখবুজে রাজার হালে আসা যেত।

তাহলে যেন মায়ের অতৃপ্ত আত্মা তাকে এখানে ডেকেছিল। রাহুলের চোখ ফেটে জল এল। বাবার প্রতি দুঃখে ঘৃণায় অস্থির হচ্ছিল সে। হয়তো এ দুঃখঘৃণা নতুন নয়—দশ বছর আগের সেই মর্মান্তিক দিনটিতে যে বীজ তার মনে পোতা হয়েছিল, আজ সেটা বিযাক্ত ফলের গাছ হয়ে মাথা তুলেছে। সে ঠিক করতে পারছে না বাবার সামনে কীভাবে দাঁড়াবে সে! বাবাকে সইতে পারবে কতখানি, তাও স্পষ্ট নয় নিজের কাছে। তাকে তো মুখোস পরে থাকতেই হবে—কারণ, রাজেন হাজরা তার হাতে একটা মুখোস দিয়েছে, কিন্তু বাবার সামনে এ মুখোসটাও যথেষ্ট নয়। আরো একটা বড্ড জরুরী। বাবাকে টের পেতেও দেবে না সে তার ওপর মায়ের দরুন ক্ষুব্ধ—কোনদিনও বলবে না যে তার তরুণ জীবনের এই পরিণতির জন্যে আসলে দায়ী তার বাবার নির্বিকার মনোভাব। কোনদিন যদি একবারের জন্যেও বাবা তার কাছে যেতেন, আদর করতেন—সে সৎ হয়ে উঠত।

সেই কৈফিয়তই কি আজ সে প্রকারান্তরে বাবার কাছে নিতে যাচ্ছে? সেইজন্যেই কি রাজেনবাবুর প্রস্তাব শুনে সে নেচে উঠেছিল? টাকা তার দরকার, শুধু দরকার নয়—জরুরী। কিন্তু টাকা যেন একটা নিছক উপলক্ষ।

মনে মনে মায়ের আত্মার উদ্দেশ্যে সে বলল, শান্তিতে থাকো। আমাকে ক্ষমা করো। তখন আমি ছোট ছিলাম। কিছু বুঝিনি। আজ বুঝতে পারি। একটা নির্বিকার নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোকের পাল্লায় পড়ে তোমার মনে কোনদিন শান্তি ছিল না। এই লোকটা যতখানি ছিল বাক্যবাগীশ ততখানি আন্তরিকতা তার ছিল না। না—দারিদ্র্য নয়, তার নির্বিকার আচরণই তোমাকে সারা জীবন কষ্ট দিয়েছে। আজ আমার সব মনে পড়েছে, মা। স্পষ্ট হয়ে ভেসে

উঠেছে ছেলেবেলার সব ঘটনাগুলো। রাতে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকতুম—আর তোমাদের সেই তেঁতো বিচ্ছিরি বচনগুলো শুনতুম। তোমরা টের পেতে না পরস্পর সন্দেহের বিষে তোমরা জ্বলেপুড়ে মরতে। পরস্পরকে আঘাত করতে। কিন্তু আমার সামনে দিব্যি চমৎকার মুখোস পরে কাটাতে, আমি সব জানি।······

বাবার সঙ্গে মায়ের বয়সের তফাৎ ছিল অনেক। পনের যোল বছর কিংবা তারও বেশি। মায়ের মুখেই শুনেছে সে। আজ সে বুঝতে পারে ওঁদের মধ্যে এই বয়সের অসামান্য পার্থক্যটাও হয়তো গুরুতর কাজ করেছে। কিন্তু মা তো খুব শান্ত সহজ মনের মানুষ ছিলেন। সামঞ্জস্য করে নিতে জানতেন নানা ব্যাপারে। শুধু বাবা—বাবা বড় জটিল, সন্দিগ্ধ আর হিংস্র প্রকৃতির মানুষ যেন। পাড়ার মানুষ সরিৎকাকার সঙ্গে মায়ের একটু মেলামেশা ছিল। সে নিয়ে এক রাত্রে ·····

হঠাৎ কোথায় গুড় গুড় করে চাপা শব্দ হল। চমকে উঠে রাহুল দেখল, বাতাস কখন থেমে গেছে। বিশাল আদিগন্ত মাঠের ওপর খসখসে ধূসর একটা ছায়া পড়েছে। পশ্চিমের আকাশটা চাপচাপ মেঘে ঢেকে যাচ্ছে—সে মেঘের রূপ ভয়ঙ্কর। কোথাও কালো কোথাও রক্তিম—দীর্ঘ বিস্তৃত একটা রুদ্র ব্যাপকতা ক্রুদ্ধ জন্তুর মতে ফুঁসছে। কালবোশেখি! কালবোশেখি আসছে।

কিছুক্ষণ বসে থাকতে থাকতে এসে পড়ল সেই ভয়ঙ্কর।

যেন লক্ষ লক্ষ বুনো মোষের পাল গাঁক গাঁক করে দৌড়ে চলল পশ্চিম থেকে পূর্বে। পৃথিবী কাঁপতে লাগল তাদের ক্ষুরের আঘাতে। ধারাল শিঙে উপড়ে যেতে থাকল গাছপালা। টলতে টলতে দৌড়চ্ছিল সে। আঁধির আড়ালে সেই ছোট্ট গ্রামটা লক্ষ্য করা গেল না। রাহুল দৌড়চ্ছিল। চোখ খুলতে পারছিল না।

তারপর শুরু হল শিলাবৃষ্টি। মেঘের গর্জন বাড়ল। রাহুল দিশেহারা হয়ে ছুটে যাচ্ছিল। বৃক্ষবিরল নির্জন মাঠ পেরিয়ে যেতে যেতে তার মনে হল, আর পৌছনো যাবে না। দিকচিহ্নহীন উত্তাল একটা ধ্বংসের ব্যাপকতায় সে মরীয়া হয়ে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করেছিল। তার মনে হচ্ছিল—যেভাবেই হোক তাকে বেঁচে থাকতেই হবে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে তখন। ভিজে মাটির একটা গন্ধ উঠছে। আকাশে নক্ষত্র ফুটেছে। বছরের প্রথম বৃষ্টির স্বাদে আনন্দিত কীটপতঙ্গের জগতে একটা বিপুল

সাড়া পড়ে গেছে। বজ্রাহত গাছ, ভাঙা পাখির বাসা, মরা খেঁকশিয়াল আর দলা পাকানো খড়কুটোর মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল সে।

একটা আলো আসছিল দূরে। কাছে এলে কয়েকজন লোকের সঙ্গে দেখা হল। রাহুল জিগ্যেস করল, ময়নাচক আর কতদূর বলতে পারেন?

লোকগুলো আসছিল, সেখান থেকেই। ময়নাচকে হাইওয়ের ধারে আজকাল বাজার বসেছে। সে পড়াগাঁ আর নেই। পয়সাওলা লোকেরা সবাই ওখানে গিয়ে বাড়ি করেছে। ইলেকট্রিকের আলোয় সেজেগুজে ময়নাচক আজ একালের সুন্দরী। সামনের গাছগুলো পেরোলেই দেখতে পাবেন আলোর ঝিকিমিকি। ভবানীবাবুর কথা বলছেন? তিনি মারা গেছেন। তবে তাঁর মেয়ে আছে—ভালই আছে। যদি বলেন কেমনভাল—কিসের ভাল—অত কৈফিয়ৎ দিতে পারব না মশাই। নিজে গিয়েই দেখুন। বড়রাস্তার ধারে নতুন বাড়ি। জিগ্যেস করবেন, মুক্তকেশী হোটেলটা কোথায়। ভূতে দেখিয়ে দেবে। আজ্ঞে হ্যাঁ—ওটা ভবানীবাবুর মেয়েই খুলেছে। সবরেজেষ্টরী আপিস, ব্লক-আপিস—কত সব রয়েছে কিনা! তাই নানা গাঁয়ের লোক ওখানে এসে দিন রাত্রি পড়ে থাকে। পেটটা তাদের যখন আছে তখন একটা সুব্যবস্থাও করা চাই তার।

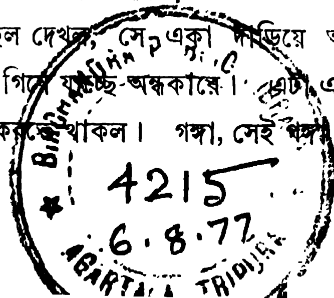
যে জবাব দিচ্ছিল, সে বাড়ির জন্যে হয়তো ব্যস্ত। হড়বড় করে বলে যাচ্ছিল কথাগুলো।

···বহরমপুর থেকে আসছেন? তা এ হাঁটা পথে কেন? মশাই সুপথ দূর ভালো। কার কথা বললেন? হৃষিকেশবাবু? কেউ হয় নাকি? হয় না? আজ্ঞে হ্যাঁ—তিনি আর ভবানীবাবুর মেয়ে একজায়গাতেই থাকেন। থাকবেন না তো যাবেন কোথায়? হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ! আর বললেন না স্যার—সে এক মজার কাণ্ড!

রাহুল একপা এগিয়ে উত্তেজিতভাবে জিগ্যেস করল, কী, কী কাণ্ড বলুন তো?

লোকটা বলল, হৃষিকেশবাবু এখন নতুন রঙ্গে মজে আছেন। ভবানীবাবুর বিধবা মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে যে! হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ!

মাথা ঘুরে উঠেছিল—কতক্ষণ পরে রাহুল দেখল, সে একা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়। আলোটা নাচতে নাচতে দূরে এগিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। এটা একটা দুঃস্বপ্ন ভেবে সে জেগে ওঠার জন্যে ছটফট করতে থাকল। গঙ্গা, সেই গঙ্গা!



দুই

হাইওয়েতে দাঁড়িয়ে রাহুল মনে মনে হিসেব করছিল। রাজেনবাবু আসবার সময় দশটা মাত্র টাকা দিয়েছেন রাহাখরচ বাবদ। রাত্তিরটা এখানে না কাটিয়ে সোজা ফিরে যাওয়া যায় কিনা তাকে খোঁজ নিতে হবে। সে লক্ষ্য করছিল, কিছুক্ষণ পর-পর অনেক ট্রাক আনাগোনা করছে। বাস না পেলে একটা ট্রাকেই স্টেশন অব্দি পৌছনর ব্যবস্থা করা হয়তো সম্ভব হবে। রাতের দিকে ট্রেন না থাকলেও ক্ষতি নেই। স্টেশনে রাত কাটাবে। কিন্তু এখানে নয়। কখনো নয়।

রাগে দুঃখে ঘেন্নায় তার মনটা তেঁতো। ক্ষিদেতেষ্টাও ভুলে গেছে। ময়নাচক তার পায়ের নিচে যেন কাঁটা বিছিয়ে রেখেছে। তাকে পালাতেই হবে এখান থেকে। এখুনি। ফিরে গিয়ে রাজেনবাবুকে বলবে—ও আমার দ্বারা হবে না স্যার। কারণস্বরূপ বানিয়ে কিছু বলবে সে। তারপর?

রাহুলের শরীরটা শক্ত হয়ে উঠল। হঠাৎ তার মনে হল—যে অন্ধকারের মধ্যে এতকাল সে বাস করেছিল, সেই অন্ধকারটা ফের তার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। নেপালদা হীরু খোকা মনা—সকল অন্ধকারের সহচর তাকে তার মধ্য থেকে হাতছানি দিচ্ছে। পলকে-পলকে নিজের ভিতর সে অন্ধকারের স্বাদ স্মৃতির ঘর ভেঙে বেরিয়ে এল। ব্যাগের ভিতর হাত ভরে অটোমেটিক রিভলবারটা আছে কিনা দেখে নিল সে। এই যন্ত্রটা তার ব্যাগের ভিতর একটা মোজার প্যাকেটে মোড়কবাঁধা অবস্থায় রাখা ছিল—জেলে যাবার কিছুদিন আগে, যে দিন সন্ধ্যায় পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল সেদিন বিকেলে পানওয়ালা ভুজুদার কাছে জিম্মা দিয়েছিল ভাগ্যিস! বুড়োমানুষ ভুজুদা সেটা খুলেও দ্যাখেনি অবিকল সেই অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছে গতকাল। ত্রিশটা কার্তুজ ছিল—একটাও খোওয়া যায়নি। কিন্তু কাজে লাগবে কিনা কে জানে! পুরনো হয়ে গেছে তো বটেই—তার ওপর সদ্য জলঝড়ে ভিজে যায়নি তো? পরীক্ষা করবার জন্য তার মনটা চনমন করে উঠল। এখন আফশোস লাগে—সেই বিশাল নির্জন মাঠে চমৎকার সুযোগ পাওয়া যেত। কিন্তু আশ্চর্য,

একবারও এটার কথা তার মনে ছিল না। সারাপথ তার মনটা জুড়ে ছিলেন মা আর বাবা—তারপর গঙ্গা।

প্যাকেটটা পীচবোর্ডের। হাত ছুঁইয়ে টের পাচ্ছিল, সেটা বেশ ভিজে উঠেছে। কিন্তু তাহলেও এতক্ষণে তার মনে একটা বিপুল সাহস অভাবিত পরাক্রমে ফুঁসে উঠেছে। জেল থেকে বেরিয়ে ভুজুর কাছে ওটা ফেরত নিয়ে তখন তো তার মনেই হয়নি যে সে শক্তিমান? আসলে, তখন একটা ক্লান্তি তাকে নিরাসক্ত করে তুলেছিল। ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গতার বোধে সে ভেঙে পড়েছিল। অথচ এই ছঘরা অটোমেটিক পয়েণ্ট আটত্রিশ ক্যালিবারের অস্ত্রটা যতক্ষণ তার হাতে আছে, ততক্ষণ তার বেঁচে থাকার আর ভাবনা কিসের?

শুধু জানা দরকার, কার্তুজগুলো কাজ দেবে কি না। যদি কাজ দ্যায়, সে ফের শক্তিমান। উৎসাহে চাঙ্গা হল রাহুল। দুধারে ছোটখাটো বাজার। আলো ঝলমল পরিবেশ। খুব ভিড় না হলেও লোকজন খুব কম নেই। একটা চায়ের দোকান লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল সে। ক্ষিদে পেয়েছে এতক্ষণে। কিন্তু তার আগে এক কাপ চায়ের তেষ্টা তাকে অস্থির করছিল।

কজন লোক আড্ডা দিচ্ছে দোকানটায়। ভিতরে দু দেয়াল ঘেঁষে দুটো কাঠের বেঞ্চ। সামনে হাতখানেক উঁচু প্ল্যাটফরমে চা-ওলার কাজকারবার। বাইরেও বাঁশবাতার দুটো বেঞ্চ পাতা রয়েছে খোলা আকাশের নিচে। আবহাওয়ায় স্নিগ্ধতা আজ। বৃষ্টির ফলে উৎকট গরমটা কমে গেছে। রাহুল বাঁশের বেঞ্চে বাইরেই বসে বলল, চা দিন। বিস্কুট নেই? দিন।

চা-ওলা তাকে দেখছিল। বলল, মশায়ের নিবাস?

রাহুল একটু বিরক্ত হয়ে জবাব দিল, বহরমপুর।

বহরমপুর!··· চা-ওয়ালা ছাকনিতে এক চামচ চা দিয়ে বলল, অ। কেমন যেন চেনাচেনা ঠেকছিল, তাই কইতাছিলাম।

রাহুল ভুরু কুঁচকে অন্যদিকে মুখ ফেরাল। অন্য লোকগুলো সম্ভবতঃ ব্যবসায়ী—ছোটখাট ব্যবসা-ট্যাবসা করে। তারা সেই ধরনের কথাবার্তায় জমে রয়েছে।

চা-ওলা ফিক করে হাসল হঠাৎ।···মশায়ের মুখের লগে আমাগো ঋষিবাবুর মিল আছে। নাই চন্দ্রদা? দ্যাহ না চাইয়া। আছে না? এক্কেরে ঠিকঠাক।

কালো কুচকুচে লোকটি—সাদা গোঁফ, ছোট ছোট কদমকেশর কাঁচাপাকা চুল, একবার দেখে নিয়ে বলল, তা. মাইনষের লগে মাইনষের মিল থাকবে না ক্যান?

চা-ওলা বলল, জিগানেই বা দোষ কী? আমাগো ঋষিমাষ্টার মশায়ের একগো পোলা আছিল। মাষ্টারমশায়ের মুখেই গল্প শুনছি তেনার।

রাহুল চমকে উঠেছিল। লোকটা ভীষণ গায়েপড়া তো! সে বলল, একটু তাড়াতাড়ি দিন। আমার তাড়া আছে।

চা-ওলা অতৃপ্ত মুখে চায়ের কাপ আর দুটো বিস্কুট এগিয়ে দিল। তারপর বলল, ঋষিবাবু কেউ হন না আপনার? তেনার পোলা কিন্তু বহরমপুরেই থাকেন শুনছিলাম।

রাহুল বিরক্তমুখে বলল, আপনাদের ঋষিবাবুকে আমি চিনি নে। তাঁর ছেলে হলে এখানে বসে চা খাচ্ছি কেন?

হ—সে তো ঠিকই।···চা-ওয়ালার মুখটা নীরস দেখাল। সে কালো লোকটির দিকে ঘুরে বলল, মাষ্টারমশাই সেদিন কইছিলেন—হোটেলটা তুলে দেবেন। বুঝলে চন্দ্রদা? পোষায় না। পোষাবে কেমন কইরা? সব নিজের হাতে না রাখলে লাভের গুড় পিঁপড়ায় খাইয়া ফেলব। বাস্ রে, সাক্ষাৎ মা কালী রয়েছেন ঘরে, তার ওপর কথা চলবে না।·· চা-ওলা হাসতে লাগল।

চন্দ্রদা লোকটি বলল, আরে ছাড়ান দ্যাও. ও খানকি ছেনালডার কথা। অন্য কথা কও, শুনি।

রাহুল ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়াল। বলল, আচ্ছা, এখন এখান থেকে অমলাহাট স্টেশনে যাওয়ার বাস পাওয়া যাবে বলতে পারেন!

চা-ওলা বলল, আর তো বাস নেই এ্যাহন। আবার সেই ভোরবেলা। সন্ধ্যা ছটায় লাস্ট ট্রিপ ছাড়িয়্যা গেছে' অনে। তবে ট্রাক পাইলে পাইতে পারেন।

সেই চন্দ্র বলল, এক কাম করেন। সোজা মুক্তকেশী হোটেলে চলিয়্যা যান' গিয়া। ওহানে অনেক ট্রাকড্রাইভার পাইবেন। ট্রাক নামাইয়া খাইয়া লয় তারা।

রাহুল হনহন করে চলে এল রাস্তায়। আশ্চর্য, তার বাবার সঙ্গে তার চেহারার এত মিল আছে, সে ভুলে গিয়েছিল। তার অস্বস্তি হতে থাকল। ময়নাচকে সে খুব সহজে ধরা পড়ে যাচ্ছে যেন। এখানে তার বাবাকে আগের সূত্র ধরে সবাই মাষ্টারমশায় বলে সে জানত। শুধু এটুকুই বোঝা যাচ্ছে না, বাবা কেন সব থাকতে হোটেল খুলে বসলেন! এটাও একটা রহস্য। ভবানী-বাবু মোটামুটি অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। তাহলে তো তার মেয়ের বেশ

পয়সাকড়ি থাকার কথা। বোঝা যায়, কিছু একটা ঘটেছিল—যাতে ভবানী-বাবুর মৃত্যুর পর গঙ্গা সম্ভবতঃ খারাপ অবস্থায় পড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আপাতত কোন কৌতূহল নয়—তাকে এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতেই হবে। যে মেয়ের দেহমনে একদা তার দেহমনের একটা ছাপ পড়ে গিয়েছিল—তাকে সে মায়ের আসনে দেখতে পারা তো দূরের কথা, সইতেও পারবে না। তাকে এক্ষুনি যেতে হবে।

পা বাড়াল সে। সতর্কচোখে দু পাশটা দেখতে দেখতে এগোল। মুক্ত-কেশী হোটেলটা এড়িয়ে যেতে হবে। গঙ্গা তাকে সাত বছর পর দূর থেকে চিনতে পারবে হয়তো—কিন্তু বাবা? রাহুল টের পেল, একটা গোপন কষ্ট তার অস্বস্তিকে ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সেই কষ্ট—সেই অবরুদ্ধ যন্ত্রণা উত্তরোত্তর তাকে ক্ষিপ্ত করে তুলল।

ডাইনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। তার ওপাশে মাঠ দেখা যাচ্ছিল। অন্ধকার মাঠটায় গিয়ে দাঁড়াল সে। এ এলাকায় মাঠগুলো খুব বড়ো—দিগন্তবিস্তৃত। সে পিছু ফিরে দেখে নিল, কেউ তাকে লক্ষ্য করছে কি না। না। জায়গাটা নির্জন। সে হনহন করে চষা ক্ষেত পেরিয়ে অনেকটা দূরে গিয়ে থামল। এখানে একটা কার্তুজ পরীক্ষা করা যেতে পারে। আওয়াজ বাজার অব্দি পৌঁছবে বলে মনে হয় না। কারণ মাঠে বাতাস বইছে উল্টো দিকে। সে বসে পড়ল। ব্যাগ থেকে অস্ত্রটা বের করল।···

বিস্ফোরণের আওয়াজটা তার কানে নতুন শোনাল। এ শুধু রিভলবারের গর্জন নয়, তার ভিতর সেই ঘুমন্ত বিশ্রামরত অমানুষিক শক্তিটা হঠাৎ জেগে নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করল যেন। রক্ত নেচে উঠল রাহুলের। একটা নিষ্ঠুর এবং ভয়ঙ্কর হননের ইচ্ছা তাকে পেয়ে বসল আগের মতো। গঙ্গাকে খুন করে পালাবে সে? নাকি দুজনকেই। ক্রূর সেই ইচ্ছা তার আঙুলে নিসপিস করে উঠল। ছটা কার্তুজ পুরে রিভলবারটা সে ব্যাগে খোলা রেখে দিল। তারপর বেশ খানিকটা ঘুরে বাজারের শেষপ্রান্তে এসে রাস্তায় উঠল।

একটা কিছু করা দরকার। অমানুষিক শক্তিটা তাকে অবিশ্রান্ত খোঁচা দিচ্ছে। সে দুপাশে তাকিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিল। নানা জিনিসের দোকান রয়েছে। খুব সহজেই হানা দেবার সুযোগ আছে। দোকানে লোকজন বিশেষ নেই। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা জুয়েলারী। রেলিংঘেরা গারদের মতো ওই দোকান দেখলে তার হাসি পায়। চিড়িয়াখানার মতো। দোকানটায়

দুজন লোক অবিকল বানরের মতো গম্ভীরমুখে আলমারি গোছাচ্ছে। আর কেউ নেই সেখানে।

পা বাড়াতে গিয়ে থামল সে। কাজটা খুব সহজ হবে। কিন্তু সারাদিনের ওই প্রচণ্ড পরিশ্রমের পর শরীর বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। কাজটা করতে গেলে তাকে অজানা মাঠের দিকে অনেকক্ষণ দৌড়নোর ঝুঁকি নিতে হয়। সারাটি রাত তাকে ফের হাঁটতে হয় বিদেশ-বিভুঁয়ে। অনেক কষ্টের ব্যাপার। তাছাড়া, কী পরিমাণ পাওয়া যাবে—তাও জানা নেই।

সামান্য দূরে ম্লান আলোয় একটা ইটখোলা আর টালি ভাটা দেখা যাচ্ছে। রাস্তার পাশে স্তূপীকৃত ইট আর টালি জড়ো করা আছে। দেখতে দেখতে মতলব বদলে ফেলল রাহুল। একবার বহরমপুরের ওদিকে এমনি ইটখোলায় হানা দিয়ে অভাবিত টাকা পাওয়া গিয়েছিল। ইটখোলা মালিকের ঘরটা সচরাচর রাস্তা থেকে দূরে ভিতরের দিকেই থাকে। এটাও সেই রকম মনে হচ্ছে। সে এগিয়ে গিয়ে দেখল একটা সুঁড়িপথ নিচে নেমে গেছে অন্ধকারে। শেষপ্রান্তে ঢিবির ওপর ঘর—আলো দেখা যাচ্ছে।

রাহুল রাস্তা থেকে নামল। ওদিকে মজুরদের ছাউনি থেকে ঢোলের বাজনার সঙ্গে গানের আওয়াজ ভেসে আসছে। ওরা টের পাবার আগেই কাজ হয়ে যাবে। রাস্তার দিকে বাজারে খবর তক্ষুনি পৌছবে বলে মনে হয় না। সেবারও ঠিক এরকম হয়েছিল। সকাল অব্দি কেউ জানতেও পারেনি। মজার কথা—সেই লোকটির একটা বন্দুকও ছিল দোনলা। কিন্তু কোন ফল হয়নি সেটা। এর কি আছে? লোকই বা কজন? দুজনের বেশী থাকলে একটু বিপদ আছে। দেখা যাক্। অবস্থা অন্যরকম বুঝলে রাতের মতো আশ্রয় নেবে। একটি ভদ্রচেহারার ছেলেকে নিশ্চয় ওরা আশ্রয় দেবে। তারপর·······

ঘরটার কাছাকাছি যেতেই তার গায়ে টর্চের আলো পড়ল। একটা কুকুরও সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকার জুড়ে দিল। হাতে চোখ আড়াল করে সে থামল। কে ভারি গলায় বলে উঠল—কাকে চাই?

রাহুল একটু হেসে জবাব দিল, ইয়ে—দেখুন। আমি বহরমপুর থেকে আসছি। এখানে নতুন—তাই·········

তার বলা শেষ হবার আগেই লোকটা দৌড়ে এল। ···আরে রাহুল না?

কে?···রাহুল চমকে উঠেছিল। পরক্ষণেই চিনে ফেলল।·· অরুণদা! তুমি এখানে!

কী কাণ্ড! আমি যে দু তিন বছর ধরে এখানে মাটি পোড়াচ্ছি হে, জানতে না? কুমড়োদহ—বাজারসাউ রোডে ইটের কণ্ট্রাক্ট ছিল। কাজ শেষ। বাড়তি রিজেকটেড ইটগুলোর কিনারা করতে শেষ অব্দি থেকেই গেলাম। এস, এস! ইস্, চেনাই যাচ্ছে না। কদ্দিন তোমায় দেখিনি বলতো?

অরুণ সাঁতরা তার হাত ধরে টেনে টিবির ওপর নিয়ে গেল। বারান্দায় চেয়ার রয়েছে। সে বলল, বসো। তারপর, আচ্ছা কেমন? এখানে কী ব্যাপার? দুষ্টুমি-টুষ্টুমি কমিয়েছ—না সমানে চলছে? চলছে?··হাসতে লাগল সে।···ভাল আছ হে! এদুনিয়ায় শালা যার বিষদাঁত নেই, তার কিস্যু নেই। থাক্ গে, তোমায় দেখে মনে বড় জোর পেলাম ভাই। সব বলব'খন।· তা হ্যাঁ রাহুল? বাবার খবর জানো তো? নাকি এসেই টের পেলে? হুঁ—সে তো আমার এখানে তোমার আসা দেখেই বুঝেছি—কোন মুখেই বা সামনে গিয়ে দাঁড়াবে! ভদ্রলোককে খুব নিরীহ সহজ মানুষ বলেই জানতাম। এ বয়সে আর··যাক্ গে, মরুকগে। আমার ঠিকানা কে দিল?

রাহুল শুকনো হেসে বলল, পেয়ে গেলাম।

অরুণ বলল, খুব খুশি হলাম ভাই—খু-উ-ব। তুমি যে আমার কথা মনে রেখেছ ভাবতেই পারি নি। ওরে নেত্য, বাবুকে জলটল দে। ওঠ, কাপড়চোপড় বদলে নাও।

রাহুলের শরীর এতক্ষণে বিশ্রামের জন্যে ছটফট করে উঠেছে।

গভীর ঘুমে রাত কেটে গিয়েছিল। এমন সুন্দর ভদ্র বিছানায় অনেক রাত তার শোওয়া হয়নি। এমন চমৎকার খাওয়াও জোটেনি অনেকদিন। খুব ভোরে কোথায় মোরগ ডাকল। পাখপাখালি ডাকতে থাকল। ঘুম ভেঙে সে খোলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল চুপচাপ। গত রাতটা তাকে কোথায় নিয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ দ্রুত বাঁক ঘুরে কোথায় এনে ফেলেছে। এই অরুণ সাঁতরার সঙ্গে তার পরিচয় ছিল কিছুটা। ভাবতে পারা যায়নি কোনদিন যে সে তাকে এতখানি খাতির করবে। জামাই আদরে বরণ করে নেবে। হয়তো সময় আর অবস্থার গুণে মানুষের মনমেজাজেরও হেরফের ঘটে। চরিত্র আর আচরণে অনেক রদবদল এসে পড়ে। মনে নাকি বড্ড জোর পেয়েছে অরুণ তাকে দেখে—এবং অনর্গল আরও কী সব বলছিল, ঘুম শুনতে দ্যায়নি কিছু। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ার মুহূর্ত অব্দি রাহুল মনে মনে হাসছিল—তুমি শালা

উঁচুদেঁতো কিপটের ধাড়ি অরুণ ইটবাবু, তুমি এখন আমাকে খাতির করছ,—অবশ্যই কিছু গুরুতর ব্যাপার আছে তলায়-তলায়। তা না হলে আমাকে রাত্রিবেলা এই নির্জন ইটখোলায় দেখে তুমি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করে ফেলতে। নিশ্চয় কোন মতলব তোমার আছে হে! আমাকে তুমি তোযক-চাদর বালিস যুগিয়ে পুরোদমে ফ্যান চালিয়ে ঘুমোবার সুযোগ দিচ্ছ, আমি জানি—এ তোমার আতিথেয়তা নয়। কারণ রাহুলকে যারা চিনে, তারা এসব কোনটাই ছায় না।·········

এটা বাইরের ঘর। এ ঘরে সে একা ঘুমিয়েছে। ভিতরে আরো দুটো ঘর রান্নাঘর উঠান নিয়ে এটা অরুণ সাঁতরার বাড়িই বটে। পুরোদস্তুর ফ্যামিলি নিয়ে থাকে। রাধারঘাট ইটখোলাতে অরুণ একা থাকত। দরমাবেড়ার ঘর, টালির ছাউনি—নেহাত অস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল সেখানে। রাহুল জানত, বেথুয়াডহরিতে অরুণের পৈতৃক বাড়ি আছে। সে নানা যায়গায় সরকারী রাস্তার ইট যোগানের কণ্ট্রাক্ট নেয়। কাজেই বছরে-বছরে বীরভূম-মুর্শিদাবাদের নানা জায়গায় তার ডেরা বদলাতে হয়। কিন্তু ময়নাচকে আজ যেন স্থায়ী ডেরা বেঁধে ফেলেছে। পনের ইঞ্চি ইটের দেয়ালে এই একতালা বাড়ীটা তুলেছে। জায়গাটা হয়ত সত্যি বসবাসের পক্ষে ভালো। অন্তত যারা গৃহস্থ কারবারী মানুষ—দুপয়সা রোজগার করে ভালভাবে বাঁচতে চায়, তাদের পক্ষে তো বেশ ভাল। অরুণের ফ্যামিলির সব খবর রাহুলের জানা ছিল না। বউ আছে, সেটা না বললেও জানা হয়ে যায়—আটকায় না। কাল রাত্রে অল্পস্বল্প জানা গেছে। ওর বউয়ের নাকি শরীর খারাপ—বিছানায় পড়ে থাকে সারাক্ষণ। অসুখটা কী, তা জানতে উৎসাহ প্রকাশ করেনি রাহুল। ওটা তার স্বভাব নয়। যে তার খাবার পরিবেশন করছিল, যে অরুণের দূর সম্পর্কের কী রকম বোন। মেয়েটি একটু লাজুক মনে হচ্ছিল। পলক ফেলার জন্যে চোখের পাতা স্বভাবত দ্রুত ওঠে পড়ে, রাহুল লক্ষ্য করেছিল—অরুণের এই বোনের চোখের পাতা খুব আস্তে পড়ে এবং ওঠে। খুব শান্ত স্বভাবের মেয়ে কি? স্বাস্থ্যটি বেশ ডগমগে। এমন তাজা সুস্বাদু মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে না কেন অরুণ? নাকি রোগা বউর ভবিষ্যত বিকল্প? ও শালা সব পারে। আদি-রসের খিস্তি করতে তো ওর জুড়ি নেই। নেপালদা বলত, অরুণটা একটা ঢ্যামনা—আগের জন্মে বারোয়ারী পাঁঠা ছিল।·········

জানালার বাইরে অনেকটা জায়গা নিয়ে লাল পোড়ামাটি আর ইটের এলোমেলো পাঁজা দেখা যাচ্ছে। ইতিউতি দু একটা গাছপালা, ঝোপঝাড়,

টিবির ওপর আদিবাসি মজুরদের সারবন্দি কুঁড়েঘর। তার ওদিকে প্রসারিত মাঠের সঙ্গে আকাশটা মিলে গেছে। সাতবছর আগে এই 'গ্রাম নগরীর' (অরুণ বলছিল কথাটা) কোন চিহ্নই ছিল না। একটা কাঁচা রাস্তা, ময়নাচকের পাশ দিয়ে আমেদপুরের দিকে চলে গিয়েছিল। সেটাই এখন হাইওয়ে। পশ্চিমে নদীর ওপর মস্তো ব্রীজও নাকি হয়ে গেছে। দিনেদিনে মালপরিবহনের কাজ বেড়ে চলেছে। কলকাতা ও অনেক জায়গার বড়-বড় ডিষ্ট্রিবিউটার্স, সাপ্লাই এজেন্ট, ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর আর সাধারণ ব্যবসায়ীদের এক অখণ্ড স্বার্থের প্রবাহ চলেছে এই নতুন পথে। সার্থের স্বার্থ!···রাহুল হাসল। তার মাষ্টার মশাই বাবা ছেলেবেলায় এইসব শব্দভেদ ও অর্থভেদ বোঝাতেন পই পই করে। সার্থ ও স্বার্থ! এখন ময়নাচকের আপ কিংবা ডাউনের ব্যাপারটা ঘটে যাচ্ছে প্রায়ই। পুলিশ সামলাতে পারছে না। কারণ নাকি বড়-বড় পলিটিকাল ঘুঘু অমনি ডাকতে সুরু করে।······রাজেনবাবু বলেছিলেন। এই র‍্যাকেটের পিছনে ওনাদের সোজাসুজি কোন হাত নেই। কিন্তু র‍্যাকেটে যারা আছে—তারা ব্যক্তিগতভাবে ওনাদের কারো-না-কারো লোক। শুধু ইলেকসানের সময় তাদের দরকার হয় তাই নয়, বেদলের সাথে সংঘর্ষ বাধলে তারাই ওনাদের পিঠ বাঁচায়। কাজেই তাদের আইনত কোন ব্যবস্থা করা যাবে না। হাইওয়েতে মালচলাচলের ব্যাপারে যাদের স্বার্থ—অর্থাৎ সেই ডিসট্রিবিউটার্স সাপ্লাই এজেন্ট—ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী—সাধারণ ব্যবসায়ী, তারা সরকারের মন্ত্রীপর্যায়ে দরবার করেও কোন ফল হয় নি। রাহাজানি একটুও কমছে না। এই চক্রটা আইনত ভাঙার অসুবিধা আছে—তা এবার ওরা টের পেয়ে গেছে। অতএব যেমন বুনোওল, তেমনি বুনো তেঁতুলের বন্দোবস্ত করা ছাড়া উপায় নেই। আপাতত পাঁচহাজার টাকা ওরা দেবে। তাকেই দেবে যে চাকাটার কেন্দ্রে ঘা মেরে ওটা টুকরো করে ফেলতে পারবে। তার সোজা মানে হচ্ছে খতম। হ্যাঁ, নির্ভেজাল খতম। হাতে যা খবর আছে, তাতে বোঝা গেছে কেন্দ্রে আছে মোট তিনজন লোক। তিনজনের একজনও বেঁচে থাকলে ফের নতুন চক্র গড়ে ফেলবে। তাই তিন তিনটি খতম সম্পন্ন করা চাই। কিন্তু সবচেয়ে মুস্কিল হচ্ছে ওই তিনজনের নামধাম পরিচয় পুলিশের অজ্ঞাত। কারণ, যে সূত্র খবরটা দিয়েছিল সে ওই তিনজনকে অস্পষ্ট দেখছে, রাতের অন্ধকারে আবছা চেহারা মাত্র। অনেক রাত্রি ধরে, নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে, আড়ি পেতে থেকে, মাত্র ওইটুকু জানা গেছে--তারা তিনজন। তিনজনই দলের পাণ্ডা। বাকিরা

সব হুকুমের চাকর। ওরা তিনজন দৈবাৎ একজায়গায় সে রাতে মিলেছিল আলোচনা করতে—নয় তো সেটুকুও জানা যেত না। বোঝা যায় কী ভীষণ সাবধানী ওরা।

যাই হোক, এই সামান্য চাবিকাঠিটা দিয়ে দরজা খুলবে কিনা রাহুল জানে না। শুধু সম্বল—তার সামান্য অভিজ্ঞতা, কিছু বুদ্ধি আর সাহস। আবছা চেহারাগুলোর একটু নমুনাও সে পেয়েছে রাজেনবাবুর কাছে। একজন ঢ্যাঙা, বিশাল শরীর—অন্যজন মাঝারি গড়নের, রোগা, তৃতীয়জন·····

তৃতীয়জন সম্পর্কে ইনফরমারের নিজেরই সংশয় অছে। তার উচ্চতা আরও কম। প্রথমে ভেবেছিল—মেয়ে, পরে মনে হয়েছিল কমবয়সী ছেলে—পরে ফের মেয়ে মনে হওয়ায় একটু এগোনর চেষ্টা করেছিল। সেই সময় হঠাৎ তার কানের পাশ দিয়ে সাঁ করে কী চলে যায়। সহজাত প্রবৃত্তিবশে সে মাটিতে শুয়ে পড়ে। গুলির আওয়াজ শোনে। কতক্ষণ পরে মাথা তুলে চারপাশে তাকায়। ত্যাখে, কেউ নেই। অন্ধকারে রাস্তাটা চকচক করছে—নক্ষত্রের আলো পড়েছে। সে কতকটা বুকে হেঁটেই পালিয়ে আসে। সে শেষঅব্দি বলেছে যে তৃতীয় জন মেয়ে হতেই পারে না।—কারণ, সাড়িটাড়ি পরা ছিল না। সাড়িপরা মানুষ অন্ধকারে বোঝা যেত। ওর পরনে ছিল ফুলপ্যাণ্ট অথবা পাজামা। শুধু মাথার দিকটা·········

অবশ্য বাবরীচুল আজকাল অনেকেই রাখে।···

তাহলে এই হচ্ছে মোট তথ্য। না—আর একটু আছে। ইনফরমারের নামধাম রাজেনবাবু তাকে সরকারী নীতির বিরুদ্ধ বলে জানাতে পারেন নি। শুধু বলেছেন, সে ময়নাচকের লোক। তাকে জানানো হবে যে র‍্যাকেট ভাঙতে একজন যাচ্ছে, দরকার হলে সে যেন তাকে যতটা সম্ভব হবে তার পক্ষে, আড়াল থেকে সাহায্য করে। রাহুলের পরিচয় যথারীতি তাকে দেওয়া হবে। কাজেই আকস্মিকভাবে কোন ব্যাপারে অভাবিত সাহায্য বা সহযোগিতা কোন নেপথ্যচারী লোকের কাছ থেকে পেলে রাহুল যেন মাথার ঠিক রাখে। বি ভেরি—ভেরি কেয়ারফুল টু দিস পয়েণ্ট।

কতদিন লাগতে পারে এটা চুকিয়ে ফেলতে ? কিছু ঠিক নেই। একঘণ্টা অথবা পুরো একটি বছর। তার থাকা-খাওয়া ইত্যাদির খরচ কিন্তু আপাতত এক পয়সাও দেওয়া হচ্ছে না রাজেনবাবু বলেছেন, সেইজন্যেই তো অনেকদিন থেকে তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম। কারণ, এইভাবে অনিশ্চিত অবস্থার দরুণ কড়ি যোগানের অসুবিধে আছে। বুঝতেই পারছ—আমরা সরকারী ভাণ্ডার

থেকে কিছু দিতে পারছিনে। কোন স্যাংসান আপাতত নেই এক্ষেত্রে। যা দেবার—দেওয়া উচিত ওইসব কোম্পানীর। সে ভাই পাঁচভূতের কারবার। বুঝতেই পারছ! ইনটারেস্ট আছে সব শালার—কিন্তু ভয় তো কম নেই। ধরো, তুমি ফেল করলে—তখন কী হবে? তোমাকে পোষার জন্য কড়িকে কড়ি গচ্চা তো গেলই—উপরন্তু র‍্যাকেটের শয়তান ক্ষেপে গিয়ে আরও ক্ষতি করতে থাকবে। এই ব্যবসায়ীদের আমি সত্যি বুঝতে পারিনে। এরা হাসিমুখে ব্যবসার লোকসান সইবে—কিন্তু তার বাইরে একপয়সা নগদ খসালে বুক চচ্চড় করবে। আমি ওদের বলেছিলাম, আরে মশাই, এও তো ব্যবসার খাতে একটা ইনভেস্টমেন্ট! ওরা বুঝতে চায় না। যাই হোক, আমি কড়া হয়ে চাইলে যে তোমার খরচ-খরচা দিত না, তা নয়। হয়তো জরুরী কিছু বুঝলে, ভেবো না—আমাকে তাই করে তোমার ব্যবস্থা করতে হবে। সেটা পরের কথা। তোমাকে সিলেক্ট করার একটা বড় কারণ হচ্ছে—তোমার বাবা আছেন ওখানে। তোমার একটা চমৎকার নিরাপদ শেলটার আছে। তোমার ওপর কারো সন্দেহ হবে না। অতএব লেগে যাও। তেমন অবস্থা বুঝলে আর্থিক সাহায্য তুমি পাবে—আই এ্যাসিওর। কিন্তু সেটা নির্ভর করবে সম্পূর্ণভাবে তোমার প্রগ্রেসের ওপর। ঠুঁটো জগন্নাথ সেজে বসে থাকলে তো কিছু করা যাবে না! আবার অন্যদিকে—তোমার কতটা কী প্রগ্রেস হল, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পেলেও আমি কোন আর্থিক ব্যবস্থা করতে পারব না—আমি তোমাকে জানি হে—খুব ভালভাবেই জানি। জানি বলেই তোমার ওপর বিশ্বাস আছে।...

সব শালা চালিয়াৎ! স্বার্থের চাকর। তিনতিনটে মানুষ মারব আমি, তুমি শালার হবে প্রমোশন। ব্যবসায়ীদের মুনাফা উঠবে ফেঁপে। আর আমি শালা সেই কুত্তার মতো লেজ নেড়ে ঘুরে বেড়াব এ ড্রেন সে ড্রেন! গোল্লায় যাও খানকির বাচ্চা!

রাগে মেজাজ গরম হয়ে গেল রাহুলের। বাইরে লালচে রোদের আভায় দেখা দিয়েছে। অরুণ তখনও ঘুমুচ্ছে নাকি? এক কাপ চা পেলে এখন মেজাজটা ঠাণ্ডা হত। হ্যাঁ, রাগ-টাগ ছাড়তে হবে পুরোপুরি। মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার। কাল রাত্রে ভেবেছিল, ময়নাচক তার পায়ের নীচে কাঁটা পুঁতে রেখেছে—পালাতে ইচ্ছে করছিল। একটা লম্বা ঘুমের পর ভিতরে ওলটপালট ঘটে গেছে হয়তো। রাজেনবাবুর মিশন নিয়ে ভাবছে। তার মানে, থাকার

সুযোগ হয়ে গেলে সে যেন থেকে যাবে। র‍্যাকেট ভাঙতে? মানুষ মারতে? শুধু সেজন্যেই?

নাকি একটা তীক্ষ্ণ চাপা কৌতূহল তার ভিতরে শিসিয়ে উঠেছে যন্ত্রণার চেহারা নিয়ে? একটা গভীরতর কষ্ট আলোড়িত হচ্ছে এতক্ষণে। গঙ্গাকে একবার দেখতে—বাবাকে একবার মুখোমুখি ঘেন্না জানাতে—আর সাতবছর আগের একটি সুন্দর গোপন স্মৃতির ওপর পেচ্ছাপ করে দিতে তার বড় সাধ হচ্ছে।

তার আগে এক কাপ চা পেলে ভালো হত!

আপনার চা।

লাফিয়ে উঠে বসল রাহুল। মাথার কাছে টুলে জলের গেলাস আছে। সেটা সরানোর শব্দ, তারপর শোনা গেছে মৃদু কণ্ঠস্বর—আপনার চা।

ভারি অদ্ভুত তো! বলে সে অস্ফুট হাসল।···শুনুন।

অরুণের বোন দরজা ঠেলে চলে যাচ্ছিল তেমনি নিঃশব্দে, যেমন সে এসেছিল—টেরও পায়নি রাহুল। দাড়াল একটু।···বলুন!

আপনি কি কল্পতরু? ঠিক যখনি চায়ের তেষ্টা পাচ্ছিল, তখনি এসে গেল—তাই বলছি।···রাহুল চায়ে চুমুক দিল।···অরুণদা ওঠেনি?

মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছিল—এক মুহূর্তের হাসি ফুটেছিল ঠোঁটের কোণে। মাথা দুলিয়ে সে চলে যাচ্ছিল ফের।

রাহুল বলল, আপনি কিন্তু খুব কম কথা বলেন।

কোন জবাব এল না। কিন্তু সে স্থির দাঁড়িয়ে আছে।

বেহায়ার মতো রাহুল বলল, আপনার নামটা ভুলে গেছি—অরুণদা কি যেন বলছিল·· শী ··শী···

শীলা।·· বলে এবার চলে গেল অরুণের বোন।

রাহুল খুসি হয়ে দুলতে দুলতে চা খেতে থাকল। শীলা বলে ডাকছিল না অরুণদা? শীলা! ড্যামনার ধাড়ি অরুণদাটা। রাধারঘাটে একটা রক্ষিতা পুষত নাকি। এ শালাদের জুটেও যায় বেশ। হয়তো এমন ছিমছাম গোবেচারা মেয়েটিকে তলে তলে নষ্ট করে ফেলেছে। ওকে কিচ্ছু বিশ্বাস নেই। আর আজকাল তো কতরকম চমৎকার ওষুধপত্তর বেরিয়েছে। বাচ্চাটাচ্চা গজাবার উপায় নেই। মেয়েটাকে অরুণ ব্যবহার করে ভাবতেই রাহুলের মাথাটা ফের গরম হয়ে গেল। কিছুক্ষণ স্থির বসে চা খাবার পর সে অবাক হল নিজের দিকে তাকিয়ে। কাল ওই মাঠের পথে আসতে আসতে একমুহূর্তের জন্যেও সে তার

বর্তমানের মধ্যে বাস করছিল না যেন—সবটাই ছিল তার মোটামুটি নিষ্পাপ সরল সহজ ছেলেবেলা। কাল সারাটি দুপুর ও বিকেল। কালবোশেখির ঝড়টা ফুরিয়ে যাবার পর অব্দি, সে কিশোর রাহুল হয়ে পড়েছিল। এখন সে ভিন্ন মানুষ। এখন ফের তার বর্তমানকে ফিরে পেয়েছে সে। চোখদুটো আবার যা ছিল তাই হয়েছে। কাল কিছু সময়ের জন্যে কি তার মা তাকে ছেলেবেলাটা পাইয়ে দিয়েছিলেন? স্মৃতির বিষাদ তাকে সারাক্ষণ ঘিরে রেখেছিল সব পাপ থেকে। সব কদর্যতা থেকে। সবরকম ভয়ঙ্কর ইচ্ছা থেকে মা তাকে বাঁচাচ্ছিলেন।

শূন্য কাপপ্লেটটা হাতে ধরে সে নিষ্পলক কিছুক্ষণ বসে রহিল। জানালার বাইরে নরম রোদে ভরা পৃথিবীটা দেখে তার মনে প্রচ্ছন্ন বিষণ্ণতা এসে যাচ্ছিল। কি যেন করার প্রতিশ্রুতিতে দায়বদ্ধ ছিল সে—দূর বাল্যে তা করা যায়নি। যাবে না হয়তো। তা রাজেনবাবুর মিশনের মতো ভয়ঙ্কর নয়, তা ছিল খুবই সহজ আর সুন্দর। অথচ কেন এমন হল? সে অবচেতন বিহ্বলতায় হাতড়াতে থাকল সে প্রশ্নের জবাব।

খানিক পরে অরুণ এল।··মুখটুখ ধুয়েছ? ধোওনি? তুমিও দেখছি আমার মাসতুতো ভাই। বাইরের দরজাও খোলনি দেখছি!

বলে সে দরজটা খুলে দিল। তারপর বারান্দায় গিয়ে ডাকল।···এসেছ তো রাত্রে। জায়গাটা ছাখোনি। দেখে যাও। এখানটা উঁচু বলে—ফুল ভিউ দেখতে পাবে।

রাহুল বেরোল। সত্যি, ভাবা যায় না—সাতবছরে ময়নাচকে কী হয়েছে! রাস্তার দিকটা এরই মধ্যে ভিড়ে গিজগিজ করছে। বাস লরী রিকসাও চলছে অজস্র। পুরনো গ্রামটা গাছপালার আড়ালে রয়েছে। সেই শিবমন্দিরের ত্রিশূল চূড়াটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ওখানেই ছিল ভবানীবাবুর বাড়ি।

অরুণ কাছে ঘন হয়ে আঙুল তুলে বলল, তোমার বাবার হোটেলটা চিনতে পারছ? ওই যে লাল বাড়িটার পাশে—হঁ্যা, হঁ্যা,···রিকশোর ষ্ট্যাণ্ডটা, ওই যে সাইনবোর্ড।

রাহুল তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকাল। একটা একতালা হলুদ রঙের ঘর—তার মাথায় সাইনবোর্ড আছে মনে হচ্ছে। পড়া সম্ভব নয় এতদূর থেকে।

অরুণ বলল, কাল বাবার ওখানে তাহলে সত্যি যাওনি?

রাহুল মাথা দোলাল।

যাওনি—বেশ করেছ। তবে···একটু ভেবে অরুণ হেসে বলল, তবে বাবা আর ছেলে! বাবার ত্রুটি ধরতে নেই হে। তোমার কর্তব্য তুমি করবে—তাতে দোষ কী? যেও—একবারটি যেও। বরং তোমাকে আমিই নিয়ে যাব সাথে করে। অনেকদিন আমার সঙ্গেও দেখা হয়নি মাষ্টারমশায়ের।

রাহুল গম্ভীর মুখে বলল, এখনও সবাই মাষ্টারমশাই বলে নাকি?

হু—তাই তো বলে। আমি যদ্দিন এসেছি, তদ্দিন ওইনামেই সবাইকে ডাকতে শুনেছি। শুনে আমিও তাই বলে ডেকেছি। আসলে লোকটা বড্ড ভালো ভাই—তোমার বাবা, বুঝলে রাহুল? উনি মেয়েটাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন—তুমি হয়তো জানো সেকথা।···

রাহুল বলল, কিস্যু জানিনে। দশ বছর পরস্পর দেখাই নেই। চিঠিপত্র বন্ধ হয়েছে অনেকদিন—মনে পড়ছে না কখন থেকে বন্ধ হয়েছে। আর চিঠিতে ওসব খবর ছিল না।

অরুণ অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, সে কি! জানে না? ঠিক আছে। বলব'খন। ওই মেয়েটা যে কী সাংঘাতিক কল্পনা করা যায় না ভাই। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে তো ওর বাবারও বনিবনা ছিল না। বাপ যেই ষ্ট্রোক হয়ে মরল—অমনি মেয়ে নিজের মূর্তি ধরল। বাপের যা কিছু সম্পত্তি বা টাকাকড়ি ছিল, দুহাতে বিলাস-ব্যসনে ফুঁকে দিলে একবছরেই। আজ কলকাতা কাল দিল্লী, পরশু বোম্বে। এবেলা কাটোয়া, তো ওবেলা চল পাকুড়ে মেলা বসেছে দেখে আসি। উচ্ছৃঙ্খল ভোগী প্রকৃতির মেয়ে আসলে। এদিকে মাষ্টারমশাই ছিলেন কতকটা ওদের ফ্যামিলির গার্জেনের মতো। ভবানীবাবু ওনাকে সেই চোখেই দেখতেন। মাষ্টারমশাই সরল ভীতু গোবেচারা মানুষ। দুহাতে মেয়েটাকে আর তার সম্পত্তি আগলানোর চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু শেষ অব্দি সামাল দিতে পারলেন না। মেয়েটির গারজেন-টারজেন থাকা তো দূরের কথা—তখন যেন চাকরেরও বেশি হয়ে পড়লেন। বয়সও হয়েছে—বুদ্ধিভ্রম ঘটা স্বাভাবিক তো বটেই। তাছাড়া দুর্বলতাও থাকতে পারে—সেটাও বলতে সংকোচ দেখছিনে। যাই হোক, শেষ অব্দি ঘটল এক কুচ্ছিত কেলেঙ্কারী। মেয়েটা নিজেই রটাল—বোঝ ব্যাপারটা।

রাহুল কৌতূহলী হয়ে শুনছিল। বলল, কী রটাল?

অরুণ চাপা গলায় বলল, পেটে বাচ্চা। আর এ জন্যে নাকি মাষ্টারমশাই দায়ী। অতএব তাকেই বিয়ে করতে হবে। বালবিধবার এ রকম-সকম দেখে

তো সবাই তাজ্জব। হলে কী হবে? এ তো আর সে পুরনো পাড়াগাঁ নেই—গ্রামনগরী। ছত্রিশ জায়গার ছত্রিশ জাতের নতুন নতুন লোক এসে জুটেছে। সমাজ বলে কিছু নেই টেই। তারপর মাষ্টারমশাই বিয়েতে রাজী হলেন।

··অরুণ ফিক করে হেসে বলল, রাগ করছ না তো রাহুল?

কেন?

ভাবছ না তো ছেলের কাছে বাবার কেলেঙ্কারী শোনাচ্ছি? অবশ্যি, এ তোমার বাবার কেলেঙ্কারী মোটেও নয়, ভাই—এ কেলেঙ্কারী সবটাই ভবানী-বাবুর মেয়ের। থাক্‌গে মরুকগে, বিয়ে চুকে গেল রাতারাতি। রেজিষ্ট্রি হয়েই চুকল। বাচ্চাও হল সত্যি-সত্যি। বাচ্চাটা আমি দেখিনি। লোকে বলেছে—ওর চেহারা নাকি · হঠাৎ অরুণ প্রসঙ্গ বদলে বলল, ব্রাশট্রাস সঙ্গে এনেছ তো? না থাকলে—ওই যে। দাতন ভেঙে নাও নিমগাছ থেকে। খেয়েদেয়ে দুভায়ে বেরোব। আমার নিজের কিছু কথা আছে।

রাহুল বিকৃত হেসে বলল, অরুণদা, বাচ্চাটার চেহারা আমার বাবার মতো—তাই না?

যাঃ! লোকের কথায় কান করতে আছে?···হাসতে লাগল অরুণ।

আমার চেহারাও নাকি অবিকল বাবার মতো।

ছেড়ে দাও ও কথা। যাও, ডাল ভাঙো।

আচ্ছা অরুণদা, বাবা হোটেল খুলতে গেলেন কেন?

সব পরে ডিটেল বলব খন। আগে—

উঁহু—শুনতে ইচ্ছে করছে।

হোটেল তোমার বাবা খোলেন নি—ভবানীবাবুর মেয়েই খুলেছে।

রাহুল এগিয়ে গিয়ে ফুলবাগিচার ধারে নিচু নিমগাছটা থেকে এক ঝটকায় একটা ডাল ছাড়িয়ে বলল, নেপালদা মারা গেছে জানো তো?

অরুণ বলল, জানি—শুনেছি।

আমিও একবার জোর বেঁচে গেছি। তারপর থেকে বাঁচার সাধটা ভারি শক্ত হয়ে জমাট বেঁধেছে মনে।···রাহুল এগিয়ে এসে বলতে থাকল।···তাই ভেবে ছিলাম, আর ও লাইনে পা দেব না। সবার মত ভদ্রটদ্র হয়ে চলব। আর সেজন্যেই ময়নাচকে বাবার কাছে এসেছিলাম। কিন্তু শালা আমার কপালে তা নেই। কী করি, বাৎলে দিতে পারো?

অরুণ বলল, পারি বইকি। সেজন্যই বলছিলাম না—তোমাকে দেখে মনে

জোর পেলাম। আমার ভাই একজন লোক দরকার—যেমনতেমন লোক নয়, হুঁদে লোক। কারণ, এই চোর ডাকাত গুণ্ডার জায়গায় আমার মতো নিরীহ লোকের দুপয়সা রোজগার করা সত্যি অসম্ভব। পরে বুঝিয়ে বলছি সব। তুমি এখানে থাকবে রাহুল। খুব ভালো হয় ভাই। পুষিয়ে দেব তোমাকে—কিছু ভেবোনা। থাকবে ?

রাহুল নির্বিকার দৃষ্টিতে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, বেশ তো। থাকব।

তিন

মুক্তকেশী হোটেলের সামনে রাস্তায় কয়েকটা মালবোঝাই ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। রাহুল একটা ট্রাকের আড়ালে দাঁড়াল। গ্রীষ্মের সূর্য ততক্ষণে আরও উজ্জ্বল হয়েছে। রোদের তাপ বেড়েছে। কিন্তু আগের দিনের কালবোশেখির ঝড়বৃষ্টির পর আজ আবহাওয়ায় একটুখানি স্নিগ্ধতার ভাব রয়ে গেছে। আজ এখানে হাটবার। ময়নাচকের পুরানো হাটটা এখনও সপ্তায় দুবার চলেছে—নতুন বাজার তাকে তাড়িয়ে দিতে পারেনি। শুধু তার জায়গাবদল ঘটেছে। বড়রাস্তার দুপাশে সে নিজের জায়গা খুঁজে নিয়েছে। আগে হাটটা বসত গ্রামের ভিতর শিবমন্দিরের পাশে।

ভিড় আর গোলমাল ছাড়িয়ে সারাক্ষণ মাইকে বিচ্ছিরি আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মাইক একটা নয়—অনেকগুলো। রাজ্যের তুকতাকওয়ালারা বজ্রনির্ঘোষে লোককে সামনে তাতাচ্ছে। তার মধ্যে সন্তর্পণে চলেছে বাস ট্রাক রিকশো সাইকেলের আনাগোনা। একটুতে কান ঝালাপালা হয়ে ওঠে। রাহুল ভাবছিল, অরুণ গেছে যাক্—সে এই সুযোগে কেটে পড়বে। কোথাও চায়ের দোকানে গিয়ে বসে থাকবে। এখানে এখন সবচেয়ে জরুরী কাজ অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হওয়া। ইতিমধ্যে অরুণের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে এলাকার প্রায় সবটাই দেখা হয়ে গেছে। কত নতুন বাসিন্দা এখানে এসেছে! ময়নাচক বা এলাকার কোন গ্রামের লোকের সঙ্গে চালচলনের মিল এদের সামান্য। রীতিমত শহরের পরিবেশ—তেমনি পোশাক-আসাক, স্মার্ট ছেলে-মেয়ে, অতিচালাক সবজান্তা ভদ্রলোকেরা। রেডিও, খবরের কাগজ আর ওই

সিনেমাঘরটা এনে ফেলে হাইওয়ে তার চূড়ান্ত কাজটা শেষ করেছে। এই কয়েকহাজার বাসিন্দার ভিতর থেকে রাহুলকে নিজের শিকার খুঁজে বের করতে হবে। সে হতাশ বোধ করছিল। আনমনা হয়ে পড়েছিল। আর সেই সময়—'এই যে তোমাদের মুক্তকেশী' বলে অরুণ ট্রাকগুলোর সরু ফাঁক গলিয়ে চলে গেছে। ভেবেছে যথারীতি রাহুলও তার পিছনে যাবে।

রাহুলের পা দুটো আড়ষ্ট। পালিয়ে যাবে? কিন্তু হঠাৎ মনে হল, ইতিমধ্যে অরুণ তার বাবার কাছে হাজির হয়েছে। এখন যদি সে পালিয়ে যায়, বাবার প্রতি তার মনোভাবটা খুব সহজেই প্রকাশ হয়ে পড়বে। একটু দ্বিধায় পড়ে গেল সে। না—বাবার কথা ভেবে নয়, গঙ্গার কথা ভেবে!

ওদিক থেকে অরুণ তাকে ডাকছিল—রাহুল, রাহুল! তারপর আচমকা তার সামনে যে এসে দাঁড়াল, তাকে সে ঠিক সেই মুহূর্তে চিনতে না পারলেও—সে যখন শান্তস্বরে বলল, এস—তখন তাকে চেনা গেল এবং পলকে সব অস্বস্তি আর ঘৃণার অতিসচেতন বিহ্বলতাটা কোথায় হারিয়ে জেগে উঠল একটা স্বাভাবিকতা। তার মধ্যে যেন কোন মালিন্য নেই—কোন প্রচ্ছন্ন এপিসোড লুকানো নেই।

হ্যাঁ, এই গঙ্গা। গঙ্গার এ শক্তি একদা প্রত্যক্ষ করেছিল রাহুল। সব-কিছুকে নিমেষে সহজ আর স্বাভাবিক করে তুলতে তার জুড়ি নেই।

কয়েকটা মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে ছিল রাহুল। সেই গঙ্গা! চওড়া নকসীপাড় ফিকে লাল রঙের শাড়ি, চাইনিজ কাট ব্লাউজ, কানে সাদাপাথরের ঝুঁড়ি, গলায় সোনার চেনলকেট, হাতে শাঁখা আর সোনার কাঁকন, এবং সধবার চরম চিহ্ন ডগডগে সিঁদুর সিঁথিতে রক্তরেখা! সেই গঙ্গা। শ্যাম যার গায়ের রঙ—যাকে বলা যায়, বাংলাদেশের কালো মেয়ে।

কিন্তু সেই গঙ্গা তো নয়। মুখের আদলে বালিকার প্রসন্নতা ছিল যার, এবং পাপকে যে পাপ বলে বুঝতে পারত না! তার চেহারায় প্রচ্ছন্ন ধ্বসের ছাপ লক্ষ্য করছিল রাহুল। যৌবনের দুরন্ত উচ্ছ্বাস দেখবার কথা ছিল যে শরীরে, সেখানে কী যেন ক্লান্তির আভাস। তাহলে কি নবীনা গঙ্গা অতিদ্রুত প্রবীণ মাষ্টার মহাশয়ের বয়সের অনুগামিনী হতে চেয়েছিল? হয়তো মেয়েরা এটা পারে। চোখ নামাল রাহুল। তার পায়ের দিকে রাখল। গঙ্গায় পায়ে আলতা। পাদুটোও চিনতে পারল না সে। মাঠের কুলঝোপে গিয়ে কাঁটা ফুটেছিল গঙ্গার পায়ে—থুথু দিয়ে সাফ করে সে বলেছিল, এই! কাঁটাটা তুলে দেবে? আজ ওই পায়ে তাকে প্রণাম করতে হবে না তো! পাগল, পাগল!

কাঁটা তোলার সময় গালে পা ছুঁইয়ে দিয়েছিল বলে রাহুল রাগে কতক্ষণ কথা বলেনি সেবার।

গঙ্গা যে নিজের টানের শক্তি কতখানি জানে, পরক্ষণে ঘুরে পা বাড়িয়েছে।
···চিঠি দিয়ে এলে উনি খুশি হতেন। শরীর ভালো না তো! ভুগছেন অনেকদিন। এসো।

রাহুল নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করল। তার সামনে আজ আর সেই গ্রামকন্যাটি অচেনা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না, এ মেয়েটি নিপুণা নগরবাসিনী। এর সঙ্গে নেপালদার 'সতীসাবিত্রী' বউর কোন তফাৎ নেই সম্ভবত। রাহুল যখন চওড়া বারান্দা ডিঙিয়ে বাঁপাশের সরু করিডোরে উঠল, সে দেখল যে আর তার কোন অস্বস্তি হচ্ছে না। রাগ ঘৃণা বিক্ষোভও মনে হচ্ছে অকারণ।

ডাইনে হোটেলের ঘর, কিচেন ইত্যাদি। বাঁয়ে সরু করিডোরের শেষে একটা উঠোন। উঠোনে অনেক ফুলগাছের ঝোপ। গঙ্গা ফুল ভালবাসত—তার মনে পড়ল। একপাশে টিউবেল আর উঁচু একটা ল্যাট্রিন। ওদিকের বারান্দাটা ছোট। দুটো ঘর। একটা বড়, অন্যটা ছোট। ছোট ঘরটার ভিতর অরুণকে সে মোড়ায় বসে থাকতে দেখল। বিছানার পাশে। বিছানায় উনিই কি বাবা! রাহুলকে দেখে তিনি শুধু মাথাটা সামান্য তুললেন। রাহুল পুতুলের মতো চাদরঢাকা পাদুটোয় হাত রেখে কপালে ঠেকাল। তারপর দাঁড়িয়ে রইল। হৃষিকেশ বড় বড় দুটি চোখে তাকে দেখছেন—বিবর্ণ নিষ্পলক চোখ। অরুণ বলল, দাঁড়িয়ে কেন! বসো—রাহুল।

গঙ্গা ঘরের মেঝেয় একটু দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল। স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল রাহুলের। হৃষিকেশ কিছু না বললেও সে তাঁর বিছানার পাশে সাবধানে বসল।

হৃষিকেশ কাসলেন। গলায় ঘড়ঘড় শব্দ হল। তারপর বললেন, অরুণবাবুর কাছে তোমার আসার কথাটা শুনলুম। কদিন থেকে স্বপ্ন দেখছিলুম। সাউণ্ড্ স্লিপ তো আর হয় না। তোমাকে স্বপ্ন দেখছিলুম। এসে ভালই করেছ।
···একটু চুপ থেকে যেন একটা কথা খুঁজে তারপর বললেন হৃষিকেশ—টের পাচ্ছি, আমার দিন ফুরিয়ে আসছে। আর বাঁচবো না।

অরুণ শশব্যস্তে বলল, আরে না না মাষ্টার মশাই! সামান্য অসুখবিসুখ সবারই হয়। তাছাড়া এমন কি বয়স হয়েছে যে—

হাত তুলে হৃষিকেশ বললেন, বয়সের কথা তুলে ঠাট্টা করোনা অরুণবাবু।

অরুণ অপ্রস্তুত হেসে বলল, না—মানে, আজকাল যত কঠিন অসুখই হোক

—তার ওষুধের তো অভাব নেই! প্রশান্তবাবুকে দেখাচ্ছেন, না চৌধুরীকে? ডকটর চৌধুরী কিন্তু হার্টস্পেশালিস্ট মাষ্টারমশাই, তা জানেন?

হৃষিকেশ সেদিকে কান না করে বললেন, অরুণবাবু, একটুখানি উপকার করবে? ও বোধ হয় ওদিকে ব্যস্ত রয়েছে। তুমি একবার ঘোঁতনকে ডেকে দেবে? কিছু মনে করো না—যে ভাগাড়ে পড়ে আছি, কেউ নেই!

না, না। বলে অরুণ উঠে দাঁড়াল। এক্ষুণি ডাকছি। সেই দাঁত উঁচু ছোকরাটা তো?

সে যেতে যেতে একটু দাঁড়িয়ে রাহুলকে লক্ষ্য করে ফের বলল, ভাই রাহুল—আমি কিন্তু এখন আর আসছি না। তুমি বাবার সঙ্গে কথাটথা বলে সোজা আমার ওখানে চলে যেও। কেমন?

হৃষিকেশ বললেন, রাহুল আপাতত এখানেই থাকছে। তুমি শুধু ঘোঁতনকে ডেকে দাও।

তাঁর কণ্ঠস্বরে চাপা ক্ষুব্ধতাটুকু লুকোন গেল না। অরুণ মুচকি হেসে চলে গেল—রাহুলের দিকে চোখের ঝিলিকও দেখিয়ে গেল। রাহুল গম্ভীর মুখে বসে রইল।

হৃষিকেশ এবার কণ্ঠস্বর খুব চাপা করে বললেন, আমি জানি, সহজে তুমি অবাক হবার ছেলে নও রাহুল—অবাক তুমি হবে না কিন্তু আমার এই অবস্থার জন্যে আমাকে যদি দায়ী করো, খুব ভুল হবে। কেন ভুল হবে জানো? মানুষ সব ব্যাপারে নিজের প্রভুত্ব খাটাতে পারে না। কোন কোন ক্ষেত্রে তাকে নিজের কাছেও হার মেনে অসহায় আর উদ্বিগ্ন দর্শকের মতো বসে থাকতে হয়। আমি বরাবর সেইরকম অসহায়, সেইরকম উদ্বিগ্ন দর্শক হয়ে নিজের আচরণগুলো লক্ষ্য করছি, রাহুল। শুধু জেনে রাখো—এর কোনটাই আমার আয়ত্তে ছিল না!

রাহুল আস্তে জিগ্যেস করল, কী?

তার এই ছোট্ট 'কী' প্রশ্নে কী টের পেয়েই হৃষিকেশ বললেন—এই বিয়ে, কাজকারবার, হোটেল—এগুলো। জেনেশুনে আমি বিষ খাচ্ছিলুম। এ্যামবিশান—উচ্চাকাংখা আমাকে সাতবছর আগে দূর থেকে এখানে টেনে এনেছিল। সেটাই আমার নিয়তির ভূমিকা নিল। আর—তোমার মা—ছেলের সামনে মায়ের নিন্দা করা অশোভন, তোমার মাকে সব সময় একটা দারুণ বোঝা বলে মনে করতুম। সেটা স্বীকার করতে লজ্জা নেই। বোকার মতো রমাকেই ভাবতুম আমার জীবনের যাবতীয় দুঃখকষ্টের কারণ। তাই

পথে হঠাৎ সে মারা গেলে স্বস্তির নিশ্বাস পড়েছিল। হ্যাঁ, এবার তবে নতুন করে জীবনটা সুরু করার সুযোগ খুঁজতে হবে। এ্যামবিশান—খুব ছেলেবেলা থেকে ওই শয়তান এ্যামবিশান আবার পিছনে ছায়ার মতো ঘুরঘুর করত। শত দুঃখকষ্টে দুর্যোগেও সে পালায় নি। রমা মারা গেল। আমি এখানে এসে ভবানীবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে একটু করে সচ্ছলতার মুখ দেখতে পাচ্ছিলুম—ততো পিছনের জীবনটা কুৎসিত ঠাট্টার মতো লাগছিল। ভুলতে চাচ্ছিলুম তাকে। এমন কি তোমাকেও—হ্যাঁ রাহুল, তোমাকেও অস্বীকার করার ঝোঁক আমাকে গ্রাস করছিল। যেন আমি এক মুক্ত পুরুষ—কোন বন্ধন নেই, অতীত নেই—আছে মুক্তি আর বিশাল ভবিষ্যত। তাকে সার্থক করে তুলতেই হবে। দুরন্ত ভোগের প্রবৃত্তি আমাকে অস্থির করে তুলল সঙ্গে সঙ্গে। সব অতৃপ্ত কামনা বাসনা নেচে উঠল। আমি তখন নিজের বয়সকে ভুলে গেলুম। এখানে যখন আসি, তখন সবে আমার বয়স বাহান্ন পূর্ণ হয়েছে। আগুন নেই, জ্বালা আছে। আর . .

রাহুল বলল, আপনার কাছে তো কৈফিয়ৎ চাইতে আসি নি। ওসব কথা থাক্।

হৃষিকেশ উত্তেজিতভাবে বিছানা থেকে একটু উঠে বললেন, কৈফিয়ৎ নয় রাহুল। কনফেশান। ঈশ্বর মানিনে বলেই মনের পাপ মনে চেপে রাখতে পারিনে। ছটফট করি। বলার জন্যে মানুষ খুঁজি—পাইনে। আজ তুমি এসেছ, তাই তোমাকে বলছি। না এলে কিছু বলা হত না। তাছাড়া, তোমারও তো অভিমান থাকতে পারে।

রাহুল বলল, ওসব নেই-টেই। আপনি চুপ করুন।

হৃষিকেশ দরজার বাইরেটা দেখে নিয়ে বললেম, ঘোঁতনটা এল না দেখছ? এ কি আমার মানুষের পুরীতে বাস করা? সব রাক্ষস-রাক্ষসীর রাজত্ব। দেহ অশক্ত—তা না হলে . .

হঠাৎ রাহুলের হাত ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন হৃষিকেশ, রাহুল, আমাকে এখান থেকে নিয়ে পালাতে পারিস বাবা? আমার কেমন যেন সন্দেহ—তোর ছোটমা আমাকে শ্লোপয়জন করছে। ওর হাত থেকে ওষুধ খেতে আমার ভয় করে। ওষুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। ও সব পারে, বুঝলি খোকা? ও একটা সর্বনাশী!

বারান্দায় গঙ্গাকে দেখা গেল সেই মুহূর্তে। হৃষিকেশ আগের মতো শুয়ে পড়লেন। গঙ্গার হাতে একটা ট্রে। সন্দেশের প্লেট, চায়ের কাপ। ঘরে ঢুকে

ট্রেটা নিঃশব্দে খালি মোড়াটায় রাখল। তারপর আঁচলে ঠোঁট মুছে শান্ত হাসল। ······শুনলে তোমার রাগ হতে পারে রাহুল, তোমার কথা যেন আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম! কী? রাগ হচ্ছে না শুনে?

হৃষিকেশ পলকে বদলে অন্যমানুষ হয়ে গেছেন। অদ্ভুত শব্দে হাসলেন। রাহুল হাসল না। দেয়ালের ক্যালেণ্ডারটার দিকে তাকিয়ে বলল, নাঃ রাগ কিসের?

গঙ্গা বলল, হাত লাগাও। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

রাহুল বলল, খেয়ে বেরিয়েছি—অরুণদার ওখা ন।

গঙ্গার কণ্ঠস্বরে একটু তিরস্কারের আভাষ। ···হ্যাঁ, তুমি অরুণবাবুর ওখানে উঠেছ, তা জানলুম। কিন্তু আমরা হয়তো অরুণবাবুর চেয়েও আপনার লোক। ও আদিখ্যেতার কী দরকার ছিল—তুমিই জানো।

রাহুল সামান্য ক্ষুব্ধ হল। ·····আদিখ্যেতা কিসের? চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হল—সে টেনে নিয়ে গেল। ব্যস!

গঙ্গা বলল, কিন্তু ময়নাচকে যখন আসছিলে—আমি পর হতে পারি, তোমার বাবার কাছেই নিশ্চয় আসছিলে?

রাহুল একটু ভেবে জবাব দিল, হ্যাঁ।

তারপর শুনলে তোমার বাবা ফের বিয়ে করেছেন, অমনি · · খিলখিল করে হেসে উঠল গঙ্গা। ······অমনি ভীষণ রাগ হয়ে গেল, তাই না? অথচ তোমার একটা বিশ্বাস রাখা উচিত ছিল তাঁর ওপর। তাঁর দিকটা ভাবা উচিত ছিল। ····· গঙ্গার হাসিমুখটা ক্রমশ গম্ভীর হল বলতে বলতে। ···· বয়স হয়েছে, অসুখ-বিসুখ আছে। বিদেশে একা পড়ে রয়েছেন। দেখাশোনার লোক নেই কাছে। একমাত্র যোগ্য ছেলে—সেও বাইরে। খোঁজ নিতেও তার সময় হয় না। তখন যদি কেউ সেটা লক্ষ্য করে ওঁকে দেখাশোনার ভার নেয়, আশা করি সে খুব একটা অন্যায় করে না।

হৃষিকেশের কণ্ঠস্বরে কে অশোভন হেসে বলল, হ্যাঁ—ভাগ্যিস ও ছিল রাহুল। ওর সেবাযত্ন না পেলে আমি কবে মরে যেতুম বাবা।

গঙ্গা বলল, তাছাড়া এ বয়সে মানুষ কেমন একা হয়ে পড়ে, আমি জানি। আমার বাবাকে দেখে-দেখে এটা আমার শেখা হয়েছিল। তারপর বাবা মারা গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে যে পশুগুলো চারপাশে ওঁৎ পেতে ছিল, বেরিয়ে এলো আমার সামনে।

হৃষিকেশ সায় দিয়ে বললেন, ওঃ! মানুষ যে কী শয়তান, ভাবা যায় না। একটা বাচ্চা মেয়ে—তার সামান্য মুখের গ্রাস! ভবানীবাবু তো দেনার দায়ে

ফতুর হয়েই মারা গেলেন। কণ্ট্রাক্টরিতে লোকসানের পর লোকসান হচ্ছিল। আমার অভিজ্ঞতা তেমন ছিল না এ ব্যাপারে। যাই হোক, তখন আমাকেই সামনে দাঁড়াতে হল ওঁর মেয়ের। মামলা-মোকদ্দমা হাঙ্গামা—সে একটা ইতিহাস!

গঙ্গা বলল, সেদিন তোমার বাবা না থাকলে আমি আজ রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াতুম জানো?

রাহুল বিরক্ত মুখে বলল, তোমরা দুজনে আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে সুরু করেছ দেখছি! আমি কি কৈফিয়ৎ চেয়েছি নাকি?

গঙ্গা তীব্রদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, তাহলে কেন তুমি সোজা এখানে আসো নি?

রাহুল জবাব দিল না।

গঙ্গা বলল, আসোনি—তার মনে এটা তুমি মেনে নিতে পারোনি। কেন, তা বলবে?

রাহুল সোজা তাকাল ওর দিকে। তার ঠোঁটে নিজের অজানতে সূক্ষ্ম একটা ব্যঙ্গের রেখা ফুটে উঠল।···কেন—তা তোমারই জানা উচিত। যদি তোমার অন্তত স্মৃতি বলে কিছু থাকে মনে।

বলেই সে উঠে দাঁড়াল। পা বাড়াল।

পলকে গঙ্গার চোখ দুটো জ্বলে উঠেছিল। সে রাহুলের দিক থেকে দৃষ্টিটা নামিয়ে আনল পরক্ষণে। চাপা শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দে তার উত্তেজনা ধরা পড়ছিল। হৃষিকেশ ব্যস্তভাবে বললেন, রাহুল, খোকা! চলে যাচ্ছিস কেন? বোস। তোকে আমার ভীষণ দরকার—অনেক কথা বলতে বাকি আছে যে। ওগো, তুমি ওকে ধরো—চলে যাচ্ছে যে!

গঙ্গা কোন কথা বলল না। সেও উঠে দাঁড়াল। তারপর পাশের দরজা দিয়ে ওদিককার ঘরে চলে গেল। রাহুল উঠোনের দিকের দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, আমি আপনার উপর রাগ করিনি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

হৃষিকেশ যেন অস্ফুট আর্তনাদ করলেন।···না না। একটা ভীষণ জরুরী কথা আছে তোর সঙ্গে। তুই কাছে আয়। কানে-কানে বলি।

রাহুল বলল, ঠিক আছে—পরে আসব'খন। আমি তো এখানেই থেকে যাচ্ছি। অরুণদার কাছে। চাকরীটা ভালই। দেখব—আপনার ভাল চিকিৎসা-টিকিৎসা করা যায় কিনা। আপনি ভাববেন না।

হৃষিকেশ ওঠার চেষ্টা করে চাপা গলায় বললেন, না খোকা—না। কথা

শোন, তুই এখানে থাকিসনে বাবা। শীগ্‌গির পালা—নৈলে বিপদে পড়ে যাবি! এ খুব সাংঘাতিক জায়গা। তুই বরং আজই চলে যা রাহুল।

রাহুল চমকে উঠেছিল। কিন্তু সংযতভাবে বলল, বিপদ আমার অনেক দেখা আছে। আপনি ওকথা বলে কোন লাভ হবে না।

জানি, জানি!·· যেন আবার আর্তনাদ করলেন হৃষিকেশ।· তাই তোর মঙ্গলের জন্যে বলছি, খোকা। এখানে তুই—

গঙ্গা পাশের ঘর থেকে এসে বলল, দেওয়া খাবার না খেয়ে গেলে অকল্যাণ হবে গেরস্থর। সেটা কারো জানা উচিত। যেচে এসে অপমান করা হল—তাও না হয় ভাগ্যের দোষে সইবে। কিন্তু আমারও তো ছেলেপুলে আছে।

রাহুল বাবার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকিয়েছিল। এবার সে পা বাড়াল। সাঁৎ করে বারান্দা থেকে করিডোরে গিয়ে ঢুকল। আর পিছন ফিরল না।

বাইরে এসে মন খারাপ হল। সে কিন্তু সহজ আর স্বাভাবিক থাকতেই চেয়েছিল। ওঁদের অপমান করবার ইচ্ছা একটুও ছিল না। অথচ একটা ছোটখাটো বিস্ফোরণ ঘটে গেল যেন। নিজেকে সে সামলাতে পারল না আদতে।

কিন্তু বাবার কথাগুলো যেমন হেঁয়ালি মনে হচ্ছে। গঙ্গা ওঁকে শ্লোপয়জন করেছে বলে ওঁর ধারণা হয়ে গেছে। বাবা গঙ্গাকে বিশ্বাস করেন না বোঝা গেল। অবশ্য সেটা তো স্বাভাবিকই। একটি দুরন্ত-যৌবনা মেয়ের স্বামী হয়ে পুরোপুরি সবদিক স্বচ্ছন্দ রাখা আর এ বয়সে ওঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বাবা একধরনের হীনমন্যতায় ভুগছেন। হয়তো একসময় রাহুলের মেয়ের ক্ষেত্রেও এমনি একটা হীনমন্যতাবোধ ওঁর ছিল। আসলে হৃষিকেশের চরিত্রের যেন এই একটা বিশ্রী খুঁত—নিজের শক্তির প্রতি সংশয়। এইসব লোকের মোটেও বিয়ে করা উচিত নয়। অথচ এরা যেন নারীসঙ্গবর্জিত হলে পৃথিবীটা শূন্য মনে করে।

আর গঙ্গা! তার কৈফিয়ৎটা বেশ আশ্চর্য। একজন নিঃসঙ্গ বুড়োমানুষ—যে গঙ্গাকে নাকি আপদবিপদ থেকে রক্ষা করেছে, তার নিঃসঙ্গতা দূর করতে·· ···

ছেনাল খানকি কোথাকার! রাহুলের মুখটা বিকৃত হয়ে গেল। রাগে ভিতরটা গরগর করে উঠল, এবং সেই রাগ বাবার দিকেও ধাবিত হল একসময়। হৃষিকেশবাবু, তুমি যদি মনে নিষ্পাপ থাকতে, তাহলে এসবক্ষেত্রে যা সঙ্গত আর

শোভন হত—সেটাই করতে। তার মানে, তোমার দুর্দান্ত ছেলের পাত্রী হিসেবে ওই জংলী মেয়েটাকে তুমি নির্বাচিত করতে। তা তুমি করনি। সুতরাং তুমিও—হৃষিকেশবাবু, তুমিও একটি ইতর। জঘন্য লম্পট।

সিগ্রেট নেই পকেটে—কেনার জন্যে সে সামনের দোকানটায় গেল। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে অবাক হল। রুক্ষ মারমূর্তি চেহারাটা! চোখদুটো ভীষণ চকচক করেছে। সে সিগ্রেট কিনতে কিনতে চুল আঁচড়ে নিল। পাশে একটি লোক পানের জন্যে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আয়নার ভিতরে তার প্রতিবিম্বের দিকে প্রশ্ন করল, আপনাকে চেনাচেনা লাগছে যেন। কোথায় থাকেন বলুন তো?

লোকটা তার চেয়ে বেশ উঁচু। গায়ে খয়েরীরঙের স্পোর্টিং গেঞ্জী, নীলচেরঙের টাইট প্যান্ট পরনে। খাড়া নাকের দুপাশে চোখদুটো অস্বাভাবিক ছোট। সূচলো গোঁফটা তিরতির করে কাঁপছে। হয়তো অভ্যাস। রোদপোড়া তামাটে রঙ শরীরটা বেশ বলিষ্ঠ। রাহুল খুঁটিয়ে দেখল ওকে। ওর বয়স চল্লিশ বেয়াল্লিশের কম নয়। রাহুল বলল, বহরমপুর।

আমাদের মুক্তকেশীর মাষ্টারমশায় কেউ হন নাকি?

প্রশ্নটা কাল রাতের সেই চা-ওলার মতো রাহুল বিরক্ত হয়ে বলল, হ্যাঁ।

তাই বলুন! লোকটা হাসল।...আপনিই তবে মাষ্টারমশায়ের ছেলে। আমার নাম মণিশঙ্কর—মণিশঙ্কর ঘোষ। আপনার বাবার মুখে অনেক কথা শুনেছি। কবে আসা হল?

রাহুল হাসবার চেষ্টা করে বলল, কী কথা শুনেছেন?

মণিশঙ্কর আঙুলের ডগায় চূণ নিয়ে জিভে রাখল। সে অনেক। আপনার নামটা কী যেন?

রাহুল।

রাহুল! ভারি চমৎকার নাম তো। মণিশঙ্কর জোরে হেসে উঠল। আরও বলল, আপনার বাবা বলতেন বটে, মনে পড়ল। বলতেন, অমন শান্তশিষ্ট ছেলে ছিল—হঠাৎ শহরে পড়তে গিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আপনাকে দেখে কিন্তু নষ্ট হওয়া ছেলে লাগে না। আসলে সেকেলে লোকেরা একালের ছেলেদের রকম-সকম বুঝতে পারেন না কি না! তাই ছেলেদের সব কিছুতেই ওঁদের সন্দেহ!

লোকটার কথায় অন্তরঙ্গতার সুর আছে। এ সেই জাতের লোক—যাদের মুখে তেঁতো কথা শুনতেও মিষ্টি লাগে। তবে বাবার জনপ্রিয়তা টের পাওয়া

যাচ্ছে ক্রমশ। রাহুলও হেসে ফেলল সশব্দে। বলল, এখানে কোথায় থাকেন আপনি ?

বলার পরক্ষণেই রাহুল আবিষ্কার করল, মণিশঙ্করের একটা মোটর সাইকেল আছে। সেটা তার কাছেই দাঁড় করানো। মণিশঙ্কর সেটার সীট সাফ করার ভঙ্গীতে থাপ্পড় মেরে জবাব দিল—কাছেই থাকি। আসবেন সময়মতো। আপনি আমাদের নিজের লোক মশাই। হৃষিবাবু এ ময়নাচকের সবারই আপন মানুষ। হ্যাঁ—আমি থাকি মাইলটাক পশ্চিমে—ব্রীজ পেরিয়ে একেবারে খাঁখাঁ মাঠে।

রাহুল এগিয়ে এসে বলল মাঠে কী করেন ?

একটু আধটু চাষবাস আর ফলের বাগান-টাগানও আছে। মেকানাইজড্ এগ্রিক্যালচার করছি। অবশ্যই আসবেন কিন্তু। ভারি সুন্দর জায়গা—নদীর ধারে। কী আর করব বলুন ? ব্যবসা করে পিতৃপুরুষ কিছু কানা কড়ি আর জমিজমা রেখে গিয়েছিলেন। যা যুগ পড়েছে, ব্যবসাও খুব সুবিধেজনক নয়—আমি ওটা পারিও না আসলে। এদিকে জমিজমাতেও আজকাল ঝঞ্চাট অনেক। যাই হোক, এ একটা নেশা বলতে পারেন। এবার মার্চে সদরের এগ্রিক্যালচার একজিবিশানে কয়েকটা প্রাইজ পেয়েছি। এখন কৃষিই আমার লক্ষ্মী ! আসবেন কিন্তু। নদীর ধারে গেলেই দেখতে পাবেন—হাইওয়ে থেকে জাস্ট এক ফার্লং মাত্র। শঙ্করবাবুর খামারবাড়ি বললে ভূতে দেখিয়ে দেবে।

মোটর সাইকেলে চেপে মণিশঙ্কর চলে গেল। রাহুল একটু আশ্বস্ত হল। আসলে পরিচয় হওয়া খুবই দরকার তার। হয়ে যাবে সহজেই—যা মনে হচ্ছে। সে উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটতে থাকল। তারপর কিছুদূর এগোতেই একটা অভাবিত কাণ্ড ঘটে গেল।

সামান্য দূরে একটা ভিড় দেখা যাচ্ছিল। কাছাকাছি যেতেই জোর চেঁচামেঁচি শোনা গেল। মনে হচ্ছে দুটি বিবদমান পক্ষকে লোকেরা সামলানোর চেষ্টা করছে। রাহুল কৌতূহলী হয়ে উঁকি মারল। মিষ্টির দোকানের সামনে একটা কিছু অনাছিষ্টি কাণ্ড হচ্ছে নির্ঘাৎ। সামনে একটা মারমুখী যুবক ঘুঁষি পাকিয়ে তেড়ে আসছে—ট্যারা চোখ, মস্তান মার্কা চেহারা। তাকে আটকানোর চেষ্টা করছে কয়েকজনে। উঁকি মেরেই অন্য পক্ষকে দেখেই স্তম্ভিত হয়ে গেল রাহুল। অরুণদা ! সে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আরও হতবাক হল। অরুণদার ঠোঁট কেটে গেছে। রক্তের ছিটে লেগে রয়েছে। লাল চোখে সে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। হাঁফাচ্ছে। সেই ছোকরাটা কদর্য ভাষায় গাল দিতে

দিতে বারবার তেড়ে আসছে। রাহুল সামনে গিয়ে, কি হয়েছে অরুণদা, বলার সঙ্গে সঙ্গে অরুণ লাফিয়ে উঠল।···এসেছিস্ ভাই? ছাখ, ছাখ—শালা আমাকে মেরেছে! ওই খানকির বাচ্চার এত স্পর্ধা যে আমার গায়ে হাত তোলে!

অরুণ হাউহাউ করে প্রায় কেঁদে উঠল। রাহুল দু পা বাড়িয়ে মারমুখী যুবকটির সামনে দাঁড়াল।······কী হয়েছে? ওঁকে মেরেছ কেন?

যুবকটি দাঁত ছরকুটে জবাব দিল, মেরেছি—আরও মারব শালা ঢ্যামনাটাকে। তুমি কে হে নাক গলাতে আসছ? কেটে পড়োদিকি।

পাশ থেকে তার বয়সী একজন বলে উঠল, চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা। এ যে নতুন মাল দেখছি।

ভিড়টা চুপ। বিনাপয়সায় মজা দেখার সুযোগটা সবাই উপভোগ করতে চায় যেন। রাহুল কঠোরস্বরে বলল, কেন মেরেছ?

ট্যারা যুবকটি ভেংচি কেটে বলল, কেন মেরেছ? ময়নাচকের নন্দর এটা অভ্যেস। মানুষ পেলেই মারে।

ভিড়টা খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠল চারপাশে। রাহুলের কান গরম হয়ে গেল। হয়তো বেশি কিছু করে ফেলার উৎসাহ পাচ্ছিল না সে—এই কুৎসিত হাসির কোরাস তাকে পলকে ক্ষেপিয়ে দিল। সে আচমকা যুবকটি অর্থাৎ সেই নন্দর জামার কলার ধরে চিবুকে একটা নমুনাস্বরূপ 'তিননম্বরী' চালাল। নন্দ আটকাতে হাত তুলেছিল—হাতটা নিজের দাঁতে গিয়ে লাগবামাত্র ঠোঁট কেটে রক্ত দেখা দিল। রাহুল এবার তার 'দুনম্বরী' ঝাড়ল নাকের পাশে। পরক্ষণে সে নিজেকে আক্রান্ত দেখল চারপাশ থেকে। নন্দর সঙ্গীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার ওপর। এলোমেলো চড় কিল ঘুষি লাথি চলেছে।

রাহুলের এ অভিজ্ঞতা নতুন নয় মোটেই। এতে সে অভ্যস্ত। চারপাঁচটি বদমাসকে একা কাবু করা তার ক্ষমতার বাইরে নয়। প্রতিপক্ষ কয়েকটা ঘুষি ও লাথি খাবার পর রাহুল দেখল একজন ইট তুলেছে হাতে। ইটটা তার মাথার পাশ দিয়ে বেরিয়ে মিষ্টির দোকানের কাছে গিয়ে লাগল। ঝনঝন শব্দ হল। রাহুল লাফ দিয়ে ছোকরাটার ওপর পড়ল। সে পেটে ঘুষি খেয়ে পড়ে গেল। পরক্ষণে অরুণের চিৎকার শুনল সে। ···ড্যাগার, ড্যাগার! রাহুল! ওরে বাবা!

নন্দর হাতে চকচকে ছুরিটা দেখতে পেল সে। আরেক লাফে ওর ছুরিধরা-হাতের কবজিটা ধরে ফেলল তক্ষুনি। কিন্তু হাতের একপাশটা কেটে গেল

অনেকখানি। রক্ত বেরিয়ে এল। দুজনে ধ্বস্তাধ্বস্তি হতে লাগল। রাহুলকে অবিশ্রান্ত এই সুযোগে ঘুষি মারছিল নন্দর সঙ্গীরা। রাহুল ক্রমশ অবশ হয়ে পড়ছিল। ছুরিধরা হাতটা সে তবু ছাড়ল না। সে টের পেল ছুরিটা ক্রমশ কেটে বসছে তার হাতে। একসময় তার হাত শিথিল হয়ে এল।

অরুণ সমানে চেঁচামেচি করছে। ভিড়টা সামান্য তফাতে সরে গিয়ে মজা দেখছে। রাহুল টলে পড়ে যাবার মুহূর্তে কার ভারি গলায় হুকুম শুনল, নন্দ ছেড়ে দে ওকে। এই শালার ব্যাটা শালা!

নন্দ তার হাত ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল রাহুল। আচ্ছন্ন চোখে তাকাল। একটি লম্বাচওড়া বিশাল লোক এসে দাঁড়িয়ে আছে। হাসছে চাপা কৌতুকে। অরুণ তাকে হাতমুখ নেড়ে কী বোঝানোর চেষ্টা করছে। কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। তারপর রাহুল উঠে দাঁড়াল। অক্ষত বাঁহাতে অবশিষ্ট শক্তি দিয়ে—আচমকা সেই লোকটিকেই ঘুষি মেরে বসল।

লোকটা ভারি সেয়ানা। খপ করে তার মুঠোটা ধরে সশব্দে হেসে উঠল। তারপর অন্যহাতে রাহুলের জামার কলারও ধরে ফেলল। রাহুল নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল—কিন্তু পারল না। সে ক্লান্ত, আহত—সর্বাঙ্গ ব্যথায় আড়ষ্ট। আর এই লোকটার শরীরে যেন অসুরের শক্তি।

লোকটা শক্ত হাতে রাহুলের জামার কলার ধরে তার মুখটা সোজা রাখল এবং পর পর দুটো ঘুষি চালাল দুদিকের চোয়ালে। রাহুল অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

যখন জ্ঞান হল তার, সে দেখল অরুণের ঘরে শুয়ে আছে। আলো জ্বলছে। সামনে অরুণকে দেখতে পেল। অরুণ বলল, উঁহু—নড়ো না। চুপচাপ শুয়ে থাকো।

রাহুল টের পেল তার ডানহাতটা ভারি—সারা শরীর অবশ। কিন্তু কোন যন্ত্রণা হচ্ছে না। একটু পরে সে বুঝল যে চোয়াল নড়ানো যাচ্ছে না। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আছে দুদিকে। তার কথা বলার ইচ্ছে করছিল। ঠোঁট ফাঁক করল। কিন্তু কথা বলা সম্ভব হল না।

অরুণ কাঁদোকাঁদো স্বরে বলল, আমিই শালা যতো নষ্টের গোড়া! মিছেমিছি তোমার কপালে এত কষ্ট এনে দিলুম! উঃ! কেন যে এ শয়তানের রাজ্যে এসে জুটেছিলুম! এখানে কি মানুষ আছে কেউ? সব জানোয়ারের রাজত্ব

ভাই রাহুল। আর দেখলে তো সব স্বচক্ষে! ওই নন্দ—নন্দ আমার এখানেই কাজ করত। বুঝলে? বিশ্বাস করে পার্টির কাছে টাকাপয়সা আদায়ের ভার ও ব্যাটার ওপর দিয়েছিলুম। তিন-তিনহাজার টাকা মেরে কেটে পড়ল ব্যাটা। তখন ওর মুরুব্বী সানু চাটুয্যেকে গিয়ে ধরলুম—এই তোমার চ্যালার কাণ্ড। একটা ফয়সালা করে দাও। সানু মিটমাট করে দিলে। আসলে ভদ্রবংশের ছেলে তো সানু চাটুয্যে—এখনও বিবেকবুদ্ধি কিছু আছে। তা নন্দ রাজী হল। রাজী না হলে উপায় আছে আর? এলাকায় সানুর নামে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়। এখন—রাজী তো হল নন্দ। বারোটা কিস্তিতে টাকাটা শোধ করে দেবে। প্রথম দুটো কিস্তি বেশ ভদ্রভাবেই দিল। থার্ড কিস্তির বেলা শালা খানকীর বাচ্চা টালবাহানা সুরু করল। দিনের পর দিন ঘোরাচ্ছে। কাঁহাতক আর পারা যায়? আজ শালাকে ধরে ফেললুম ওখানে—তারপর দুটো কথা কথান্তর হতে হতে শুওরটা আচমকা আমাকে মেরে বসল! …যাক্ গে, ভেবো না। ও টাকা আমার দরকার নেই। এখন তোমার জন্যে আমি মাষ্টার মশাইকে মুখ দেখাব কেমন করে ভাবতে পারছিনে ভাই। নিশ্চয় সব কথা কানে যাবে ওনার।

শীলা এসে বলল, দাদা, গরম দুধ।

রাহুল দেখল শীলা একটা প্লেটের ওপর দুধের গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ অকারণে হাসল রাহুল। হাসিটা হয়তো স্পষ্ট ফুটল না—ঠোঁটের কোণে সামান্য স্পন্দন তুলল মাত্র। কিন্তু শীলাও কি হাসল? ঠিক হাসল না—একটা হাসি চাপল যেন। কেন? রাহুলের হাসির বিনিময় মাত্র—নাকি তাকে দেখে তার কীর্তি জেনে শীলার হাসি পেয়েছে?

অরুণ বলল দুধ এনেছিস? চামচা না হলে খাবে কেমন করে? যা—নিয়ে আয়।

শীলা দুধ টুলে রেখে ভিতরে গেলে অরুণ বলল, ভাই রাহুল, আমি একবার বেরোচ্ছি। এখন জাস্ট সাতটা বাজে—আমি ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে ফিরে আসব। ডাক্তারবাবুর কাছ হয়ে ফিরে আসব—ভেবো না। শীলা রইল। একবার সানু চাটুয্যের কাছে ঘুরে আসি। ডেকে পাঠিয়েছে। বিশ্বাস নেই—না গেলে ভাববে পাল্টা মতলব আঁটছি।

শীলা আসার পর অরুণ বেরিয়ে গেল। রাহুল চোখের ভাষায় শীলাকে বলতে চেষ্টা করল, বসুন।

বাইরের দরজাটা বন্ধ করে শীলা নিঃসঙ্কোচে কাছে এল। তারপর বলল, নিজে খেতে পারবেন—নাকি খাইয়ে দিতে হবে?

রাহুল ফের তেমনি হাসল—মাথাটা দোলাবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। শীলা তার পাশের চেয়ারে বসে চামচে দুধ তুলে বলল, এই, হাঁ করুন—আপনারও আর কাজ ছিল না! দাদার পাল্লায় পড়ে গেলেন। লোকটা কেমন গণ্ডগুলে মানুষ—জানা ছিল না—তাই না?

রাহুলের কিছু খাবার ইচ্ছে মোটেও ছিল না। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে শীলার সাদা হাত—সাদা চিরোল আঙুলে ধরা দুধভরা রূপোলি চামচটা তার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আদরের জিনিস মনে হচ্ছিল। শীলার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল সে। শীলার দুচোখে দুটো চামচ চকচক করেছে—অসম্ভব উজ্জ্বল দুটো স্নেহভালবাসা! রাহুল তার জীবনের অন্ধকার হাতড়ে বিপন্নভাবে খুঁজতে চেষ্টা করছিল—কী যেন এমনি উজ্জ্বল বস্তুখণ্ড তারও সঞ্চিত ছিল, বড় পরিচিত ছিল—এমনি মুখ, স্নেহভালবাসায় নরম হয়ে ওঠা চিরোল আঙুল! কতকাল আগে তা হারিয়ে গেছে। তার কথা বলতে ইচ্ছে করল। যে কোন কথা। ক্ষোভ দুঃখ অভিমানের কথা—অথবা কিছু রাগের কথা। চুপ করে থাকা তার অসম্ভব মনে হচ্ছে। ভীষণভাবে সাড়া দিতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কিছু করার নেই, এবং পরিণামে এই অক্ষমতার বিপুল চাপেই তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল।

শীলা চমকে উঠল। ...আরে! আপনি কী ছেলেমানুষ! কাঁদছেন কেন? মারামারিতে হেরে গেলে কেউ কাঁদে নাকি? উঁহু—চুপচাপ দুধটা খেয়ে ফেলুন তো। গায়ে বল না হলে আবার ফাইট করবেন কিসের জোরে? জানেন—মার দিতে যারা পারে, তাদেরও মাঝে মাঝে মার খেতে হয়?

চাপা হাসিতে তার মুখটা উজ্জ্বল। রাহুল চোখ বুজল। হ্যাঁ—তাকে সেরে উঠতে হবে। প্রতিশোধ নেবার জন্যে অনেকটা শক্তি তার দরকার। আপাতত নন্দ নয়—সানু চাটুয্যের চোয়াল না ভাঙা অব্দি তাকে বেঁচে থাকতেই হবে।

চোখবুজে নিঃশব্দে দুধ খাচ্ছিল সে। হঠাৎ শীলার কণ্ঠস্বরে চোখ খুলল। শীলা উঠে দাঁড়িয়েছে। ...কে কে ওখানে? বলে সে এগিয়ে যাচ্ছে।

বাইরের দিকে জানালাটা খোলা ছিল। রাহুল দেখল—চমকে উঠল। গঙ্গা!

শীলা দরজা খুলে বলল, মাসিমা ! আরে—আসুন, আসুন।

গঙ্গা ঘরের ভিতর এক পা বাড়িয়ে রাহুলকে একবার দেখে নিয়ে শুধু বলল; আচ্ছা, চলি শীলা।

শীলা বলল, এসেই চলে যাচ্ছেন মাসিমা ? বসবেন না ? বউদি বকবেন—জানতে পারলে।

পরে আসব'খন। ……বলে দ্রুত ঘুরে চলে গেল গঙ্গা।

শীলা দরজাটা বন্ধ করে বলল, ঢঙ দেখে বাঁচিনে ! ছেলের খবর নিতে এসেছিলেন দয়াময়ী জননী ! রাহুলবাবু, আপনার ছোটমাকে চিনতে পারলেন তো ?

রাহুল প্রচণ্ড চেঁচিয়ে শীলাকে থামিয়ে দিতে পারলে আকস্মিক ভয়ঙ্কর আলোড়নটা প্রশমিত হত ; কিন্তু পারল না। তার চোখদুটো নিষ্পলক হয়ে উঠল। শীলা দৌড়ে কাছে এসে বলল, কী হয়েছে আপনার ? রাহুলবাবু ! শুনছেন ? অমন করে তাকাচ্ছেন কেন ? সত্যি বড্ড ভয় করছে আমার। রাহুলবাবু !

রাহুল তেমনি রক্তরাঙা নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকল। একটা ভয়ঙ্করকে যথাশক্তি ভিতরের অন্ধকারে ঠেলে দিতে তার সবটুকু রক্ত যেন ঘাম হয়ে বেরুচ্ছে।

চার

ময়নাচকের এই অভিজ্ঞতাটা তার নতুন। রাহুল কোনদিন কারো হাতে মার খায়নি। সে জেনেছিল যে অপরকে মার দিতেই তার জন্ম। কিন্তু এতদিনে টের পাচ্ছিল একটা গোলকের সুমেরু ছাড়া কুমেরু আছে। আসলে সে বহরমপুর এলাকায় একা ছিল না। সারাক্ষণ তার মাথা বাঁচানোর জন্যে নেপাল আর তার দলবল ছিল তৈরী। সে ছিল দলের একটা অংশ মাত্র। এখানে আজ সে একা। কেউ তার মাথা বাঁচানোর জন্যে নেই এখানে। কাজেই আজ তার শক্তির পুরোটা যাচাই হয়ে যাচ্ছে। আজ তার যা কিছু শক্তি—তার উৎস সে নিজে। এই অভিজ্ঞতার অবশ্যই দরকার ছিল। কতখানি জোর তার দরকার এবার জানা গেল। এখন তাকে নিজেকে রক্ষা

করার জন্যে বাড়তি অনেক কিছু সংগ্রহ করতে হবে। সুতীব্র সাহস, ক্ষিপ্রতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, চাতুর্য—অনেক কিছু জিনিস তার দরকার, পরোক্ষে যা বুদ্ধি থেকে মেলে। তা না হলে সে এখানে মূল্যহীন হয়ে পড়বে। আর সৎ নিরীহ ভালোমানুষ হয়ে-ওঠাও তার পক্ষে সম্ভব নয়—হয়তো সহজও নয় আর। ইচ্ছের বিরুদ্ধে, হাতের নাগালের বাইরে চলে গেছে তার জীবনের সবকিছু। এখন আর চেষ্টা করেও ভালো মানুষটি হয়ে ওঠা যাবে না।

তিনটে দিন তার বিছানায় কেটে গেল। কীভাবে কাটল, সে স্পষ্ট টের পায়নি। একটা গুরুতর আচ্ছন্নতা কুয়াসার মতো তার অস্তিত্বের চারপাশ ঘিরে ছিল সারাক্ষণ। তার মধ্যে শুধু শীলাই ছিল কিছুটা স্পষ্ট—বাকি সব অস্পষ্ট। গঙ্গা আরেকবার না কি এসেছিল, সে জানে না। তখন তার প্রচণ্ড জ্বর। মাথার কাছে বসে থেকে চলে গেছে। শীলা বলেছে। আর এসেছিল সেই সানু চাটুয্যে। বলে গেছে, পরে আসবে। সানু আরও বলে গেছে, মাষ্টারমশায়ের ছেলে জানলে সে ওর গায়ে হাতই দিত না। নিষ্পত্তি করে ফেলত ব্যাপারটার। যাক্‌গে, যা হবার হয়েছে। পরে এসে ভাব করে ফেলবে। তাছাড়া সানু খুব অবাক হয়েছে যে রাহুলের মারপিটে এমন ওস্তাদী হাত আছে। সেইজন্যেই তার ভাব করার ইচ্ছেটা এত তীব্র। ময়নাচকে নন্দরা সবাই আসলে তার মতে নেড়ি কুত্তা—তার মধ্যে এ একটা ডালকুত্তা সন্দেহ নেই। হুঁ, সানু খুব খুশি হয়েছে।

চতুর্থ দিনে সকালে যখন ঘুম ভাঙল, শরীরটা হাল্কা লাগল তার। সে স্বচ্ছন্দে উঠে বসতে পারল। দুর্বলতা সামান্য আছে, কিন্তু সেটুকু আমল দিল না সে। প্রথমে মুখের ব্যাণ্ডেজটা একটানে খুলে ফেলল। দেখল দুটো চোয়ালেই কালচে ছোপ পড়েছে। তখনও একটু ফোলাভাব বোঝা যাচ্ছে সেখানে। চোয়াল নাড়া দিতে গেলে বিশেষ ব্যথা আর নেই। গতরাত্রে কথা বলতে পারছিল—কিন্তু কষ্ট হচ্ছিল। এখন সেই কষ্টটা নেই। নেই—তা স্পষ্টভাবে বোঝবার জন্যেই ডাকল, অরুণদা, ও অরুণদা!

নাঃ, সে এবার অনেকটা ফিট হয়ে উঠেছে। শুধু ডানহাতের ব্যাণ্ডেজ এখনও কিছুদিন খোলা যাবে না। ঘা সারতে সময় লাগবে। বুড়ো আঙুল নড়ানো যাচ্ছে না। তালুও টনটন করছে। সে উঠে দাঁড়াল। তারপর ফের অরুণকে ডেকে বাঁহাতের সাহায্যে বাইরের দরজাটা খুলে দিল। বাইরে প্রচুর রোদ নিয়ে অনেক আশা আর সম্ভাবনায় ভরা পৃথিবীটা অপেক্ষা করছে তার জন্যে। পরিচ্ছন্ন আকাশে খেলা করছে প্রসন্ন একটা মুক্তি। অন্তত

রাহুলের তাই মনে হল—আকাশ এবং রোদে ঝকমকে পৃথিবী জুড়ে মুক্তির গভীর আস্বাদ রয়েছে ছড়ানো। সেখানে পা বাড়ালেই তার দুর্বিনীত স্বাধীনতার বোধ বাঘের মতো সগর্জনে সাড়া দেবে। আর এই ভয়-না-মানা হার-না-মানা ক্ষুধিত স্বাধীনতার বোধই তো তাকে কোনদিন আর দশটা ছেলের মতো সুবোধ করে তুলতে দ্যায়নি।

অরুণের সাড়া সে পেল না। এল শীলা। ভিতরের দরজা খুলে প্রথমে অবাক হল। তারপর হেসে উঠল। ···এই মা! কী হবে!

রাহুল বলল, কিছুই হবে না। মুখ ধোবার জল দিতে পারেন? ঠাণ্ডা জল কিন্তু।

শীলা চোখ কপালে তুলে বলল, সে কী! ব্যাণ্ডেজ খুলে গরম জলে মুখ ধুতে বলেছেন যে ডাক্তার। একটা পাওডারও দিয়ে গেছেন।

উঁহু। আর ডাক্তার-ফাক্তার নয়।······রাহুল একটু হাসল।··· ··আমি নিজেই এখন ধন্বন্তরী।

শীলা বলল, সেই তো! এখন মুখে কথা ফুটেছে—আর কে কার ভরসা করে!

রাহুল পলকে ক্ষুব্ধ হল।···দেখুন ভরসা আমি কারো ওপর করতে চাইনি। পথে ফেলে দিতেই পারতেন আপনারা।

শীলা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, ছি, ছি! আমি কী তাই ভেবে কিছু বললুম নাকি! আপনি ভারি মেজাজী লোক রাহুলদা। অত হিসেব করে কথা বলতে আমি শিখিনি।

সে মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিল—রাহুল ডাকল, শীলা শুনুন।

বলুন।

আপনিও কম মেজাজী নন, দেখছি।

ওর কথার সুরে শীলা ফিক করে হেসে ফেলল। বলল, জল ঠাণ্ডাই এনে দিচ্ছি—কিন্তু খারাপ কিছু হলে আমার দায়িত্ব নেই।

কিসের দায়িত্ব? আমার জন্যে দায়ী আমি নিজে।······রাহুল বলল। ···আচ্ছা, অরুণদা ওঠেনি এখনও?

শীলা জবাব দিল, আজ দাদার ঘুম সকালেই ভেঙেছে। মানে ভাঙানো হয়েছে। সানু এসেছিল—সেই বদমাস লোকটা—তার সঙ্গে বেরিয়েছে দাদা। কী জানি কী ব্যাপার।

রাহুল একটু অস্বস্তি বোধ করল। বলল, লোকটার সঙ্গে আপনার দাদার বুঝি ভীষণ ভাবটাব আছে?

শীলা ভ্রু কুঁচকে এবং ঠোঁট উল্টে বলল, কে জানে! দাদার ব্যাপারে আমার উৎসাহ নেই। দাঁড়ান জল এনে দিচ্ছি।

রাহুল দেখল সানু চাটুয্যের নামে তার অবচেতনা থেকে এই অস্বস্তিটা যেন অনুভূত হচ্ছে। সে তাকে মেরেছিল বলে? কিছুক্ষণ এটা নিয়ে ভাবল সে। আচ্ছন্নতার মধ্যে ওই লোকটার কণ্ঠস্বর সে শুনেছে মনে পড়ছে। কেন এসেছিল তাকে দেখতে? এসব ক্ষেত্রে তো তারা তুজনে পরস্পর শত্রু—কারণ আঘাত ও আক্রমণ ঘটেছে তুপক্ষের মধ্যে। হতে পারে এটা সামান্য বিবাদ মাত্র, কিন্তু নিতান্ত দৈবাৎ উত্তেজনার মুখে ঘটে গেছে—তারা তুজনে পরস্পর অপরিচিত বটে; কিন্তু সানু চাটুয্যের এই খোঁজখবর নেওয়া আর উদারতা দেখানো কেমন অস্বস্তিকর লাগছে। শুধু কি মাষ্টারমশায়ের ছেলে বলে তাকে খাতির দেখাতে চায় সে? সেজন্যেই কি বলতে চায় যে সে অনুতপ্ত হয়েছে? অনেক প্রশ্ন মনে ভিড় করল রাহুলের। সানু সম্পর্কে সে মোটামুটি যা জেনেছে—তাতে বোঝা যায়, লোকটি নেপালদার জাতেরই একজন। কিন্তু সে নেপালের চেয়ে অনেক উঁচুদরের মানুষ নাকি। বেশ অবস্থাপন্ন পরিবারের ছেলে সানু বা সনৎ চ্যাটারজি। তার দাদা এলাকার রাজনীতির পাণ্ডা। তাছাড়া সানু রাহুলের মত কলেজ ছাড়া। বিদ্যেবুদ্ধি বড় কম নেই। এদিকে অরুণের মত মিথ্যুক অসচ্চরিত্র লোভী লোকের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে। ব্যাপারটা বড় রহস্যময়। শীলা কি কিছু জানে?

শীলা জলের বালতি এনে বলল, নিন। মুখটুখ ধুয়ে আজ ভিতরে আসবেন কিন্তু। বউদি আপনাকে ডেকেছে।

রাহুল জল নিয়ে বাইরে গেল। বারান্দায় বালতিটা রাখল। নিমডালের দাঁতন করা সম্ভব হবে কি না ভাবল কিছুক্ষণ। মুখের ভিতরটা পচে গেছে যেন। কদিন ধরে দাঁত মাজা হয় নি একেবারে।

শীলা যেন টের পেয়েছিল। ঘরের ভিতর থেকে বলল, গুঁড়ো মাজন এনে দিচ্ছি। ডাল ভাঙতে যাবেন না যেন। একদিনে বেশি-বেশি স্ফূর্তি দেখাতে গেলে আর ফাইট করবেন কেমন করে?

রাহুল হেসে বলল, সত্যি বলেছেন। কিন্তু দেখে শুনে মনে হচ্ছে, আমাকে চাঙ্গা করতে পারলে আপনি খুব খুশি। অর্থাৎ লাস্ট ফাইটটা দেখবার লোভ খুব প্রবল। তাই না?

শীলা জবাব দিল, কেন হবে না বলুন? বিনা পয়সায় জলজ্যান্ত মজা

দেখতে কে না চায়। এ্যাদ্দিন পর্দার ছবিতে ওসব দেখেছি—এবার বাস্তবে দেখব। হাততালি দেব।

রাহুল বলল, ঠাট্টা হচ্ছে? মনে হচ্ছে না যে আমি কাকেও মারতে পারি!

শীলা হেসে বলল, বা রে! মনে কত কী হচ্ছে। কিন্তু সানু চাটুয্যের সামনে শুনেছি নাকি খুব জবর পালোয়ানও ভিরমি খায়।

রাহুল দাঁতে দাঁত চেপে বলল, দেখা যাবে। দেখবেন আপনি। আপনাদের সানু না কানু—

শীলা সকৌতুকে বলল, আপনি এখনও নিতান্ত ছেলেমানুষ রাহুলবাবু। এখনও বাচ্চাদের স্বভাব আপনার যায় নি! ছাড়ুন তো ওসব—মুখ ধুয়ে ভিতরে আসুন। বউদি ডাকছেন।

রাহুল জেদের স্বরে বলল, সানুর সম্পর্কে অন্যের কী ধারণা জানিনে—আপনার ধারণা দেখছি খুব উঁচু। অনেক ভক্তি-টক্তিও থাকতে পারে লোকটার ওপর। কিন্তু আমি রাহুল। আমাকে আপনি চেনেন না।

শীলা হঠাৎ কণ্ঠস্বর একটু চাপা করল।...ভক্তি-টক্তি হবে না। ধারণা উঁচু হবে না আবার? জানেন, সে আমার কে?

চমকে উঠল রাহুল। ঘুরে বলল, আপনার! কে হয় সে আপনার?

শীলা চোখ নামিয়ে বলল, হয় নয়—হতে চলেছে। সে আমার গলায় নাকি মালা দেবে। দাদা খুশি হয়ে নিজে থেকেই কথাটা তুলেছেন। চাটুয্যে মশায়ের কোন আপত্তি নেই।

রাহুল দু পা এগিয়ে বলল, এ কী বলছেন! অরুণদা জেনেশুনে—

বাধা দিয়ে শীলা বলল, জেনেশুনে নয়, প্রাণের দায়ে। নৌকোর চারিদিকে যে হাজারটা ফুটো—জল ঢুকে কখন ডুবে যায় সেই ভয়ে একটা করে ফুটো বন্ধ করার মতলব। কিছু ফুটো বন্ধ করবেন শ্রীমান চাটুয্যে—কিছু আপনি। দাদা আমার কী রকম লোক—তা জানেন না বুঝি?

শীলা দ্রুত ভিতরে চলে গেল। রাহুল স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। শীলা, এই শীলার সঙ্গে হারামজাদা সানুটার বিয়ে হবে? আজ সব আগে একটা পবিত্র কর্তব্য আছে রাহুলের। সেটা হচ্ছে, যে কোন মূল্যে এই বিয়েটা ভাঙা। এমন চমৎকার মেয়েটার সর্বনাশ করতে অরুণদার বাধবে না? আশ্চর্য তো। সে মনে মনে বলল, রাজেনবাবু, আপনার কাজ পরে হবে। আপাতত একবার সানু চাটার্জির সঙ্গে চরম বোঝাপড়া করাটাই জরুরী। কিন্তু অরুণের চাদ্দিকে ফুটো কিসের?

একটু পরে ভেতরে যেতে হল রাহুলকে। অরুণের বউর সঙ্গে তার প্রথম মুখোমুখি আলাপ। প্রথম দর্শনেই তার মনে হল, মেয়েটি ভালো। ভালো মানে বোকা আর সাদাসিদে। ওর গায়ের রঙ বেশ ফরসা, চেহারায় লালিত্যেরও অভাব নেই—কিন্তু অনেক দিন ধরে নানান অসুখে ভুগে চেহারাটি হয়েছে যেমন পাটকাঠি, তেমনি ফ্যাকাসে। এসব মেয়েরা সচরাচর তিরিক্ষি মেজাজের হলেও দোষ দেওয়া যায় না। অরুণ বলেছিল ওর আসল অসুখ হচ্ছে মনে—মেজাজই ওর অসুখের কারণ। তাই রাহুল ভেবেছিল, দুটো কড়া কথা বলতেই ডেকেছে অরুণের বউ। কারণ উড়ে এসে জুড়ে বসে হাঙ্গামা বাধিয়েছে রাহুল। হয়তো অরুণের প্রতিপক্ষকে রাহুলই আপোষ ফয়সালার বাইরে ফেলে দিয়েছে এবং তার ফলে অরুণের নন্দঘটিত সমস্যা আরও বেড়ে গেছে।

কিন্তু মিষ্টি হেসে অরুণের বউ করুণা কথা বলতে সুরু করলে রাহুল আশ্বস্ত হয়েছে। শুধু আশ্বস্ত নয়, মনে হয়েছে—এ যেন কতকালের চেনাজানা আপনজন। রাহুল তার নিজের সম্পর্কে অরুণের মনোভাব পুরোটাই জানে। সে জানে যে অরুণের খাতির করার পিছনে কিছু স্বার্থ আছে— তা না হলে পারতপক্ষে রাহুলের মতো ছেলেকে সে এড়িয়ে থাকত। আর—শুধু অরুণ কেন, যারাই রাহুলের সবিশেষ পরিচয় জানে তারা প্রত্যেকেই তো তাকে মনে মনে গভীরভাবে ঘৃণা করে। করুণাও তাকে সবিশেষ জানে বইকি—অরুণ তার সম্পর্কে সবই বলেছে। অথচ করুণা যেন তাকে ঘৃণা করল না! করুণা বলল, একালের ছেলে সব—চাকরী-বাকরী নেই, কাজকম্ম পায় না। একটু আধটু দুষ্টুমি করবে না তো কী করবে শুনি? বেশ করবে। বিষদাঁত না থাকলে এ যুগে চলে না মোটে। এই গ্যাখো না তোমাদের দাদাটির কাণ্ড। যদি শক্তসমর্থ মানুষ হত, চাদ্দিক থেকে কেউ ওকে লাঞ্ছনা করবার অবকাশ পেত? আমি তোমার প্রশংসা করেছি, রাহুল। শীলাকে জিজ্ঞেস করো। বলেছি, পুরুষ ব্যাটাছেলে—কখনও দুঘা দেবে, কখনও দুঘা খাবে—তাতে লজ্জা কিসের?

পরক্ষণে সে একটু ঝুঁকে চাপা গলায় বলল, সানু চাটুয্যেকে তুমি মেরেছ শুনে আমার তো ভাই নাচতে ইচ্ছে করছিল। ওই খড়ের অসুরকে সবাই এখানে নাকি ভয় পায়।

রাহুল হেসে বলল, নাঃ, মারতে আমি পারিনি বউদি। সেই আমাকে মেরেছে।

করুণা বলল, আহা, হাত তো তুলেছিলে মারতে—আমি সব শুনেছি ভাই

ওই হাত ওঠানোই হচ্ছে আসল কথা। সান্থুর গায়ে হাত ওঠানোর মানুষ যে এ তল্লাটে নেই। তাই শীলাকে বলছিলাম, ওকে আমি সামনে বসিয়ে খাওয়াবো, দুটো কথা বলে শান্তি পাব রে শীলা! ওকে একবার ডেকে আনবি? আমার তো চলাফেরা বারণ। তাছাড়া বড্ড মাথা ঘোরে।

শীলা দুষ্টু হেসে বলল, চাটুয্যেমশায়কে রাহুলবাবু চিনতেন না বলেই হয়তো মারতে হাত তুলেছিলেন!

রাহুল হো-হো করে হাসতে গিয়ে দেখল, চোয়ালে ব্যথা। সে বিকৃতমুখে বলল, যা বলেছেন!

করুণা ধমক দিল।···তুই থাম্ শীলা। রাহুল ঠাকুরপোকে তুই চিনিসনে। বেথুয়াডহরিতে থাকতে তোর দাদার মুখে ওর যা সব গল্প শুনেছি, ভয়ে তো বুক টিপটিপ করছে। আসলে ভুলেই গিয়েছিলুম ওর কথা। গত রাত্তিরে তোর দাদা বলল, সান্থুর সঙ্গে একটা মিটমাট করে দিতে হবে রাহুলের—সান্থু নিজেই উদ্যোগী। বারবার আসছে সেজন্যে। বুঝলি শীলা? তখনই আমার মনে পড়ে গেল। আরে তাইতো! রাহুলের কথা তো আমি শুনেছিলুম! এ তবে সেই রাহুল!

করুণা হেসে উঠল। হাসতে সম্ভবতঃ কষ্ট হয় ওর। পরক্ষণে বলল, হাঁফিয়ে উঠি ভাই বেশিক্ষণ কথা বললে। তুমি এখানে থাকো ভাই, কোথাও তোমাকে যেতে দেব না। নিজের বাড়ির মতো থাকো। নিজের মা নেই বাবা থেকেও নেই, তো কী হয়েছে? আমি তো আছি। যদ্দিন বাঁচব তোমার কোন অসুবিধে হবে না। আপাতত সেরে-টেরে ওঠ, তারপর···

তাকে থামতে দেখে শীলা বলল, তারপর কী হবে বউদি? লড়িয়ে দেবে কারো সঙ্গে?

করুণা ধমক দিয়ে বলল, লজ্জা করে না তোর হতভাগা মেয়ে? কী হবে? তোর নিজের কথা একবার ভেবে দেখেছিস? একবারটি ভেবেছিস তোর দাদার কথা? তাহলে বুঝতিস, আমরা এখানে কী অসহায় অবস্থায় বেঁচে আছি। তোমাকে সব বলব রাহুল, সব জানতে পারবে। দিনের পর দিন ওই বদমাস সান্থু তোমার দাদার কাছে টাকা নিয়ে যাচ্ছে। সময় নেই অসময় নেই—এসে হাত বাড়াচ্ছে। না পেলে শাসাচ্ছে, ইটখোলাশুদ্ধ উড়িয়ে দেবে নাকি। অগত্যা, তোমার দাদা ডাকাতটার মুখ বন্ধ করতে···

বাধা দিয়ে রাহুল বলল, বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে—তাই না?

করুণা চমকে উঠে বলল, তুমি জানো? ভাই রাহুল, কথাটা শুনে আমি ওকে

যা-না-তাই গালমন্দ করেছিলুম। কিন্তু শেষ অব্দি ভেবে দেখলুম, আর কিই বা উপায় আছে!

শীলা ফোঁস করে উঠল, হ্যাঁ—তা তো নেই। মায়ের পেটের বোন তো নয়—উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এক হতচ্ছাড়ী। অতএব তাকে বলি দিয়েই দেবতাকে তুষ্ট করা যাক্।

করুণা হাত তুলে বিষণ্ণস্বরে বলল, না—তা নয় রে শীলু, কথাটা তা নয়। বিয়ে তো তোর দিতেই হবে—কারো না কারো ঘর করতেই হবে। রাবণরাজারও তো ঘরকরার মেয়ে ছিল ভাই রাহুল, ছিল না? তাই শেষটা আমিও মত দিয়েছিলুম। কিন্তু সে আমার মুখের সায়—তোমার দিব্যি ভাই, মনের সায় আমার ছিল না। আর এখন—এখন তুমি আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছ, এখন বুকে জোর বেড়েছে। তাই কথাটা আবার ভাবছি। সানুর মত রাক্ষসের গ্রাসে এমন সুন্দর কচি মেয়েটাকে ফেলে দিতে কার বা মন চায়, বলো? রাহুল, তুমি আমাদের বাঁচাও ভাই!

শীলা উঠে কোথায় চলে গেল। রাহুল মাথাটা একবার দোলাল মাত্র। তার মনটা এবার তেঁতো। তাহলে এই হচ্ছে আসল ব্যাপার! এই শত্তুরের বাচ্চা দুনিয়ায় এই হচ্ছে মানুষে-মানুষে সম্পর্কের প্রকৃত ভিত্তি। স্বার্থ না থাকলে কোন শালা বা শালী আপন ভাবতে একটুও রাজী নয়। সবাই চায় একজন শক্তসমর্থ মারাত্মক ধরনের দেহরক্ষী—কারণ এখন সব পথই অন্ধকার এবং শত্রুসঙ্কুল। আমি শক্তিমান—তার একটি অর্থই আজ খুঁজে মেলে—সেটি হচ্ছে, আমি খুন করতে পারি। খুনীই এখন শক্তিমান। ওস্তাদ লড়ুয়ের দিকেই সবার একাগ্র সপ্রশংস দৃষ্টি। আমি সানুর গায়ে হাত ওঠানোর ক্ষমতা রাখি, এতেই আমি হিরো হয়ে গেছি। বাঃ!

করুণার কথা শুনতে পেল সে।··ভাই রাহুল, নিরীহ মানুষ আমরা। কারো সাতে পাঁচে নেই। কিন্তু তবু রেহাই আছে? চারদিকে ওঁৎ পেতে বেড়াচ্ছে বদমাসের দল। তুমি আমাদের বাঁচাও।

রাহুল উঠে দাঁড়াল।··বউদি! মহাভারতে একটা শ্লোক আছে, জানেন নিশ্চয়।···দুষ্কৃতিকে বিনাশ করতে আর সাধুদের পরিত্রাণে ভগবান নাকি যুগেযুগে অবতার হয়ে গজান। আমি অবশ্যি অবতার মোটেও নই। আমি সামান্য পাপীতাপী গুণ্ডা-বদমাস মানুষ। দুষ্কৃতি করাটাই আমার ধর্ম। তবে কথা দিচ্ছি, দেখব কী করতে পারি। না বউদি, হয়তো শীলার মুখের দিকে তাকিয়ে নয়—যদিও উনি আমার যথেষ্ট সেবাশুশ্রূষা করেছেন—আমি সানু চ্যাটারজিকে দেখব

শুধু নিজের কারণে। জীবনে কখনও মার খাইনি কারো হাতে। আমার রাগ বলুন—সেটাই আসল কথা।…

বাইরের ঘরে চলে এল সে। দেখল, শীলা চুপচাপ বসে আছে তার বিছানায়। কিন্তু ও কী করছে সে? কোত্থেকে খুঁজে বের করল ওই জিনিসটা?

রাহুল অস্ফুট চেঁচিয়ে ঝুঁকে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।.. আরে, আরে! করছেন কী? এটা কেন বের করলেন? রেখে দিন, রেখে দিন—অটোমেটিক। গুলিপোরা আছে।

শীলা তার বিছানার তলা থেকে রিভলবারটা বের করে নাড়াচাড়া করছিল। সাবধানে সেটা তুলে দেয়াল তাক করে বলল, কোথায় পান আপনারা? আমাকে একটা দিতে পারেন?

রাহুল বিরক্ত হয়েছিল। কিন্তু যেকোন মুহূর্তে গুলি বেরিয়ে যেতে পারে—দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়াও বিচিত্র নয়। সে জোর করল না। পাশে বসে শান্ত গলায় বলল, দরকার হলে এটাই পাবেন। এখন লক্ষ্মীমেয়ের মতো রেখে দিন তো। উঁহু হু—ট্রিগারে আঙুল দেবেন না। অটোমেটিক। শীলা, প্লীজ, লক্ষ্মীটি!

শীলা নিঃশব্দে হাসছিল। বলল, সে-রাতে আপনার ঘরে উঁকি মেরেছিলুম, জানেন? আমার ঘুম আসছিল না। আসবে কেমন করে! পাশের ঘরে একা একজন জ্বরের ঘোরে যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে—হয়তো জল তেষ্টা পেয়েছে। কেউ দেবার নেই। চুপিচুপি উঠে এলুম। ওই দরজাটা তো বন্ধ থাকে না। একটু ফাঁক করে দেখি আপনার মাথাটা, বালিশ থেকে পড়ে গেছে। বালিশও পড়ে গেছে নিচে। তখন বিছানাটা ঠিক করতে গিয়ে কেমন শক্ত কিছু হাতে ঠেকল। এই জিনিসট আবিষ্কার করলুম। খুব ভয় পেয়েছিলুম—কিন্তু হঠাৎ মনটা খুসি হয়ে উঠল। বুকে যেন জোর পেলুম। ইচ্ছে করছিল, এটা লুকিয়ে ফেলি। বিপদের দিন ঘনিয়ে আসছে—তখন এর চেয়ে আর বড় বন্ধু কোথায় পাব! কিন্তু পারলুম না। আপানার দিকে তাকিয়ে সেটা পারা গেল না।

শীলা, আপনি কাঁদছেন!

ফেট্। কান্নাটান্না আমার আসে না।· তারপর কী হয়েছে শুনুন।

শুনব, ওটা আপনি—তুমি রাখো আগে। আঃ শীলা, এই!

রাহুল অসতর্ক বিহ্বলতায় একটু ঘনিষ্ঠ হয়েছিল শীলার। অন্তত বাঁ-হাতটা

শীলার পিঠ ঘুরে ওর হাতে ধরা রিভলবারটার কাছে পৌঁছতে গিয়েই এই বিপত্তিকর ঘনিষ্ঠতা! দুটো মুখ অনিবার্যভাবে খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। শীলার শ্বাসপ্রশ্বাসের গন্ধ ঝাপটা মারছিল রাহুলের মুখে। শীলা সরল না। বলল, কতবার এটা চুরি করতে চেয়েছি। সুযোগ পাইনি। মনে হয়েছে আপনি ধরে ফেলবেন! আপনাকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না হয়তো। তারপর আমি মনে মনে—ও রাহুলবাবু রাগ করবেন না তো? যদি বলি—মনে মনে আপনার মরণ চাইছিলুম।

শীলা চাপা হেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রাহুল দেখল তার নিজের শরীরজুড়ে জেগে উঠেছে একটা অনন্যসাধারণ তৃপ্তি। নারীশরীরের স্বাদ তাকে প্রথম একদা গঙ্গাই দিয়েছিল—তারপর বহু সুযোগ জীবনে এসেছে, সুযোগগুলোর যথাযোগ্য ব্যবহার সে করে নি, ভাল লাগত না। একটা হিংস্র শক্তির হাতে পুতুল হয়ে উঠেছিল সে—মানুষের টাটকা রক্ত তাকে জীবনের আস্বাদ দিত। পৃথিবী আর মানুষকে ঘৃণা করাটাই তার অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল। সেই ঘৃণা দিয়ে ত্যাগ করাই যায়—ভোগ করা অসম্ভব। এখন সে দেখল, ব্যাপক ঘৃণার প্রচ্ছন্ন অন্ধকার থেকে আলোর শিখার মতো একটা কিছু উঠে আসছে—তাকে অবশ করে ফেলছে। দৃষ্টিকে ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। সেই আলোয় সব ঘৃণা সরে যাচ্ছে পলকে পলকে। আর সে জড়িয়ে ধরল শীলাকে। চুমু খেয়ে বসল হঠকারিতায়। শীলা কিন্তু চমকাল না। নড়ে উঠল না। স্থির অবিকৃত ঠোঁটে নিল চুমুগুলো। তারপর রিভলবারটা রাহুলের হাতে দিয়ে বলল, যার হাতে যা মানায়। ফেটু! আমি কি মানুষ মারতে পারি!

রাহুল বলল, তোমাকে মানুষমারা আমি শেখাব।

বিকেলে মণিশঙ্কর এল মোটর সাইকেলে। রাহুল চুপচাপ শুয়ে ছিল। মোটর সাইকেলের আওয়াজ শুনে উৎকর্ণ হয়েছিল সে। অরুণ ইটখোলার দেখাশোনায় ব্যস্ত। দরজায় ধাক্কা আর অরুণের নাম ধরে ডাকাডাকি শুনেও মণিশঙ্করের কথা ভাবেনি রাহুল। আসলে, তাকে ভুলে গিয়েছিল সে। শীলা এসে দরজা খুলতে গিয়ে তার দিকে তাকিয়ে একটু হেসেছিল অকারণে। তারপর মণিশঙ্করের আবির্ভাব।

এসেই বিছানার পাশে বসে হন্তদন্ত বলল, কী মুসকিল! এত সব কাণ্ড হয়েছে, একটুও জানতুম না ভাই। আজ সকালে অরুণের কাছে শুনলুম। অরুণ বলেনি যে আমি এবেলা আসব?

রাহুল মাথা দোলাল।

ভুলে গেছে তাহলে।···মণিশঙ্কর কৌটো থেকে পান বের করে মুখে দিল।··· ওর বড্ড ভুলো মন। অবশ্য, কাজের চাপও তো কম নয় বেচারার। কুমড়োদহর রাস্তায় ইটের নতুন অর্ডার পেয়েছে বলছিল। বেশ আছে ও। ওই টিঙটিঙে শরীরে যা খাটে, ভাবা যায় না! যাক্ গে রাহুলবাবু। কাণ্ডটার জন্যে সত্যি বড় দুঃখিত ভাই। ময়নাচকের আসল লোকেরা কিন্তু মোটেও বদমাস নয়। এই টাউনশিপ হবার পর কোত্থেকে সব নানা ধরনের লোক হাজির হয়ে জায়গাটা নরক করে তুলেছে। আমি—মণিশঙ্কর হেসে বলল,—অন বিহাফ অফ দি গুড পিপল অফ ময়নাচক, অ্যাপলজি চাচ্ছি রাহুলবাবু। শ্রদ্ধেয় মাষ্টার মশায়ের ছেলে আপনি, আপনাকে আঘাত করা তো দূরের কথা—কটুকথা কেউ বলবে, ভাবতে আমার অবাক লাগছে!

রাহুল চুপ করে বসে থাকল।

এখন কেমন আছেন? চলাফেরা করতে অসুবিধে হয় না তো? একটা ব্যাপার আমি বুঝিনে মশাই—অরুণ কেন এটা পুলিশে জানাল না। এমনি করেই তো জানোয়ারগুলো আস্কারা পাচ্ছে। এই দেখুন না, হাইওয়েতে প্রায়ই রাহাজানি হচ্ছিল রাতের বেলা। এমন কি একদিন দিন-দুপুরেই ব্রীজের কাছে তিনটে লরী আটকে কারা মাল নামিয়ে নিল। ড্রাইভারদের দুজনকে স্ট্যাব করে নদীতে ফেলে দিল—অন্যজন এখনও হাসপাতালে। পুলিশ এল যথারীতি—কিন্তু কোন ফয়সালা হল না।

রাহুল বলল, কারা এসব করছে জানেন নিশ্চয়?

মণিশঙ্কর তেঁতোমুখে বলল, কারা করছে সেটা তো সবাই দেখছে চোখের সামনে। তাদের পুলিশ ধরছেও। কিন্তু মজার কথা—কী ফুঁসমন্তরে তাদের ছেড়ে দিতে পুলিশ পথ পায় না! আসলে, সবারই ধারণা—তলায় খুব বড় আদমি আছে মশায়। বুঝলেন? জব্বর আদমি আছে পিছনে। আমি অবশ্য কোন সাতে পাঁচে নেই। কিন্তু ভয় হয়। হবে না কেন? ওই মাঠের মধ্যে থাকি। ফসলটসল ওঠে। বাইরে কোথাও ট্রাকে পাঠাতে ভরসা পাইনে। পাঠালে দরটর ভাল পেতুম। অথচ সব ফসল লোকাল ফড়েদের কাছে লোকসানে ঝেড়ে দিচ্ছি। কে রিস্ক্ নিতে যাবে মশাই!

রাহুল শীলাকে ডেকে চায়ের কথা বলবে ভাবছিল, সেই সময় শীলা চায়ের ট্রে হাতে হাজির। নমস্কার করে বলল, কেমন আছেন শঙ্কর দা?

মণিশঙ্কর বলল, আরে শীলা যে! কেমন আছেন? কই, আর গেলেন

না যে আমাদের ওখানে? আমার স্ত্রী সবসময় আপনার কথা বলে। তেপান্তর মাঠে একা থাকি সবাই—বাইরের কেউ গেলে কত খুসি হই জানেন? বাই দা বাই, শীলা, আপনার পরীক্ষা কী হ'ল? এবারই তো? ডেট পিছিয়ে গেছে শুনলুম—খবর নিতে হবে।

শীলা সলজ্জ হেসে বলল, পরীক্ষা দিয়ে কী হবে? প্রাইভেট পরীক্ষা দেওয়ার কোন মানে হয় না। আমি সব ছেড়ে দিয়েছি। তাছাড়া প্রাইমারী মাষ্টারিটাই যখন ছেড়ে দিলুম—তখন উপায় ছিল না..

মণিশঙ্কর বলল, সর্বনাশ! তবে যে ও বলছিল—আপনি ছুটিতে আছেন! কাজটা ভাল করেন নি শীলা। আপনার বউদিও মাঝে-মাঝে খুনসুটি করে। বলে—দুঁদে জোতদারের বউ হয়ে পাঠশালায় রোজ ছেলেঠ্যাঙাতে যাই—মর্যাদা থাকে না। কিন্তু আমি বরাবর স্ত্রী-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। গ্রামের মেয়ে—বাপের বাড়িতে না হয় ভালো সুযোগ পাওনি. আরে বাবা, আমার ঘরে এসে তো অসুবিধে নেই? জানেন রাহুলবাবু,... হাসতে হাসতে মণিশঙ্কর বলল, রোজ দুবেলা আমার কাজ হচ্ছে ওই বাহনে স্ত্রীকে বহন করা। অর্থাৎ চার মাইল দূরে স্কুলে পৌছে দিই এবং ফেরৎ নিয়ে আসি! হাঃ হাঃ হাঃ!

রাহুল শীলার দিকে তাকিয়ে বলল. তুমি প্রাইমারী স্কুলের দিদিমণি ছিলে? বলনি তো? আশ্চর্য, অরুণদাও বলেনি!

শীলা বলল, বলবার মতো নয় বলেই কেউ বলেনি।

মণিশঙ্কর বলল, আরে—শীলা আর আমার গিন্নি এক খোঁয়াড়েই দু' বচ্ছর কাটাল যে! সে থেকেই তো পরস্পর চেনাজানা। তা নাহলে ইটখোলার অরুণ সাঁতরার সঙ্গে আমার কী!

সে ফের হাসতে লাগল। রাহুল বলল, রেজিগনেশন দিয়েছ কদ্দিন শীলা?

শীলা জবাব দিল, তিনমাস আগে একটা ছুটির দরখাস্ত করেছিলুম—তারপর চুপচাপ আছি। দাদাবউদিও বলছিল—আর গিয়ে কাজ নেই। চাকরী করা তো পরীক্ষাপাসের জন্যে। পাস করে তো ডানা গজাবে না! কী বলেন শঙ্করদা?

মণিশঙ্কর বলল, উঁহু—গজাবে। দেখুন—যেযুগে বাস করছি, হঠাৎ দুম করে পুরুষব্যাটা ছেলে পটল তুলল—মেয়েদের কথা একবার ভেবে দেখুন। বলবেন—আমার জোতজমা আছে-টাছে। কিন্তু ও তো অনিশ্চিত সম্পত্তি। কাল সরকার কেড়ে নিলেই হল—নয়তো কোন পলিটিকাল পার্টি এসে ঝাণ্ডা

পুঁতে দখল নিল। এ আমার জেনেশুনে বিষপান মশাই—বুঝলেন রাহুলবাবু? ফসল-ফলানোর একটা নেশা আমাকে পেয়ে বসেছিল। তাছাড়া মানুষের ভিড় থেকে এইভাবে দূরে থাকা যায়—গাছপালা উদ্ভিদজগতে একটা শান্তিও আছে। যাক্ গে রাহুলবাবু, চলুন না একবার আমার ওখানে। ভাল লাগবে। রাত্তিরটা থেকে যেতেও পারেন—কোন অসুবিধে নেই। যাবেন? ব্যাকসীটে বসিয়ে নিয়ে যাব—কোন কষ্ট হবে না। চলুন না!

রাহুল শীলার দিকে তাকাল। শীলার চোখে সম্মতি ছিল। রাহুল বলল, শরীর এখনও একটু দুর্বল—তা হোক্। যেতে ইচ্ছে করছে। চলুন—বেরোচ্ছি।

মণিশঙ্কর উঠল। শীলাকে বলল, তাহলে কথাটা শোভনাকে জানাতে হয়। কী মুশকিল, ও আপনার জয়েন করার দিন গুনছে ওদিকে।

শীলা হাসল মাত্র।

একটু পরে বেরুল রাহুল। শীলার সামনে রিভলবারটা প্যাণ্টের পকেটে ভরল—কিন্তু কী ভেবে কার্তুজগুলো বের করে অন্য পকেটে রাখল। শীলার চোখে উদ্বেগের ছাপ লক্ষ্য করে সে চাপা গলায় বলল, নাঃ—আপাতত মানুষ মারবার দরকার হবে না। এমনি রাখলুম কাছে। আর একটা কথা—যদি ভাখো রাত্তিরটা ওখানে রয়ে গেছি, তোমরা হইচই করোনা।

বাজার পেরিয়ে একমাইল ফাঁকা মাঠের পর ব্রীজ। ব্রীজ পেরিয়ে বাঁদিকে নামল ওরা। একফালি ইটের পথ নদীর পাড় বেয়ে চলেছে উঁচু বাঁধের ওপর। বনজঙ্গল আছে কিছুকিছু। বিকেলে লালচে আলোয় পরিবেশ বেশ মনোরম দেখাচ্ছিল। এখানে কোথাও কোন রুক্ষতা নেই। নদীর বুকে বাঁধ রয়েছে। তার ফলে একদিকটা অতল নীলাভ জলে ভরা। সেখান থেকে পাম্পিং মেসিনের আওয়াজ আছে। অন্যদিকে ঘন গাছপালার ভিতর একতালা বাংলোধরনের ছোট্ট একটা বাড়ি। সুদৃশ্য ফুলবাগিচা—কলাঝোপ, ইউকালিপটাস আর দেবদারু গাছের সারি। বেশ রুচি আছে লোকটার। শুধু ভাবতে অবাক লাগে যে এও জীবনকে অনিশ্চিত আর নিরাপত্তাবিহীন ভেবে উদ্বিগ্ন নিরন্তর। তাই বউকে সামান্য প্রাইমারী টিচারের চাকরী করতে আপত্তি করে না। বরং খুশি থাকে। নাকি টাকা নামে সর্বনাশা শক্তির একটা মারাত্মক টানের কারচুপি সবই? সবাই টাকা চায়—যে কোনভাবে, যে কোন জায়গা থেকে, যে কোন মূল্যে! রাগে রাহুলের মেজাজ ফের খারাপ হয়ে গেল। টাকার লোভ সবাইকে যেন হিজড়ে করে ফেলেছে ক্রমশ।

পাঁচ

মণিশঙ্করের বলার অপেক্ষা ছিল মাত্র—রাহুল থাকতে চেয়েছিল রাত্রে। কারণ, একটা উদ্দেশ্য ছিল তার। ব্রীজের কাছেই রাহাজানি হয়। এদিকে সন্ধ্যার দিকে জনা চার সশস্ত্র পুলিশ নাকি সেখানে হাজির থাকে—তারা ভোরঅব্দি পাহারা ছায়। তা সত্ত্বেও রাহাজানি আটকানো যায় না। কেন যায় না? তাহলে কি ড্রাইভারদেরও কোন কারচুপি থাকে? মুক্তকেশী হোটেলে ট্রাক ড্রাইভারদের সে দেখেছিল। গাড়ি থামিয়ে ওখানেই কেউ কেউ স্নান আহার বা বিশ্রাম সেরে নেয়। কাজেই স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে তাদের আলাপ-পরিচয় থাকা সম্ভব। ওদের ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে হলে বাবার কাছে থাকাটাই তার সবচেয়ে ভাল সুযোগ ছিল। কিন্তু কোনভাবেই সেটা সম্ভব নয়। কাজেই মণিশঙ্কর আর তার বাড়িটা তাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারে—রাহুল একথা ভেবেছিল। ব্রীজের কাছেই বাড়ি—মণিশঙ্কর খেয়ালী মানুষ, রাত জেগে সে নিজের ফসল পাহারা ছায়। শুধু তাই নয়, তার একটা ছোটখাটো ল্যাবরেটরীও আছে—সেখানে সে তার অশিক্ষিতপটুত্বের জোরে উদ্ভিদবিদ্যার চর্চাও করে। তার পক্ষে ওইসব রাহাজানির অনেক কিছু জানা থাকা সম্ভব মনে হয়েছিল রাহুলের। প্রাণের দায়ে খামখেয়ালী সরল লোকেরাও অনেক সময় মারাত্মক কথা মুখ টিপে হজম করতে বাধ্য হয়।

মণিশঙ্করের স্ত্রী শোভনা গাব্দাগোব্দা মুটকি মেয়ে। খুব জোরে চেঁচিয়ে পড়া মুখস্থ করে। হাসি পাচ্ছিল রাহুলের। শোভনা তার পড়ার জগৎ ছাড়া আপাতত কিছু আমল দেয় না যেন। সে রাহুল সম্পর্কে কোন কৌতূহলই প্রকাশ করল না। রাতের খাওয়া চুকে গেলে নিজের ঘরে চলে গেল। তারপর তার মুখে রোমের ইতিহাস তার স্বরে বেরোতে থাকল।

মণিশঙ্করকে একটু বিব্রত দেখাচ্ছিল স্ত্রীর আচরণে। রাহুল যেটুকু দূর করার জন্যে সরলভাবে বলল, সত্যি একেই বলে সাধনা। বউদির কিছু হবে। জানেন শঙ্করদা? আমি মুখ খুলে পড়তুম না বলে বাবা কী মার না লাগাতেন! মুখ খুলে পড়তে পারিনি বলেই হয়তো আমার কিছু হল না জীবনে। মারামারি করেই কাটালুম খালি।

মণিশঙ্কর অন্যমনস্কভাবে বলল, বড্ড গরম লাগছে না ? বরং চলুন, নদীর ধারে-ধারে কিছুক্ষণ ঘুরে আসি। খুব ভাল লাগবে। হাঁটতে কষ্ট হবে না তো ?

রাহুল সোৎসাহে উঠে দাঁড়াল। ··মোটেও না। আমি পুরো ফিট এখন।

দুজনে বেরিয়ে এল।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। অন্ধকার আছে। খোলামেলায় বাতাস বইছে উত্তাল। সামনের দিকে নদীর পাড় অব্দি ছড়ানো জঙ্গলে গাছপালার শোঁ শোঁ শনশন শব্দ শোনা যাচ্ছে। দূরে বেশ উঁচুতে ময়নাচকের আলোগুলো জ্বলছে। আকাশটা সেখানে সামান্য হলুদ। বাঁধে দাঁড়িয়ে ব্রীজের দিকে তাকাল রাহুল। ব্রীজের বিশাল ফ্রেম অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মণিশঙ্করের হাতে টর্চ। মাঝেমাঝে সে টর্চ জেলে রাস্তা দেখে নিচ্ছিল। সে বলল, এখানে সবই ভালো—কিন্তু পোকামাকড়ের উপদ্রব আছে কিছুটা।

রাহুল বলল, সাপ ?

মণিশঙ্কর জবাব দিল, হুঁ। নদীটা বিহারের পাহাড় এলাকা হয়ে এসেছে। তার ফলে রাজ্যের পাহাড়ী সাপ বর্ষায় ভেসে এসে আশ্রয় নেয়। গতবার এখানে একটা প্রকাণ্ড অজগর মেরেছিলুম।

বলেন কী ?

আর বলবেন না। প্রথম প্রথম অনেকবার জোর বেঁচে গেছি সাপের হাতে। তারপর জঙ্গলগুলো সাপ হয়ে গেলে উপদ্রব একেবারে কমে গেছে। আসলে কী জানেন ? মানুষকে সবাই বড্ড ভয় করে। ···মণিশঙ্করের বক্তৃতা শুরু হল যথারীতি। রাহুলবাবু, সত্যি বলছি—মানুষকে ভয় করা উচিতও। মাঝে মাঝে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়—এ কী জাত মশাই এই প্রাণিজগতে গজিয়ে উঠেছিল। অদ্ভুত, ব্রিলিয়াণ্ট, সাংঘাতিক! কেন জানেন ? এরা আইন বানাতে জানে। রাষ্ট্র গড়তে জানে, রাষ্ট্রের নামে মানুষ আইন চালায়। আর এই রাষ্ট্রই হল প্রবঞ্চনার মোক্ষম উপায়। পণ্ডিতেরা রাষ্ট্রের উৎপত্তি নিয়ে অনেক বলেছেন। আমার সামান্য বুদ্ধিতে আমি বুঝেছি—রাষ্ট্র হল বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ক্ষমতাবান বদমাসের একটা মজার খাঁচাকল। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই নির্বোধ নিরীহ ছাপোষা টাইপের। তার ফলে তারা খাঁচাকলেই আটক থেকে কোন রকমে একটা সামঞ্জস্য করে বেঁচে থাকে। কষ্ট কি টের পায় না ? পায়। মাঝেমাঝে তাদের সেই কষ্ট পাওয়ার সুযোগ নেয় বুদ্ধিমান ক্ষমতাবানেরা—বিদ্রোহ ঘটায় চলতি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। সেটা ভেঙে ফেলে। কিন্তু তার জায়গায় ফের গড়ে ওঠে নতুন রাষ্ট্র, নতুন একটা খাঁচাকল। নতুন

তার আইনকানুন। সুতরাং ফের কষ্ট আর সামঞ্জস্য করে বেঁচে থাকা।···

রাহুলবাবু, রাষ্ট্রই মানুষের—আমি মিন ব্যক্তি—মানুষের কাঁধে এক জগদ্দল বোঝা। এ বোঝার দাসত্ব সারাজীবন তাকে সইতে হয়। একটু সচেতন হলেই তো আমি বুঝতে পারি, আমার যন্ত্রণাটা কোথায়? আমার প্রকৃত শত্রু কে? ইয়েস—রাষ্ট্র। অতএব মনে মনে আমার যত ঘৃণা তার ওপর। আর তাকে ঘৃণা করি বলেই মানুষও আমার ঘৃণার পাত্র—সরি, ঘৃণা বলব না—করুণার পাত্র। আমি ভেবেই পাইনে কী করে মানুষ এই বিশ শতকের দুদশক পেরোতে চলেছে—তবু রাষ্ট্রের কারচুপি ধরতে পারল না! ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের মৌলিক বিরোধটা আজও কোন সার্থক রূপ পেল না মানুষের ইতিহাসে। কেউ রাষ্ট্রের দিকে থুথু ছুঁড়ল না!

মণিশঙ্কর সশব্দে থুথু ফেলল। হয়তো তার মুখে বিকৃতি ফুটেছে। অন্ধকারে—হয়তো তার শরীরের শিরা ও পেশীগুলো ফুলে শক্ত হয়ে উঠেছে—রাহুল অনুমান করল। সে কোন মন্তব্য করল না। শুধু অবাক হল।

মণিশঙ্কর ফের মুখ খুলল। রাষ্ট্র চালানোর যে যন্ত্র, তার নাম সরকার। তার প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব টের পাইয়ে ছায় যা কিছু—তা সবই আমার ঘৃণার বস্তু। পুলিশ আর মিলিটারি দিয়ে সে আমাকে গায়ের জোরে তার প্রতি অনুগত রাখে। ইচ্ছে করে, দিই একের পর এক···

রাহুলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, কী?

মণিশঙ্কর কেমন হাসল ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে। পিশাচেরা কি এমনি হেসে ওঠে? রাহুল পিশাচের গল্প শুনেছে—পিশাচের অস্তিত্বে তার বিশ্বাস নেই। কিন্তু তার মাথায় পিশাচ শব্দটাই এসে গেল। সে মণিশঙ্করের হাসি শুনে চমকে উঠল। অস্বস্তি টের পেল। বাঁধের নিচে ডানদিকে নদী। নদীর বুকে এখানেই উঁচু বাঁধ দিয়ে জল আটকানো হয়েছে। ওপাশটা শুকনো—বালির চড়া. অন্ধকারে নক্ষত্রের আলোয় ঝকমক করছে নিচে। মণিশঙ্কর বলল, ওখানে গিয়ে বসবেন?

কেন কে জানে, গা ছমছম করল রাহুলের। সেই মুহূর্তে মণিশঙ্কর তার কাঁধে হাত রাখল। আড়ষ্টভাবে সে অনুসরণ করল তাকে। টর্চের আলোয় সাবধানে পাড় বেয়ে নিচে নামল ওরা। বাঁধের ওপর দাঁড়াল। বাঁধের কিনারা ছুঁয়ে জল চকচক করছে। বাতাসের কাঁপনে প্রতিবিম্বিত নক্ষত্রগুলোও অতলে ঝিকমিক করছে। মণিশঙ্কর বলল, বসুন।

বসল দুজনে। মণিশঙ্কর বলল, কথাগুলো নিঃসঙ্কোচে আপনাকে বলে

ফেললুম। বলতে পারলুম। কারণ, বয়স আমার চেয়ে যত কম হোক আপনার—আমি আপনাকে পছন্দ করি রাহুলবাবু।

রাহুল বলল, কেন? আমার মধ্যে পছন্দ করার মতো কী পেলেন?

অনেক। প্রথমত আপনিও আমার মতে বিশ্বাসী।

কেমন করে বুঝলেন তা?

আমি আপনাকে সবিশেষ জানি। আইন আপনার চক্ষুশূল—রাষ্ট্র আপনার শত্রু।

রাহুল হেসে উঠল। বলল, ধেৎ! কী যে বলেন!

মণিশঙ্কর গম্ভীরভাবে বলল, আপনি জন্মবিদ্রোহী রাহুলবাবু। হলফ করে বলুন তো এ যাবৎ যা কিছু করেছেন—তা কি টাকা রোজগারের জন্যে করেছেন, নাকি গায়ের ঝাল ঝাড়তে?

রাহুল একটু অন্যমনস্কভাবে বলল, কে জানে!

আপনার বাবা গতকাল সব বলেছেন আপনার ইতিহাস। উনি দুঃখ করছিলেন—ওর ওই শক্তি, ওই বিদ্রোহের জ্বালাটা যদি রাজনীতির পথে আত্মপ্রকাশ করত, উনি খুব খুসি হতেন। যাই হোক—আমি অবশ্য রাজনীতি পছন্দ করিনে। কারণ রাজনীতি মানেই রাষ্ট্রের খাঁচাকল ব্যবস্থা আর ক্ষমতাবানদের শাসন শোষণ—ভোগ-দখল প্রবৃত্তি চরিতার্থতার উপায় কায়েম রাখা। কাজেই সে পথে না গিয়ে ভাল করেছেন। কিন্তু রাহুলবাবু……হঠাৎ মণিশঙ্কর কণ্ঠস্বর চাপা করল। ফিসফিস করে বলল, ময়নাচক এসেছেন—সে কি সত্যিসত্যি বাবার কাছে থাকতে? লুকোবেন না। আমার বিশ্বাস হয় না যে আপনি ছাপোষা মানুষের মতো নিরীহভাবে বেঁচেবত্তে থাকার জন্যে বাবার কাছে চলে এসেছিলেন! ওটা আপনার চরিত্রের সঙ্গে মানায় না। এখানে আসবার উদ্দেশ্য কী আপনার?

রাহুলের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্যে। কে এই মণিশঙ্কর! সে বাঁহাতটা প্যাণ্টের পকেটে ঢোকাতে গিয়ে দেখল, ঢুকছে না। উঠে না দাঁড়ালে সেটা সম্ভব নয়। অতল জলের একেবারে কিনারায় সে বসে আছে। তার মাথা ঘুরছিল। দুর্বলতাটা ফের জেগে উঠছিল। সে সামলানোর চেষ্টা করে বলল, আপনার প্রশ্নটা খুব অদ্ভুত। এর কী জবাব দেব, খুঁজে পাচ্ছিনে!

মণিশঙ্কর খুকখুক করে হাসল।……অরুণ আপনাকে এখানে এনেছে—তাই না?

রাহুল একটু রাগের ঝাঁঝে জবাব দিল, না।

মণিশঙ্কর তার রাগটা আমল দিল না। বলল, অরুণের একজন শক্ত-সমর্থ বডিগার্ড দরকার হয়ে পড়েছে। সানু চ্যাটারজি তাকে ব্ল্যাকমেইল করে যাচ্ছে সমানে। তাই অরুণ—আমার দৃঢ় বিশ্বাস—অরুণ আপনাকে এখানে এনেছে।

রাহুল বলল, ব্ল্যাকমেইল? সে কী! কেন?

মণিশঙ্করের মুখের পানের গন্ধ ঝাপটা মারল রাহুলের নাকে। সব জেনেও লুকোচ্ছেন রাহুলবাবু।

রাহুল বিরক্তভাবে বলল,—কিচ্ছু জানিনে আমি: অরুণদা একটা ব্যাপার বলবে বলেছিল—এখনও বলেনি। আপনি ভুল করেছেন শঙ্করবাবু, তাছাড়া এতে আপনার উৎসাহেরও কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছিনে কিন্তু।

মণিশঙ্কর বলল, সত্যি বলছেন, অরুণ আপনাকে আনেনি?

বিশ্বাস করা না করা আপনার খুসি। চলুন, উঠব।

রাগ করবেন না প্লীজ। মণিশঙ্কর তার কাঁধে হাত রাখল।·····বসুন। ঘরে গরমের চেয়ে খোলামেলায় কিছুক্ষণ গল্পগুজবে আপত্তি কী?

এ ঠিক গল্পগুজব নয়, শঙ্করবাবু! আপনি কেন এসবে ইনটারেস্টেড, শুনি?

মণিশঙ্কর অন্ধকার জলে সশব্দে থুথু ফেলল। তারপর বলল, আমার ইনটারেষ্ট খোলাখুলি বলছি। সানু চ্যাটারজি আমার শত্রু—ঘোর শত্রু বলতে পারেন। সে আমাকেও ব্ল্যাকমেইল করে। অরুণ আমার বন্ধু মানুষ—তারও শত্রু সানু। এদিকে আপনি হচ্ছেন অরুণের লোক—সানু আপনাকে মেরেছে, অতএব সানু ইজ আওয়ার কমন এনিমি। তাকে কখনো বিশ্বাস করবেন না। তার ফাঁদে ভুলেও পা দেবেন না। শুনলুম, সে আপনার সঙ্গে ভাব করতে চায়। সাবধান, সানু সাংঘাতিক লোক!

রাহুল মুখ তুলে বলল, তারপর?

কথাটা জানিয়ে রাখলুম—এইমাত্র। আপনি সর্তক থাকবেন সবসময়। নন্দর সাধ্য হবে না আপনার ক্ষতি করতে—কিন্তু সানু আপনাকে ছাড়বে না। ওর গায়ে হাত তুলেছিলেন—ও কখনো সইবে না। তাই ···· বলতে বলতে হঠাৎ মণিশঙ্কর ঘুরে নদীর শুকনো দিকটায় টর্চের আলো ফেলল। তারপর উঠে দাঁড়াল। চাপা স্বরে বলল, জাস্ট ইনচুইশান! মনে হল, কাদের পায়ের শব্দ পেলুম যেন।

রাহুল উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে। টর্চের আলো ঘুরছিল বালির চড়ায়—নদীর ভিতর অন্ধকার চিরে যাচ্ছিল বারবার। কাকেও দেখা গেল না। রাহুল বলল, কেউ না। চলুন ফেরা যাক্।

দুজনে উঠে পাড়ের বাঁধে এল। তারপর রাহুল বলল, শংকরবাবু প্লীজ—কিছু মনে করবেন না। আমি বরং ফিরে যাই অরুণদার ওখানে।

মণিশঙ্কর শশব্যস্তে বলল, না—না, সে কী! এই শরীরে এতদূর যাবেন কী করে? তাছাড়া অন্ধকার রাস্তা। নাঃ, ভারি ছেলে মানুষ আপনি মশাই! রাগ হয়েছে আমার কথায়—তাই না? দেখ কাণ্ড। আমি খামখেয়ালী লোক—কী বলতে কী বলি। দূর, দূর! ফরগেট ইট। চলুন আসল কথাটা তো বলাই হয়নি!

রাহুল গোঁ ধরে বলল, না। আমার ভালো লাগছে না এখানে। আমি যাই। পরে আসব'খন।

সে হনহন করে হাঁটতে থাকল। মণিশঙ্কর দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। যা ভাবে ভাবুক, রাহুল বিরক্ত। প্রথমে ওই লোকটার কথাবার্তায় কেমন রহস্যের আভাষ পাচ্ছিল, এখন তার মনে হচ্ছে—আসলে সব তাতে নাকগলানো অভ্যাস আছে ওর। সম্পূর্ণ হার্মলেস মানুষ মণিশঙ্কর। সব তাতে কৌতূহলী। গায়েপড়া ভাব আছে। অদ্ভুত সব কথা ভাবে—অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা মগজে নিয়ে ঘোরে। তা না হলে কেন এই বনে প্রান্তরে নির্জনে পড়ে রয়েছে সে? রীতিমতো বাতিগ্রস্ত লোকটা। ওর বউ বেচারা ভাগ্যিস বোকাসোকা মেয়ে—উদ্দেশ্যহীন পড়াশোনা ডিগ্রি পরীক্ষাপাসের নেশায় পড়ে রয়েছে বলেই রক্ষে। তা নাহলে কবে বিদ্রোহ করে বসত স্বামীর ওপর।

ব্রীজ লক্ষ্য করে সে হাঁটছিল। আশ্চর্য, মণিশঙ্কর তাকে টর্চটা দিলেও তো পারত! দিল না। হয়তো এত হাঁ হয়ে গেছে যে কথাটা মাথায় এল না! কিন্তু ওর কথা যদি সত্যি হয়, সানু কেন ব্ল্যাকমেইল করছে অরুণকে? শীলা বলছিল, অরুণের অনেকগুলো ফুটো আছে। কিসের? আর সানু কেন মণিশঙ্করকেও ব্ল্যাকমেইল করে? মণিশঙ্কর বা অরুণ যদি খুলে না বলে সব, সানুর সঙ্গে ভাব হয়ে গেলে কৌশলে জানা যেতেও পারে। একটা কথা মাথায় আসছে এ মুহূর্তে—মণিশঙ্করও যেন রাহুলকে পেতে চায়—দেহরক্ষীর মতো। সেও সম্ভবত রাহুলের সাহায্য চায়।

বডিগার্ড! সবাই নিজের নিজের বদমাইসির কারণে একটা করে রক্ষাকবচ চাইছে। রাহুলকে বেছে নিয়েছে সেজন্যে। কী শালা কপাল! নেপালদাও বলত—রাহুল থাকতে আমার গায়ে গুলি-চাকু বিঁধবে না। এই জন্যেই কি হৃষিকেশ মাষ্টারমশাই তার জন্ম দিয়েছিলেন পৃথিবীতে?

ব্রীজটা তখনও সামান্য দূরে—বাঁধের দুপাশে টানা জঙ্গল এখানটায়,

আচমকা একঝলক টর্চের আলো পড়ল সামনে থেকে। চোখ ধাঁধিয়ে গেল রাহুলের। অভ্যাসবশে সে পকেটে বাঁহাত ভরে জিগ্যেস করল—কে? কে?

প্রথমে ভেবেছিল—ব্রীজের সেই পুলিশেরা, পরে চমক খেল। বুটের শব্দ শোনা যাচ্ছে না। অথচ আলো এগিয়ে আসছে। সে পকেট থেকে অস্ত্রটা বের করার আগেই এবং আলো নিভে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দু-তিনজন লোক তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দুপাশের অন্ধকার থেকে।

তার মুখে কাপড় গুঁজে দিলে রাহুল চিৎকার করার সুযোগ পেল না। তাকে জোর করে শুইয়ে দিল তারা। একজন ফিসফিস করে বলল, এখানে না—নদীতে নিয়ে চল।

আরেকজন বলল, ধুস্! এখানই চালিয়ে দে।

চোখ দুটো খোলা ছিল রাহুলের। সে অনুমান করল, একজনের হাতে ছোরা রয়েছে। তার গলা পেঁচিয়ে কাটা হবে—তাতে কোন ভুল নেই। এ মুহূর্তে শুধু শীলার মুখটাই ভেসে উঠছিল মনে। আর কিছু নয়—কেউ নয়। সে চোখ বুজল। অনেক মৃত্যু সে অনেককে দিয়েছে—এবার নিজের পালা পড়েছে। নিস্পন্দ থেকে সইতে হবে। সে জানত—এটাই নিয়ম। অমোঘ আইন। তবে খুব শীগগির বিনা প্রস্তুতিতে এসে গেল—তাই একটু কষ্ট। এরা কে—তা জানবার ইচ্ছে মনে নেই, হয়তো আর প্রয়োজনও নেই। কেন তার মৃত্যু হচ্ছে—তার কৈফিয়ৎও অপ্রাসঙ্গিক। শুধু মনে হচ্ছে, এত তাড়াতাড়ি! এত হঠকারিতায়। চোখ বুজে লে মুহূর্তকাল আগে দেখা নক্ষত্রের প্রতিবিম্বে চেতনাকে রাখল। সেখানে শীলাকে দেখল সে। শেষ সময় এইটুকুই যেন সান্ত্বনা। শীলা নামে পৃথিবীতে একজন ছিল—তার জন্যে অপেক্ষা করে ছিল একদিন। তা না হলে কত আগে সে কতবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিল—শেষ অব্দি জীবন এসে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। ছিনিয়ে নিয়ে গেছে শীলার ঠোঁটে তখনও চুমু দেওয়া বাকি বলে।

হঠাৎ একটা আওয়াজ কানে এল। কার অমানুষিক কণ্ঠস্বর শুনল সে। এক ঝলক তীব্র আলো ফুটল ভয়ঙ্কর অন্ধকারে। একটা ঝড় সুরু হল যেন। গাছপালার শব্দ গেল বেড়ে। চোখ খুলতে ইচ্ছে ছিল না—সাধ্যও ছিল না, দুচোখের পাতা অবশ হয়ে গেছে। তারপর মনে হল সে তলিয়ে যাচ্ছে অনন্ত শূন্যে।.........

চোখ খুলে কিছুক্ষণ নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল রাহুল। তারপর বলল, তুমি গঙ্গা না ?

গঙ্গা তার পাশে বসে আছে। সে ভ্রু কুঁচকে বলল, গঙ্গা কে ? ছোটমা বলতে পারছ না ?

রাহুল ধুড়মুড় করে উঠে বসল। সকাল হয়েছে। ঘুম ঠিক সময়ে ভেঙেছে। কিন্তু এখানে কেন সে ? ঘরটা চিনতে পারল না সে। অরুণের ঘরেই সে ঘুমাচ্ছে ভেবেছিল—সেখানে গঙ্গা এসেছে মনে হয়েছিল। কিন্তু এবার অচেনা ঘরটা তাকে চমকে দিল। পরক্ষণে রাত্রে মণিশঙ্করের ওখানে বাঁধের ওপর জঙ্গলের ব্যাপারটা তার মনে পড়ে গেল। তাহলে সে ফের বেঁচে গেছে ! কে বাঁচাল তাকে ? এখানে আনলই বা কে ? সে গঙ্গার দিকে সপ্রশ্ন তাকাল। তখন দেখল, গঙ্গার দুপায়ের ফাঁকে একটি বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে মুখটা গঙ্গার বুকের নিচে গুঁজে একটু কাত হয়ে ফ্যালফ্যাল করে করে দেখছে তাকে। অবিকল তার বাবার মতো চেহারা। রোগা গড়ন—বড় বড় চোখ, একটু পিঙ্গল—গঙ্গার চোখ দুটো শুধু পেয়েছে।

গঙ্গা শান্তভাবে তাকিয়ে বলল, অবাক হচ্ছ তাই না ? মণিশঙ্করবাবু কাল রাত্রে তোমাকে এখানে রেখে গেছেন। সব শুনলুম। নন্দদের ঘাঁটিয়েছ---ওরা যা বজ্জাত সবাই জানে। ভাগ্যিস, মণিশঙ্করবাবু গিয়ে পড়েছিলেন ! তা এসেছ—বেশ করেছ। কিন্তু অরুণের পাল্লায় পড়তে গেলে কেন ? আর যেও না ওখানে—এখানে থাকো। তোমার বাবার প্রতি সকলের শ্রদ্ধা ছিল এখানে —আমাকে বিয়ে করে একটু কমলেও যা আছে, তাই যথেষ্ট তোমার পক্ষে।

রাহুল কিছু বলল না। ভ্রূ কুঁচকে ব্যাণ্ডেজবাঁধা ডানহাতটা দেখতে থাকল। দেখতে দেখতে তার রিভলবারটার কথা মনে পড়ে গেল। সে প্যাণ্টের পকেটের দিকে হাত বাড়াল।

গঙ্গা বলল, তোমার যন্ত্রটা ? আছে—রেখেছি। তোমার বালিসের নিচেই আছে। ইস্ ! তুমি যে এত সাংঘাতিক ছেলে হয়েছ, ভাবতেও পারিনি ! ওটা ভেঙে ফেল। ওটা যতক্ষণ থাকবে, তোমার রেহাই নেই।

রাহুল বালিশ তুলে দেখে নিয়ে বলল, এটা তোমার ঘর ?

হুঁ—আবার কার ? তোমার বাবা পাশের ঘরে আছেন। চা-টা খেয়ে নাও, তারপর দেখা করবে।

রাহুল বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে বলল, শংকরদা আমাকে এখানে আনলেন কেন ?

গঙ্গা জবাব দিল, আমি তার কি জানি। সে নিজের ওখানে রাখলেও পারত—রাখেনি। অরুণবাবুর ওখানেও নিয়ে যায়নি। এখানেই আনল। কী ভেবে আনল—সেই বলতে পারে। তখন রাত তো বেশি হয় নি। হোটেল খোলা ছিল। আমি কী করব—অগত্যা ডাক্তারের কাছে খবর দিলুম। তিনি এসে কী ওষুধ খাইয়ে দিলেন। তারপর·· ···

বাবা জানেন ?

না—বলা হয়নি। বলছি।·· ······গঙ্গা বাচ্চাটাকে ঠেলে দিল। ···যাও, এখন খেলো গিয়ে। পরে দাদার সঙ্গে ভাব করবে, কেমন ? দাদা এখন এখানেই রইল—তোমাকে নিয়ে বেড়াবে। লক্ষ্মীসোনা !

ছেলেটি শান্তভাবে চলে গেল। গঙ্গা ফের বলল, চোখজ্বালা করছে। এমনিতে তো রাতে ঘুমোতে পাইনে। হোটেল—তারপর তোমার বাবার পাশে বসে থাকা।··সে ম্লান হাসল।···কাল রাতটা বেশ গেল। ওঘরে বাবা বিড়বিড় করছে—এঘরে ছেলে। খুব দুঃস্বপ্ন দেখছিলে তুমি।

রাহুল জবাব দিল না। কিছু মনে নেই। মাথার ভিতরটা খালি লাগছে। অথচ গঙ্গা, তার কণ্ঠস্বর, তার বসে থাকা, তার চাহনি সবকিছু দিয়ে তাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করছে যেন। ডাইনি গঙ্গা! এত ভালো সে! এত মমতাময়ী! সহজ আর স্বচ্ছন্দ সে !

গঙ্গা উঠল।···মুখটুখ ধুয়ে নাও। চা খেতে হবে না—গরম দুধ দিচ্ছি।

রাহুল বিছানা থেকে পা বাড়িয়ে বলল, আমি অরুণদার ওখানে যাচ্ছি।

গঙ্গার মুখটা পলকে কালো হয়ে গেল। সে স্থির তাকাল রাহুলের দিকে। তার নাসারন্ধ্র কাঁপছিল। তারপর সে বলল, কী আছে অরুণদার ওখানে যে নিজের লোকদেরও পর মনে হয় ?

রাহুল অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, এখানেই বা কী আছে যে সবাইকে নিজের লোক মনে হবে ?

গঙ্গা কোন জবাব দিল না দেখে সে ফের বলল, নিজের লোকের কথা যদি বলো—আমার কোথাও কেউ নেই। আমি সবসময় নিজেকে একা ভাবতে অভ্যস্ত। এতেই আমি স্বস্তি পাই—ভালো লাগে। কারো বা কাদের সঙ্গে জড়িয়েপড়া আমার স্বভাবের বাইরে।

গঙ্গা বলল, স্বার্থপর—দায়দায়িত্বের জ্ঞান যাদের নেই—ওটা তাদের মুখের কথা রাহুল।

রাহুল একটু হাসল।···আমি সত্যি স্বার্থপর। আমার দায়িত্বজ্ঞানের বড্ড

অভাব আছে। কিন্তু কী করব বলো? যাকে বলে ফ্যামিলিলাইফ—তা আমার কপালে সইবেও না, আর পছন্দও নয়। নিজেকে একা ভাবতে আমার স্বর্গসুখ হয়। আচ্ছা চলি!

গঙ্গা সামনে এসে দাঁড়াল। তার চোখমুখে উত্তেজনার ছাপ পড়েছে। সে চাপাস্বরে ঈষৎ বিদ্রূপের ঝাঁঝ মিশিয়ে বলল, একা ভাবতে নয়—তোমার স্বর্গসুখ যে কিসে তা আমি জানি রাহুল। অরুণের বাড়ি তোমার প্রাণশুদ্ধ কিনে নিয়েছে—সে খবরও জানি! কিন্তু রাহুল, তুমি বোধ হয় ভুল করছ।

রাহুল ভ্রু কুঁচকে বলল, কী বলতে চাও তুমি?

গঙ্গা হেসে উঠল। হাসিটা স্বচ্ছন্দ নয়। ঠোঁটের কিছু ভাঁজ আর উজ্জ্বল চাহনি তাকে একটা সর্বনাশা চেহারা দিল, সে বলল, বলতে চাই যে অরুণের বোনের সঙ্গে সানুর বিয়ের কথা কবে ঠিক হয়ে গেছে। আর সানুকেও তুমি ইতিমধ্যে ভালো চিনেছ। তার মতো বুদ্ধিমান এ এলাকায় আর একটিও নেই। সে একটা কিছু আঁচ করে ফেলেছে।···গঙ্গার হাসিটা নিভে গেল ক্রমশ। মুখে একটা কঠোর গাম্ভীর্য ছমছম করে উঠল। সে কয়েক মুহূর্ত থেমে ফের বলল, তুমি খুব বিপদের মধ্যে পড়ে গেছ রাহুল—বুঝতে পারছ না! কেন তুমি অরুণের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে গেলে? কী দরকার ছিল? বাবার কাছে থাকতে না চাইলে তো কেন বহরমপুর ফিরে গেলে না তক্ষুনি?

রাহুল প্রথমে রাগে অস্থির হয়েছিল—শেষের দিকে রাগটা পড়ে গিয়ে একটা বিস্ময়-কৌতূহল ক্ষোভ মেশানো আলোড়ন এসে গেল তার মধ্যে। সে বলল, কিচ্ছু বুঝতে পারছিনে। আসার পর থেকে যেন কোন অন্ধকার রাজত্বে ঢুকে পড়েছি! আবছায়ার মতো কারা কী সব করছে, স্পষ্ট বোঝা যায় না। কী জায়গা রে বাবা!

গঙ্গা এগিয়ে এল কাছে।···রাহুল, লক্ষ্মিটি, যা বলছি শোন। তোমার বাবার যা অবস্থা, ক'দিন আছেন বলা যায় না। এদিকে আমি মেয়ে—কেউ পাশে রইল না, ওই দুধের বাচ্চা নিয়ে কীভাবে এখানে বেঁচে থাকব—কিছু বিশ্বাস নেই। হোটেলের কথা বলছ! আমি আর পারছিনে রাহুল, বিশ্বাস করো—তখন তো খুব সাহস করে হোটেলের ব্যবসা ফেঁদে বসেছিলুম, এখন এটা আমার গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একা মেয়েদের পক্ষে এ কি চালানো সম্ভব! তোমার বাবা অসুস্থ হয়ে আর কিছু দেখাশোনা করতে

পারছেন না। শেষ অব্দি উঠিয়েই দিতে হবে হয়তো। এ আমার সাজে না। রাহুল—আমি খুব বড় ঘরের মেয়ে ছিলুম। সব মান-সম্মান খুইয়ে এ পথে নামলুম। কিন্তু আর পারছিনে!

রাহুল শান্তভাবে বলল, জানিনে—তুমি যা বলছ, তা সত্যি কি না। কারণ আমি অন্য কথা শুনেছি।

গঙ্গা কথা কেড়ে বলল, জানি, জানি—তুমি কী শুনেছ। আমি নষ্টা মেয়ে। আমি বেশ্যা হয়ে গেছি,·· এইসব তো!

রাহুল বলল, তুমি কী হয়েছ না হয়েছ, তাতে আমার কোন মাথাব্যথা নেই।

গঙ্গার চোখ ছলছল করে উঠল হঠাৎ। সে মুখ ফিরিয়ে বলল, তোমার কোন দোষ নেই—সব আমার ভাগ্য। তোমার দুঃখটা কোথায়—

রাহুল বলল, আমার কোন দুঃখটুঃখ নেই। আমি চলি।

গঙ্গা ওর কাঁধে হাত রেখে একটু ঠেলে দিল।·· তুমি একটুখানি বসো রাহুল। তোমার সব কথা জানা দরকার। সব শুনে তুমি আমাকে যে শাস্তি দিতে হয়, দিও।

রাহুল একটু ইতস্তত করে বসল। চুপ করে থাকল। গঙ্গাও বসল—সামান্য একটু তফাতে। বিনা ভূমিকায় খুব চাপা কণ্ঠস্বরে সে বলতে থাকল।

·· বাবা রাস্তার কাজে দারুণ লোকসান করেছিলেন। লোকসান হয়তো হত না—লাভই হত প্রচুর। কিন্তু লোকেরা চক্রান্ত করে দরখাস্ত করে বসল ওপরে যে ঠিকঠিক মালমশলা দেওয়া হয়নি, অথচ রোডস এঞ্জিনিয়ার আর সব অফিসার মিলে টাকা খেয়ে বিলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। এ রাস্তা আর কাল-ভার্টগুলো নাকি এক বর্ষাও টিকে থাকবে না। ওপরে মন্ত্রীঅব্দি বাবার বিরুদ্ধে আনাগোনা সুরু হল। এনকোয়ারি যা হবার হল। তারপর বাবার বিল তো চুলোয় গেল, কণ্ট্রাকটের লাইসেন্সও বাতিল করল ওরা। জন-মতের চাপ। ফের সব তুলে-টুলে নতুন করে বানাতে হবে। বাবার পক্ষে তা আর সম্ভব ছিল না। বাবা জোর আঘাত পেলেন। শয্যাশায়ী হলেন। আর উঠলেন না। এদিকে শত্রু যা চাল চেলেছিল, তা কাজে লাগতেই সে সামনে এসে দাঁড়াল। নিজে কনট্রাকট নিল। আশ্চর্য রাহুল, এ যুগে কী যে হচ্ছে, ভাবতে মাথা খারাপ হয়ে যায়। সে করল কী জানো? বাবার তৈরী সেই রাস্তায় জায়গায় জায়গায় একটু-আধটু পীচ ঢেলে আর কালভার্টের সামান্য মেরামত করে সেই পুরো কাজের টাকা পেয়ে গেল। তখন কেউ আর

চেয়েও দেখল না যে ভবানীবাবুর খোওয়ার-পীচগুলো কোথায় গেল। দিন-দুপুরে এইরকম বিরাট জোচ্চুরি হয়ে গেল লোকের চোখের সামনে। কেউ আর তার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করল না পর্যন্ত। কেন করবে? করাই কার বা সাহস হবে! সানু চাটুয্যের দাদাকে লোকে ভক্তি করে বলেই তো ভোট দ্যায় ইলেকশনে। নিরু চাটুয্যের বেনামী কন্ট্রাকটারি—তাও সবাই জানে। সইটইগুলো সানু দ্যায়—আসল কাজ করে নিরুবাবু। সানু বাউণ্ডুলে লোক। সংসারের ধার ধারে না। গুণ্ডামি মারামারি করা তার নেশা। তাকে তার দাদা কাজে লাগায় নানা দরকারে। তার ভয়েই সবাই দরখাস্তে সই দিয়েছিল—বুঝতে পারছ নিশ্চয়।

রাহুল গুম হয়ে বলল, তারপর?

গঙ্গা আঁচলে ঠোঁট মুছে বলল, তারপর তো বাবা মারা গেলেন। মাষ্টার মশাই—তোমার বাবার প্রতি লোকের অবশ্য ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল খুব। সেটা ওঁর অমায়িক ব্যবহারের দরুণ। সবার সাথে হেসে কথা বলতেন, সৎ উপদেশ দিতেন। লোকে সৎ উপদেশ বা ভাল কথা মানুক বা না মানুক, শুনতে খুব ভালবাসে কি না। তা—বাবার মৃত্যুর পর উনি হলেন আমার গারজেন। এদিকে সুযোগ পেয়ে আত্মীয় শরীকেরাও সম্পত্তি দখল নিয়ে মামলা বাধাল। তোমার বাবা খুব তদ্বির তদারক করলেন। কিন্তু কাজে লাগল না। সে বৈষয়িক বুদ্ধি তো ওঁর নেই। শেষে সব খুইয়ে মাত্র ভিটেবাড়িটা রইল। সেইসময় উনি একটু অসুখে পড়লেন। খাটনি হয়েছিল তো খুব। তাই জ্বর—বুকে ব্যথা। পাশের ঘরে প্রতিরাত্রে শুয়ে থাকি। উনি ডাকলে ঘুম ভেঙে যায়। কাছে যাই। একদিন·····

গঙ্গা হঠাৎ থেমে নিজের পা দুটো দেখতে থাকল। রাহুল বলল, থাক্।

গঙ্গা মাথা দোলাল।···না লজ্জা আমার সাজে না। অন্তত তোমার কাছে লজ্জা করলে সারাজীবন যন্ত্রণায় জ্বলে পুড়ে মরতে হবে। আসলে সবই তো আমাদের সংস্কার রাহুল, তাই না? বেশি লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাইনি তোমার মতো—কিন্তু জীবনের চারপাশে যা ঘটেছে যা দেখেছি তা থেকেই আমার অনেক শেখা হয়ে গেছে। আর তুমি তো জানো—খুব কম বয়সে বিয়ে হয়েছিল। স্বামী কী বোঝবার আগেই বিধবা হয়েছিলুম। তাই ভিতরে ভিতরে খুব পেকে উঠেছিলুম। যখন বুঝতে পেরেছিলুম যে আর আমায় বিয়ে হবে না—তখনই একটা বিদ্রোহ করার ঝোঁক মাথায় এসে গিয়েছিল। দিনে দিনে তত

লোভী হয়ে পড়েছিলুম। সেই লোভ আমাকে সাহস যোগাচ্ছিল অনেক। সে সবই তুমি জানতে পেরেছিলে। পারনি রাহুল?

রাহুল বলল, সেকথা থাক্।

গঙ্গা জেদের সাথে বলল, ওকথা এড়িয়ে যাবার নয়। কেন যাবো? কেন আমি অপরাধী হয়ে থাকব তোমার কাছে? আমি তো কোন দোষ করিনি।

শেষ কথাটা বলতে তার গলার স্বর কান্নার চাপে ভেঙে পড়ল। সে আঁচলে চোখ ঢাকল। একটু নত হল! রাহুল তেঁতো মুখে বলল, কান্নাটান্না আমার ভালো লাগে না।

গঙ্গা সামলে নিয়ে ভাঙ্গা কণ্ঠস্বরে বলল, কাঁদতে দাও আমাকে। বিশ্বাস করো, কতদিন আমি কাঁদিনি। সেই বাবার মরার সময় একবার কেঁদেছিলুম। আর একবার—বলছি সেকথা। কিন্তু আমি যে প্রাণভয়ে কাঁদতে চাই রাহুল। ভিতরে কত কান্না চেপে আছি—কেউ তো জানে না। অথচ কাঁদতে ভয় হয়—লোকে হাসবে। টিটকারী করবে।

রাহুল বলল, তোমার আবার কান্না কিসের? বেশ তো আছ।

গঙ্গা শান্ত হবার চেষ্টা করে বলল, অসুখের সময় তোমার বাবা বুকে হাত বুলিয়ে দিতে বলতেন। এত শ্রদ্ধাভক্তি করতুম, আপনজন ভাবতুম ওঁকে! বাবার অভাব আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু একরাত্রে বুকে হাত বুলোতে গিয়ে হঠাৎ উনি আমাকে .....

গঙ্গা ফুঁপিয়ে উঠে দুহাতে মুখ ঢাকল। কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর রাহুল বলল, বুঝেছি। কিন্তু ওঁর কাছে শুনলে হয়তো অন্য রকম শুনব।

গঙ্গা সবেগে মাথা নেড়ে বলল, না, না। আমি যা বলছি, সব সত্যি। আমাকে উনি যেন বশ করে ফেলেছিলেন। খারাপ লাগত। কষ্ট হত। কিন্তু ওঁকে চটাতে সাহসও পেতুম না। আর আস্তে আস্তে আমি ওঁর কাছে অবশ হয়ে পড়ছিলুম। মনে হচ্ছিল, রাগ করে উনি চলে গেলে আমি খুব অসহায় হয়ে পড়ব। শুধু ভাবতুম, উনি না থাকলে আমার কী হবে! শিউরে উঠতুম। রাহুল, আমাকে পাপের পথে টানবার লোক তখন চারপাশে অনেক ছিল—এখনও আছে। কিন্তু পুণ্যের পথে টানবার মতো উনি ছাড়া আর কেউ ছিল না। যদি বলো, কী সেই পুণ্য—আমি বলব, ঘর-সংসার। আমি বিধবা—আমার ঘরসংসার আর হবে না, এটা যে মনে মনে কোনদিন মেনে নিতে পারিনি। আগেই বলেছি না? লোভ আমাকে পাগল করে তুলেছিল।

রাহুল বলল, এর কোনটাতেই আমি দোষ দিইনে তোমাকে। আমার প্রশ্ন অন্যখানে। বাবাকে তুমি ঠকিয়েছ—সাংঘাতিকভাবে ঠকিয়েছ।

কেন শুনি ?

সাতবছর আগের সেই দিনগুলো তোমার মনে রাখা উচিত ছিল।

ছিল মনে ? কিন্তু সেই দুর্দিনে তুমিও তো কোন খবর রাখ নি, রাহুল। তোমার বাবা না হয় রাগ করে খোঁজ নিতেন না। তুমি কেন নাওনি ?

নিলে কী করতে ? বাবার আক্রমণ থেকে বাঁচতে ছেলের কাছে আশ্রয় নিতে ?······রাহুল অস্ফুট হাসল।

অসভ্য ! গঙ্গা ক্ষুব্ধভাবে বলল।···তুমি এত নিষ্ঠুর হয়ে গেছ রাহুল ?

নিষ্ঠুরতা কোথায় ? যা সত্যি, তা খোলাখুলি বলা ভালো। অনেক সত্যি কথা গোপন রাখি বলেই তো আমরা কষ্ট পাই। ঠকতে হয়। তাছাড়া আমার প্রশ্ন হচ্ছে—বুঝলাম, বাবা তোমাকে দেখে বা হাতের কাছে পেয়ে হ্যাংলা কুকুরের মতো লোভী হয়েছিলেন—কিন্তু তুমি ? তুমি তো খুলে বললেই পারতে যে অনেকদিন আগে তাঁর ছেলের সঙ্গে তোমার একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটেছিল ! তাহলে বাবা নিশ্চয় লজ্জা পেতেন।

গঙ্গা নির্বিকার মুখে বলল, পেতেন এবং আমাকে ফেলে পালিয়ে যেতেন।

বেশ তো, যেতেন।

আর চান্দিক থেকে কুকুর আর শকুন এসে ভাগাড়ে পড়ত। কেমন ?

রাহুল জবাব দিল না। চুপ করে থাকল। সে কথা খুঁজছিল। গঙ্গা বলল, এর কোন জবাব তোমার নেই। তাই সহজভাবে সবকিছু মেনে নাও রাহুল।

রাহুল সব্যঙ্গ হেসে বলল, তার মানে—তবু তোমাকে ছোটমা বলতে হবে ? মায়ের আসনে বসাতে হবে ? শ্রদ্ধাভক্তি করতে হবে ?

গঙ্গা ধরা গলায় বলল, তা বলছিনে। নাই বা করলে শ্রদ্ধা-ভক্তি !

রাহুল চঞ্চলতার সুরে হাল্কাভাবে বলল, ছাখো গঙ্গা—মা একজনই থাকে। লোক ছাখানো ভব্যতায় কাকেও হয়তো মা-টা আমরা বলে থাকি, মায়ের পূজোটুজো দিই—কিন্তু মা একজনই আসলে—যার পেটে আমি জন্মেছিলুম। নারী মাতৃসমা বলে একটা কথা চালু আছে। ওটা অর্থহীন। বিশেষ করে বয়স নামে যখন একটা ব্যাপার আছে। কোন যুবকের মা কোন যুবতী হতে পারে না। সেটা ইললজিক্যাল, ইররাশানাল—সুস্থ মস্তিষ্ক লোকের কাছে একটুও সত্যি ব্যাপার নয়। আমি তা ভাবতে পারিনে। ওটা নিতান্ত

আত্মপ্রবঞ্চনা। দুর্বল লোকদের পক্ষে যা সত্য, তা সকলের কাছে নাও সত্য, হতে পারে।

গঙ্গা একটু চুপ করে থেকে বলল, বেশ। মা ভেবো না—যা খুশি ভেবো। আমিও তোমাকে অন্যকিছু ভাবব। ধরে নাও—এ বাড়ির তুমি একজন মানুষ মাত্র। কিন্তু তুমি এখানে থাকো রাহুল।

রাহুল হেসে উঠল।···তোমাকেও কেউ ব্ল্যাকমেইল করেছে না তো? বুঝেছি অরুণদা বা মণিশঙ্করের মতো তোমারও একজন বডিগার্ড দরকার। তাই না?

গঙ্গা উঠে দাঁড়াল।···না। আমার বডিগার্ড দরকার নেই—আমি অনেক ঠেকে আত্মরক্ষার কৌশল শিখেছি। তুমি এমনি থাকো। তোমারও তো পায়ের নিচে মাটি দরকার। কেন তুমি ভবঘুরে হয়ে বেড়াবে! এখানে তোমার অধিকার আছে। সেটা তুমি দাবী করে নাও। তারপর আর পাঁচটা সুস্থ মানুষের মতো ঘরসংসার করো। ব্যস, তাহলেই আমি খুসি।

রাহুল পা নাচাতে-নাচাতে বলল, এমন হিতাকাঙ্ক্ষী মানুষ থাকতে আমি শালা টোটো করে ঘুরে মরছিলুম! যাকগে—চা-টা তো দাও। দেখা যাক্।·····

গঙ্গা বেরিয়ে গেল। বাইরে তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সে ঘোঁতনকে ডাকছে।

ছয়

আবার বাবার মুখোমুখি রাহুল। ঘরে আর কেউ নেই। গঙ্গা যেন নিশ্চিন্ত হয়ে হোটেলের দিকে চলে গেছে। বলে গেছে, অরুণের বাড়ি থেকে তোমার ব্যাগপত্তর আনতে ঘোঁতনকে পাঠাচ্ছি। তুমি কখনো ওদিকে পা বাড়বে না আর। রাহুল মুখ টিপে হেসে সায় দিয়েছে।

এবার বাবার মধ্যে কিছুটা নির্বিকার ভাব লক্ষ্য করে অবাক হল রাহুল। হৃষিকেশ নিষ্পলক কয়েক মুহূর্ত ছেলের দিকে তাকিয়ে শুধু বললেন, বসো।

রাহুল মোড়াটা টেনে নিয়ে বসল। বলস, এখন কেমন আছেন?

হৃষিকেশ সেকথার জবাব না দিয়ে বললেন, এসে অব্দি অনেক কীর্তি করে বেড়াচ্ছ শুনছি। সব কানে আসছে।

রাহুল বলে উঠল, কিসের কীর্তি! এখানের লোকগুলো আমাকে যেন সইতে পারছে না। তাই সামান্য ধস্তাধ্বস্তি হচ্ছে। আবার কী!

হৃষিকেশ পাশ ফিরে বললেন, এরপর জানশুদ্ধ মেরে দেবে—তখন আর পস্তানোর সুযোগ পাবে না। আমার আর কতক্ষণ! ওবেলা দেখবে, নেই। শুধু দুঃখ হয়—তোমার অমন তাজা জীবনটা তুমি নষ্ট করে দেবে! শীগগির তোমার চলে যাওয়া উচিত। এ কাজ তোমার নয়।

রাহুল দারুণ চমকে উঠে বলল, কী কাজ!

হৃষিকেশ কোন জবাব দিলেন না।

রাহুল উত্তেজিতভাবে একটু ঝুঁকে পড়ল বাবার দিকে।…কী কাজ আমার নয় বলছেন? বাবা!

উঁ!

আপনি কী ভেবেছেন, শুনি?

ভাবনার ব্যাপার নয়, রাহুল। আমি সব জানি—তুমি কেন হঠাৎ এখানে হাজির হয়েছ। তোমার মুরুব্বীরা একটু ভুল করেছেন। তোমার মতো চপলমতি ছেলের পক্ষে এসব কাজ একেবারে অসম্ভব। তাছাড়া ওঁরা কেন ভাবলেন যে হৃষিকেশ জেনেশুনে নিজের ছেলেকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবে? কোন বাপ তা পারে না।

রাহুল গুম হয়ে বলল, তাহলে রাজেনবাবুদের ইনফরমার আপনিই?

হৃষিকেশ বিরক্ত হয়ে বললেন, আমি কারও ইনফরমার নই। নিতান্ত দায়ে পড়ে ওঁদের সাহায্য চেয়েছিলুম। ভাবিনি যে ওঁরা তোমাকেই পাঠিয়ে বসবেন।

রাহুল চাপা গলায় বলল, আমার এক বছরের কোন কিছু আপনি জানেন না। আমি আর সে-রাহুল নই বাবা। আমাকে আপনি খুলে বলুন সব। কিছু পারি না-পারি—অন্তত সান্ত্বনা থাকবে যে আপনার কিছুটা কাজে লেগে-ছিলুম। আর সেজন্যে মরতেও আমি পিছ-পা নই!

হৃষিকেশ ঘুরে সোজা হলেন। স্থিরদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, ওরা যে তোমাকেই পাঠিয়েছেন—সে খবর আমি গতকাল পেলুম। তারপর থেকে খুব অস্থির হয়েছিলুম। যাক্‌ গে, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তোমাকে বলছি রাহুল, তুমি এক্ষুনি চলে যাও এখান থেকে। আমি আর বাঁচব না। বাঁচতে ইচ্ছে নেই। শুধু ওই বাচ্চাটার জন্যে দুঃখ হচ্ছে। রাগও হচ্ছে। ভীষণ একটা হঠকারিতায় সব ঘটে গিয়েছিল। তার জন্যে অবশ্য ওর

কোন দায়িত্ব নেই—যত দায়িত্ব আমার। ও হয়তো রাস্তার ছেলে হয়ে যাবে। কী করব!

রাহুল বলল, খুলে বলুন বাবা। আমার সব জানা দরকার। হাইওয়েতে কারা রাহাজানি করছে—তার সঙ্গে আপনার কিসের সম্পর্ক! আপনিই বা কিসের দায়ে পড়ে রাজেনবাবুদের খবর পাঠিয়েছিলেন। ওদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগই বা কার মারফত? কে সে?

হৃষিকেশের মুখটা থমথম করছিল। অনেক কষ্টে উত্তেজনা দমন করছেন যেন। বললেন, ওসব জেনে কী হবে? তুমি চলে যাও রাহুল। তাছাড়া—ধরো, বদমাইসির এই র‍্যাকেটটা তুমি যে কোন ভাবে ভাঙলে—কিন্তু তাতে আমার তো শান্তি হবে না। এ একটা দারুণ সমস্যা—তুমি বুঝবে না। এ বুড়ো বয়সে একটা সুন্দর পরিচ্ছন্ন ঘরসংসারের আশা করেই ভবানীবাবুর মেয়েকে বিয়ে করলুম—

রাহুল বাধা দিয়ে বলল, বিয়ে আপনি নাকি বাধ্য হয়ে করেছিলেন?

হৃষিকেশ একটু থেমে ভেবে নিয়ে বললেন, ওটা বাইরে-বাইরে আমার লোক দেখানো ছল। বিয়ে আমি করতুম। ও সন্তানসম্ভবা ছিল। তাই কিছুটা দ্বন্দ্বেও পড়ে গিয়েছিলুম। তবে শেষে বিয়ে করতুমই। রন্টুর মা একটু হইচই করে ফেলল খামোকা। যাক্ গে—যা হবার হল। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখি, আমি ঠকেছি! আমার সংসারের নিচে কোন মাটি নেই। কারণ—যা নিয়ে আমার নতুন সংসারের আশা, সেখানেই সর্বনাশ ওৎ পেতে আছে।

রাহুল উত্তেজিতভাবে চাপা গলায় বলল, রাজেনবাবুর কাছে শুনেছি—তিনজন লোক রয়েছে র‍্যাকেটের পিছনে। তাদের একজনের নাকি মাথায় বড় বড় চুল—মেয়ে বলে ভুল হয়েছিল আপনার। এখন বুঝতে পারছি, আপনি ঠিকই চিনেছিলেন বা বরাবর চিনতেন—শুধু খুলে বলতে পারেননি। কারণ সে আপনার—

হৃষিকেশ কঠিন মুখে প্রশ্ন করলেন হঠাৎ, সে আমার কী?

রাহুল জবাব দিল, স্ত্রী।

হৃষিকেশ অস্থিরভাবে বলে উঠলেন, ধরো যদি তাই হয়—তুমি কী করবে? ওকে ধরিয়ে দেবে, তাইতো? তখন রন্টুর কী হবে? আর আমার এই অবস্থা—আমি কী করব? কখনো ভেব না যে ওদের র‍্যাকেটটা পুরো ভেঙে দিতে পারবে। যদি বা পারো, তারপর তোমার এখানে অক্ষত থাকা

সম্ভব ভাবছ? অসম্ভব। তখন কী করবে? রণ্টু কী করবে? আমি যদি বেঁচে থাকি—আমিই কী করব? না খেয়ে পথে পথে ঘুরে মরব দুটিতে! হোটেলের অবস্থা যা—তাতে কোন ভরসা নেই। ওটা এখন রণ্টুর মায়ের মুখোস মাত্র। তাছাড়া এই বাড়ি বা হোটেল—কোনটাই তো আমার নয়। সব হচ্ছে ওর। বেচবার মালিক আমি তো নই। অনেক সমস্যা আছে, রাহুল। ছেলেমানুষী করো না। কেন তুমি আমার আরও সর্বনাশ করতে এসেছ? যেটুকু বাকি ছিল—তা না সারলে বুঝি স্বস্তি পাচ্ছ না। তাই না?

রাহুল একটু চুপ করে থেকে বলল, আচ্ছা বাবা, আর দুজন লোকের নাম আপনি জানেন—তারা কে?

হৃষিকেশ জবাব দিলেন, নাম জেনে কী লাভ? তুমি চলে যাও।

রাহুল বিরক্ত হয়ে বলল, যদি না যাই?

বেশ, যেও না—যা খুসি করো। হৃষিকেশ পাশ ফিরে শুলেন।...তোমার জীবন তোমার। যদ্দিন কিছু বলার অধিকার ছিল, বলেছি। আর বলি নে। বলবও না। শুধু একটা কথা—আমি চাইনে যে তুমি নিজের খেয়াল চরিতার্থ করতে রণ্টুর সর্বনাশ করো।

রাহুল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, রণ্টুর দায়িত্ব আমি নিলুম।

হৃষিকেশ চকিতে ঘুরলেন। তাহলে তুমি রাজেনবাবুর কথামতো কাজ করবে?

হ্যাঁ।

কেন? কী পাবে তুমি? দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ বদমাস আছে—থাকবে। তুমি কি তাদের ত্রাণকর্তা? আর—তুমি নিজে কী, শুনি?

আমি অনেক টাকা পাবো। তাই দিয়ে—

মিথ্যা কথা?... ফুঁসে উঠলেন হৃষিকেশ।...টাকার নেশা তোমার নেই—আমি জানি। এ স্রেফ তোমার একটা জিঘাংসা।

জিঘাংসা?

হ্যাঁ—তাই। তুমি ভেবো না যে আমাকে ফাঁকি দেওয়া এত সহজ। আমি কিছুতে বিশ্বাস করিনে যে রাজেনবাবুর কথায় তুমি লক্ষ্মী ছেলের মতো ময়নাচকে চলে এসেছ।

রাহুল এক পা বাড়িয়ে বলল, তাহলে কেন এসেছি?

তুমি আমার ছেলে না হলে বলে ফেলতুম। যাও, আমাকে ঘাঁটিও না।

রাহুল কঠিন কণ্ঠে বলল, না—আপনি বলুন।

হৃষিকেশ মুখ ফিরিয়ে নিলেন। শান্তভাবে বললেন, সব জেনেও আমি স্বেচ্ছায় বিষ খেয়েছি। এ আমার চরিত্রের বরাবর দুর্বলতা। নিজেকে ধিক্কার দিয়েও লাভ নেই। আত্মহত্যা করতেও ভয় পাই। আমি সত্যি বড় অসহায় রাহুল, তুমি ক্ষমা করো আমাকে!

একটু দাঁড়িয়ে থেকে রাহুল চলে এল। তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। রোমকূপে আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে সে গঙ্গার ঘরে এসে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বেরোল। হাইওয়ে ধরে সোজা অরুণের ইটখোলার দিকে চলতে থাকল। সাতবছর আগে গঙ্গার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা বাবা তাহলে আঁচ করেছিলেন। তবু তাঁর দ্বিধা হয়নি এতটুকু?

অরুণ সবে বিছানা ছেড়ে উঠেছে। রাহুলকে দেখে বলল, আরে, ব্যাপার কী তোমার? রাত্রে শংকরদার ওখানে ছিলে না? ঘোঁতনা এসেছিল এই মাত্র। তোমার ব্যাগট্যাগ নিতে এসেছিল। দিইনি। বিশ্বাস করিনি, ওর কথা।

রাহুল বলল, ঠিক করেছ অরুণদা।

সে বিছানায় সটান শুয়ে পড়ল। শরীর একটু দুর্বল মনে হচ্ছিল এতক্ষণে। মাথাটা ঘুরছে। বাবার কথাগুলো সে ভুলে যেতে চেষ্টা করল—কিন্তু অলক্ষ্যে বেঁধা কাঁটার মতো সেটা অনবরত খচখচ করছে। কিন্তু আশ্চর্য মেয়ে ওই গঙ্গা। নিজের বয়স ডিঙিয়ে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে ভাবা যায় না। তার মুখে সাত বছর আগে দেখা সেই গ্রাম্য সারল্যটা অবিকৃত থাকলে একটু সমস্যার সৃষ্টি হত নিশ্চয়। রিভলবারের গুলিটা ঠিক কোথায় লাগা উচিত, সে মনে মনে টিপ করতে থাকল। মৃত্যু! একটি মৃত্যু দিয়ে সেই পাপস্পৃষ্ট ভালবাসার মূল্য শোধ তাকে করতে হবে। না রাজেনবাবু, না—তোমাদের সরকারের সুনাম, প্রশাসনের দক্ষতা বা সামাজিক শৃংখলা, কিংবা আইন ব্যবস্থা সচল রাখবার মাথাব্যথা আমার একটুও নেই। ছিলও না। এ আমার একটা অদ্ভুত প্যাসন—রক্তের দিকে, ধ্বংসের দিকে ছুটে যাওয়ার প্রচণ্ড আবেগ। এটাই আমার জীবন। জীবনের স্বাদ। কিন্তু এমন অদ্ভুত অবস্থায় আমি কখনও পড়িনি।···

অরুণ বলল, সান্টুটা আমাকে উত্ত্যক্ত করে মারছে তোমার জন্যে। ওর

আসবার কথা আছে এখন। একটা কথা বলে রাখি রাহুল। ও ভাব করতে চায়—করো, আপত্তি নেই। কিন্তু খর্বদার, খুব বেশি মিশবে না ওর সঙ্গে। কখন কিসের সঙ্গে তোমাকে জড়িয়ে ফেলবে—টেরও পাবে না। অমনি করেই তো আমাকে জড়িয়েছে ব্যাটা।

রাহুল বলল, কিসে জড়িয়েছে অরুণদা ?

অরুণ কাছে এসে বসল। সতর্কভাবে চারপাশটা দেখে নিয়ে বলল, সে অনেক কথা। সংক্ষেপে বলছি, শোন। গতবছর বর্ষার সময় একরাত্রে হঠাৎ একজন লোক কিছু চোরা মালপত্র এনে আমার কাছে রাখতে বলল—পরে সময় মতো নিয়ে যাবে। তার নাম বলতে পারছিনে—যাই হোক, সে এমন লোক যে তার কথা এড়ানোর সাধ্য আমার ছিল না। মালগুলো রাখলুম। কিন্তু তারপর আর তার নিয়ে যাবার কোন লক্ষণ নেই। এদিকে পুলিশ নাকি খোঁজাখুঁজি স্থরু করেছে। আমি পড়লুম মহাসমস্যায়। সেই ফাঁকে ব্যাটা সানু একদিন এসে হাজির। ঝানু লোক—হয়তো টের পেয়েছিল কীভাবে। আমি বোকার মতো ওর প্যাঁচে পড়ে গেলুম। বলে ফেললুম সব। ব্যস্, সেই হল আমার কাল। ব্যাটা গুম হয়ে গেল! তখন হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলুম সেই লোকটার কাছে। বললুম, শীগ্‌গির মাল সরিয়ে ফেলে প্রাণ বাঁচাও দাদা। সানু ঘোরাঘুরি করছে। সানুকে যে সব বলেছি, সেটা গোপন রাখতে হল। বেলাবেলি মাল সে সরিয়ে নিল! কিন্তু তারপর স্থরু হল সানুর জুলুম। টাকা দাও—নয়তো পুলিশে ফাঁস করে দেব। ভাই রাহুল, পুলিশ কিছু প্রমাণ আর হয়তো পেত না—কিন্তু কথায় বলে—বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। আমি নিরীহ মানুষ—কোন সাতে পাঁচে নেই। পুলিশের খাতায় নাম উঠলে ইটের কণ্ট্রাকটগুলো নির্ঘাৎ বাতিল হয়ে যাবে। তাই—

রাহুল বলল, সানু আপনাকে ব্ল্যাকমেইল করে, তা জানি। কিন্তু মণিশঙ্করকে করে কেন জানেন ?

অরুণ বিকৃত মুখে বলল, তাহলে আর ঢাক গুড়গুড় করে লাভ নেই। মণিশঙ্কর একটা হাড়ে-হাড়ে নচ্ছার। ডাকাতের বাড়া শালা। ওই মাঠের মধ্যে থাকার আসল কারণ কি জান ?

রাহুল বলল, হাইওয়েতে রাহাজানি ?

হ্যাঁ। ওই শালাই তো আমার ঘাড়ে পাপের বোঝা এনে বিপদে ফেলল! ইটের কণ্ট্রাকটারী গেলে আমি কী করব বলতে পারো ? এমন চমৎকার সহজ ব্যবসা নষ্ট হলে কী বিপদে পড়ব বুঝতেই পারছ। ··অরুণ চাপা স্বরে বলতে

থাকল।···মণিশঙ্কর ডাকাতের ওস্তাদ। ভদ্রলোক ভালমানুষ সেজে থাকে। সে গোল্লায় যাক্, আমার মাথাব্যথা নেই। কথাটা হচ্ছে, সানুকে কীভাবে সামলাবো!

রাহুল হেসে বলল, কেন? তার সঙ্গে তো শীলার বিয়ে দিচ্ছেন?

অরুণ তেঁতো মুখে বলল, হ্যাঁ। সেটা মিথ্যে নয়। কিন্তু জেনেশুনে শীলার মতো মেয়েকে ওর হাতে দিতে কি ইচ্ছে করে ভাই? তাই যখনি তোমাকে এখানে দেখেছি, সঙ্গে সঙ্গে আমার মত বদলেছে।

আমি কি করতে পারি?···রাহুল গম্ভীর হয়ে বলল।

অরুণের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। সে বলল, সানু শালাকে সাবড়ে দিতে পারো? একেবারে খতম! যত টাকা চাই তোমার—দেব। সিরিয়াসলি বলছি রাহুল! অনেক তো করেছ-টরেছ। এটুকু কি আর পারবে না? তুমি না পারলে পারবেই বা কে? দাও না শুয়োরটাকে শেষ করে। রাহুল! তোমার হাত ধরে বলছি—আমাকে তুমি বাঁচাও। শীলাকেও বাঁচাও।

আগের দিনে হলে রাহুল লাফিয়ে উঠে বলত—আলবাৎ। কিন্তু সে দেখল, তার ভিতরে যেন কী গুরুতর পরিবর্তন ঘটে গেছে। নিঃসাড় হয়ে পড়েছে ভিতরটা। সে শান্তভাবে শুয়ে রইল। কোন জবাব দিল না। সে অন্য একটা কথা ভাবতে থাকল। তাহলে রাজেনবাবুর মুখে শোনা সেই কালো ত্রিভুজের একটি বাহু মণিশঙ্কর, অন্যটি গঙ্গা। কিন্তু তৃতীয়টি কে? অরুণ কি তাকে সত্যি কথা বলল? যদি না বলে থাকে, তাহলে অরুণই কি তৃতীয় বাহু? গঙ্গাকে খতম করতে তার হাত কাঁপবে না। গঙ্গার মৃত্যু যত শীগ্‌গির ঘটে, তত ভালো—সে একটা পরম নিষ্কৃতি যেন। আর মণিশঙ্করের বেলায় একটু দ্বিধায় পড়তে হয়। সে তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে গত রাত্রে। নন্দরা তাকে শেষ করে দিত—ভাগ্যিস মণিশঙ্কর কোনক্রমে দৈবাৎ সেখানে এসে পড়েছিল! খুব জটিল সমস্যা। তৃতীয় ব্যক্তিটি অরুণ হলেও একটু ইতস্তত করার আছে। ওর রোগা বউ করুণার জন্যে মায়া হয়। আর শীলা—শীলা যদি কোনদিন টের পায়!···

একটু পরে রাহুল স্পষ্ট জানল, আসল সমস্যা শীলা। তার জীবনের ঘুরন্ত চাকার কেন্দ্রে জড়িয়ে গেছে হঠাৎ। কিছু ঘটলে বা ঘটাতে গেলে শীলার দিকে তাকে তাকাতে হচ্ছে বার বার। শীলা যেন তাকে খুব গভীর থেকে টান দিচ্ছে। ক্লান্তি ঘাম রক্ত ঘৃণা অবিশ্বাস থেকে বাইরে দূরে নিয়ে যেতে চাচ্ছে তাকে—একটা স্বচ্ছন্দ বিশ্বাসে, একটি সরলতায়।

অরুণ ঝোঁকের বশে তার আহত ডানহাতটা ধরে আছে। রাহুল সাবধানে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, সান্টুটান্টুকে মেরে কী হবে? বরং এক কাজ করলেই পারেন অরুণদা। শীলাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিন।

অরুণ হতাশ চোখে চেয়ে বলল, আর আমি? আমার কী হবে?

কেন? আপনারা সবাই বেথুয়াডহরিতে চলে যান।

এত সব ইট পত্তর কী হবে?

কাকেও বিক্রী করে দিন। আপনি বাঁচলে বাপের নাম! হেসে উঠল রাহুল।

অরুণ গুম হয়ে কয়েক মুহূর্ত বসে রইল। তারপর বলল, সেও ভেবেছি। অনেকবার ভেবেছি। কিন্তু ফের কোথাও গিয়ে নতুন কনট্রাক্ট পাওয়াও তো চাট্টিখানি কথা নয়।

রাহুল কঠিন মুখে বলল, দেখুন অরুণদা—ওটা কোন ব্যাপারই নয়। আপনি আসলে ময়নাচক ছেড়ে যেতে রাজী নন। কারণ এখানে যেকোনভাবে হোক, সম্ভবত যখের ধনের খোঁজ আপনি পেয়ে গেছেন। খুব সহজে অনেক বেশি টাকা পাবার সুযোগ থাকলে মানুষ পাগল হয়ে উঠে নেশায়। আপনিও হয়েছেন। আপনার ইট খোলাটা সত্যি বড় রহস্যময় লাগছে এখন।

অরুণ তার দিকে নিষ্পলক তাকাল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, মনে হচ্ছে তুমিও সান্টুর দলের লোক। রাহুল, তাহলে শীলাকে সান্টুর হাতেই তুলে দিচ্ছি। ভেবেছিলুম—

ওকে চুপ করতে দেখে রাহুল সকৌতুকে বলল, কী ভেবেছিলেন?

অরুণ মুখ নামিয়ে বলল, শীলাকে তুমি পছন্দ করেছ। তোমার সঙ্গে ওর বিয়ে দেব। আমার তো ছেলেপুলে নেই—হবারও আশা নেই। তোমরাই হবে আমার সবকিছুর মালিক।

রাহুল হাসতে গিয়ে পারল না। শুধু বলল, বাঃ! চমৎকার!

কেন? শীলা কি খুব একটা অযোগ্য মেয়ে, রাহুল? খোঁজ নিলে জানতে পারতে ও সামান্য ঘরের মেয়ে নয়। ঘর-বংশ-গোত্র সবদিক থেকে ওদের মর্যাদা বড় কম না। বামুনহাটির আশু রায়চৌধুরীর মেয়ে শীলা। আশুবাবুকে তুমি দ্যাখোনি? উনিই আমাকে ছেলের মতো মানুষ করেছিলেন। ব্যবসা শিখিয়েছিলেন। বেথুয়াডহরিতে ওঁর ইট আর টালিভাটা ছিল। উনি মারা গেলেন। শীলা আর তার মা তারপর থেকে আমার আশ্রয়ে রইল। শীলার মা হঠাৎ···

রাহুল বলল, কী হল ?

অরুণ বলল, তোমাকে বলতে লজ্জা নেই। শীলার মা মেয়েকে ফেলে হঠাৎ একদিন চলে গেল। বেথুয়াডহরির এক স্কুল টিচারের সঙ্গে পালাল সে। তারপর আর খবর নেই কতদিন। শীলা তখন বাচ্চা মেয়ে। যাই হোক, খবর একদিন এল। শীলার মা আত্মহত্যা করেছে।

রাহুল চমকে উঠল।···কেন ?

স্কুল টিচারটি লোক কেমন ছিল, সবাই তো জানতুম। আসলে সে একটা ফোরটুয়েনটি—মস্তো চিটার। ফলস্ সার্টিফিকেট যোগাড় করে নানা জায়গার স্কুলে গিয়ে চাকরী নিত—জমিয়ে তুলত। তারপর একটা বিয়ে করে বউ নিয়ে উধাও হত। কিছুদিন পরে দেখা যেত—মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসছে। শীলার মায়ের বেলা ঘটল অন্যরকম। শীলার মা আত্মহত্যা করে বসল। তার একটা চিঠিই হল লোকটার পক্ষে সাংঘাতিক। ডি. এম. কে চিঠিতে ওর সব কাণ্ড কারখানা লিখে তারপর হয়তো ঝোঁকের বশে আত্মহত্যা করেছিল শীলার মা। অনেকে সন্দেহ করে, জোর করে লোকটাই বিষ খাইয়ে মেরেছিল। যাই হোক—লোকটা ধরা পড়ল। কাগজে খবর উঠল। ঢি ঢি কাণ্ড একেবারে। জেল হল ওর। তারপর আর খবর জানিনে। হয়তো জেল থেকে বেরিয়ে আবার কোথায় কী করে বেড়াচ্ছে। শালা বদমাসে চিটারে দেশটা একেবারে নরক হয়ে উঠেছে দিনে দিনে।

রাহুল একটু হাসল। বলল, হ্যাঁ—আমরা সবাই মিলে নরক গুলজার করছি। তাই না অরুণদা ? কেউ—কেউ বাদ নেই।

অরুণ একটু অপ্রস্তুত হল। বলল, তা যদি বলো—তো বলব, দিনেদিনে অবস্থা যা হচ্ছে—আর কেউ ভালো মানুষ থাকবার উপায় আছে ? সবাইকে জড়িয়ে পড়তেই হচ্ছে পাঁকে। তোমার বাবা—মাস্টারমশাই একটা চমৎকার কথা বলেন। একটা মস্তো চাকা আছে—তার আধখানা স্বর্গ, আধখানা নরক। এখন মাটিতে নরকের দিকটা রয়েছে। মাস্টারমশাই বলেন, এই দ্যাখো না অরুণ, আমি—আমার মতো মানুষও হেঁটমুণ্ড উর্ধ্বপদ হয়ে নরকে ঘষা খাচ্ছি। হ্যাঃ হ্যাঃ, হ্যাঃ !

অরুণ হাসতে পেরে অপ্রস্তুত ভাবটা সামলে নিল। রাহুল বুঝল, অরুণ তার বাবাকেও জড়িয়ে নিজের বদমাইসির সমর্থন দাঁড় করাচ্ছে আসলে। তবে সে তো মিথ্যা নয়। রাহুল চুপ করে থাকল। শীলার কথা ভাবতে তার অবাক লাগছে। এই শীলার মতো মেয়ের পিছুনেও অন্ধকারের উপদ্রব আছে !

অরুণ একটু কেসে বলল, তা—রাহুল, আমার কথার কোনো জবাব পাইনি ভাই।

কী কথার?

শীলার কী হবে?

আমি কেমন করে বলবো?

লুকিও না রাহুল—আমি জানি, শীলাকে তুমি পছন্দ করো। শীলাও তোমাকে—

বাধা দিয়ে রাহুল হেসে বলল, পছন্দ করে—অর্থাৎ ভালবাসে? ফেট্!

অরুণ তার দিকে ঝুঁকে চপলভাবে বলল, আমি খুব বেঁচে যাই রাহুল, তোমার বউদিই প্রথম আমাকে একটু হিন্ট্ দিয়েছিল। মেয়েরা মেয়েদের সবকিছু টের পায় কিনা। তুমি আর না করো না। যদি বলো—আজকালের মধ্যেই একটা শুভক্ষণ দেখে সব ঠিক করে ফেলছি। শালা সানু পাঠাটা ধড়ফড় করে মরুক না। ঢাক বাজাব আর নাচব হে।

রাহুল কোন জবাব দিল না। অন্ধকার রাজত্বের আইনকানুন বেশ মজার। অন্ধকারের এক শক্তিমান অনুচর সে। তাই সে রাজত্বের সবখানে তার সম্মান—তার গুরুত্ব—তার মর্যাদা—তাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। কেউ দিতে চায় আত্মীয়তার নিবিড় সম্পর্ক, কেউ বন্ধুত্ব, কেউ টাকা। রাজেনবাবু, গঙ্গা, মণিশঙ্কর, অরুণ আর তার বউ, সানু চ্যাটারজি—সবাই তাকে নিয়ে কাড়াকাড়ির প্রতিযোগিতা চলেছে। সে মানুষ মারতে পারে ঠাণ্ডা হাতে নির্বিকার মুখে। এই খবরটা জানাজানি হতেই এত সব হইচই। কলেজ জীবনে তার এক বন্ধু একটা কবিতা আওড়াত। কবিতাটা শুনে-শুনে নিজের অজানতে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজী কবিতা।

And at last the killer came…
অবশেষে এল সেই ঘাতক!
কথা ছিল তার হাতে থাকবে
এক টুকরো ইস্পাত
ঋজু মসৃণ নীল ঠাণ্ডা আর কঠিন
মৃত্যুর অতৃপ্ত জাতক
তৃষ্ণা যার রক্তে হয় নিবৃত্ত—
অথচ এ কী তার রূপ!
শান্ত রুগ্ন ভীতু ছন্নছাড়া প্রেমিক

কম্পিত পদক্ষেপ তার ধূলিধূসর ক্লান্ত তুটি পায়ে
শূন্য নগ্ন হাত ভিখারীর প্রার্থনায় জড়োসড়ো
রুক্ষ চুলে কামনার তুঃখগুলি হাওয়ার মতন মৃত্নু কাঁপে
কামনার সুখগুলি শুধু তুটি চোখে জ্বলজ্বল করে
হায়, অবশেষে এল সেই ঘাতক
শুধু বলল, নমস্কার ॥······

শীলা ঘরে ঢুকে বলল, চা-টা খাবে—না সারা সকাল গল্প করা হবে? মুখ ধুয়েছ তোমরা?

অরুণ উঠল। তাই তো! বাসিমুখে ভ্যানর ভ্যানর করছি যে। শালা, যাচ্ছি ভাই। বেগনী ভাজিস নি আজ? রাহুল, ওঠ। সান্নু এখনও এলো না দেখছি। ভেবেছিলুম, শালার সঙ্গে বসে আজ ব্রেকফাস্ট করব।

সে হেসে উঠল। শীলা ঠোঁট কুঁচকে চলে গেল। রাহুল উঠে বসল। বলল, আপনার বোন আমাকে দেখে চমকালো না কিন্তু।

অরুণ চাপা গলায় সকৌতুকে বলল, তুমি চমকে দিতে পারলে কই?

সান্নু সে বেলা এল না। অরুণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ইটখোলার কাজের চাপ বেড়ে গেছে। সে তাই নিয়ে ব্যস্ত হল অবশেষে। রাহুল সারা তুপুর চুপচাপ শুয়ে কাটাল। খাবার সময় অরুণ একবার উঁকি মেরে বলে গেছে, আমার সামান্য দেরী হবে খেতে। তুমি একা খেয়ে নাও। করুণাবউদির সেই একই নাকিকান্না শুনতে শুনতে রাহুল কোনমতে খাওয়া শেষ করে চলে এসেছে। তারপর শীলা জলের গ্লাস দিতে এসেছে বাইরের ঘরে। তখন শীলার হাতটা চেপে ধরতে ইচ্ছে করেছিল রাহুলের। ধরে নি। সে আর শীলা পরস্পর শুধু হেসেছে। কোন কথা বলে নি।

রাহুল গত রাতের কথা ভাবছিল। যারা তাকে খুন করতে যাচ্ছিল, তারা কি সত্যি সত্যি নন্দ আর তার লোকজন? বিশ্বাস হচ্ছে না। সামান্য মারামারির জন্যে তাকে ওরা খুন করবে কেন? কথাটা যত সে ভাবল, তত তার বিশ্বাস দৃঢ় হল যে এ ঘটনার পিছনে অন্য গুরুতর কারণ আছে। তাহলে কি কোনভাবে গঙ্গা-মণিশঙ্কর বা তৃতীয় ব্যক্তিটি জানতে পেরেছে, রাহুল কেন এখানে এসেছে? আশ্চর্য ধুরন্ধর মেয়ে গঙ্গা—তার কথায় বা আচরণে এতটুকু ধরার উপায় নেই কিছু। সাত বছর আগের সেই সরলমনা কিশোরী মেয়েটিকে পাপ ছোঁবার সঙ্গে সঙ্গে কী অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেছে তার মধ্যে!······

ঘুমিয়ে পড়েছিল রাহুল। কী সব আজগুবি স্বপ্ন দেখছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখল, শীলা তার পাশে বসে আছে। সে মুহূর্তে একটা আবেগ এসে গেল হঠাৎ। শরীর বা মনে সেই আবেগটা জোর নাড়া দিল বলেই রাহুল সঙ্গে সঙ্গে তাকে জড়িয়ে ধরল। টেনে বুকের ওপর শুইয়ে দিল। শীলা আস্তে আস্তে বলল, আঃ দরজাটা খোলা আছে।

থাক্। বলে রাহুল তার ঠোঁটে ঠোঁট রাখল।

কিছুক্ষণ আচ্ছন্নের মতো পড়ে রইল দুটিতে। তারপর রাহুল ওর মুখটা তুলে ধরতেই দেখল, শীলা নীরবে কাঁদছে। সে শীলার কাপড়েই শীলার চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে বলল, আমি আছি। কেঁদোনা। কাঁদবে কেন?

শীলা আস্তে আস্তে উঠে বসল। বলল, ছাড়ো। তোমার জন্যে চা নিয়ে আসি।

ভিতরের দিকে দরজায় অবশ্য পর্দা আছে। শীলা পর্দাটার দিকে এতক্ষণে তাকাল। পরমুহূর্তে সে চকিত উঠে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে বলল, কে? বউদি?

রাহুলও উঠে বসেছিল। সে দেখল পর্দার নিচে দুটো পা—খসখসে ফ্যাকাশে পায়ের পাতায় আবছা আলতার ছোপ, সবে সরে যাচ্ছে।

শীলা পর্দা তুলেই পিছিয়ে এল। জিভ কেটে সলজ্জ হাসি মুখে নিয়ে কটাক্ষ করল রাহুলের দিকে।

রাহুল বলল, কে? বউদি তো?

শীলা মাথা দোলাল। চাপা গলায় বলল, না—তোমার ছোটমা! ফেট্, আমার লজ্জা করছে। কী ভাবলেন বলো তো! আর কখনো এঘরে আসব না।

সন্ধ্যার আগে রাহুল বেরুল। খুব সতর্কভাবে বেরুল সে। গত রাতের ঘটনার পর আর তার পক্ষে অসতর্ক থাকা ঠিক নয়। অরুণের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। নয় তো তাকে সঙ্গে যেতে বলত। আসলে সানু চ্যাটারজি তাকে গভীর ভাবে আকর্ষণ করছিল।

হাইওয়েতে পৌঁছে একটা রিকশো করল সে। রিকশোওলার কাছে জানা গেল, সানু থাকে টাউনসিপের শেষ প্রান্তে। তার দাদা নীরেন চ্যাটারজি নামকরা লোক। রাজনীতির পাণ্ডা এ এলাকায়। মস্তো বড়লোক। সানু তার সৎমার ছেলে। কলেজে পাস দিয়েছে রীতিমতো। কিন্তু ছেলেবেলা

থেকে মারামারি খুনোখুনি রপ্ত করেছে হাড়ে।··· রিকশোওলা জানাল।··· তবে লোকটার মন বড় ভালো। গরীবের উপকারে সবসময় তৈরী। ছোটলোক-গরীব গুরবো মানুষের কাছে সানু দেবতাদের মতো।

রিকশোওলা বলল, আপনি নতুন মানুষ বাবু—তাই বলছি। যাচ্ছেন এখন চলুন। আমার আর কী? ভাড়া পাব। তবে এখন হয়তো ওনাকে বাড়িতে নাও পেতে পারেন। মুক্তকেশী হোটেলটা একবার দেখে এলে পারতেন।

রাহুল বলল, সে পরে দেখব'খন। চলো—দেখেই আসি বাড়িটা।

একটা সুদৃশ্য বাগানবাড়ি বলা চলে। বিরাট বাউণ্ডারী। গাছপালা। ফুল ফলের বাগান। পিছনে পুকুর। সামনের দিকে লন আছে। খেলার জায়গা আছে। রীতিমতো একেলে পরিবেশ। দুপাশে দুটো গেট। গেটের মাথায় বুগানভিলিয়ার ঝাঁপি—লাল সাদা ফুলে ঝকমক করছে। একটা জিপ বেরিয়ে গেল—তার মধ্যে সানুকে দেখল না রাহুল। গেটে দারোয়ান আছে। সে বলল, চলিয়ে যান—খবর লিন। সানুবাবুর খবর হামি জানে না।

গাড়ি বারান্দার সামনে বিশাল ড্রয়িংরুম। পর্দাটা ফাঁক হয়ে আছে। উঁকি মারতেই একটা লোক এগিয়ে এসে বলল, বড়বাবু তো এক্ষুনি বেরিয়ে গেলেন। পরে আসবেন।

রাহুল বলল, আমি ছোটবাবুকে চাই।

লোকটা ভ্রূকুঁচকে ওকে দেখল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল, কোত্থেকে আসছেন?

একটু ইতস্তত করে রাহুল বলল, আমি—হৃষিকেশবাবুর ছেলে।

মানে—মুক্তকেশীর মাষ্টারমশাইয়ের ছেলে?

আজ্ঞে।

তাই বলুন। বসুন, বসুন।···বলে সে কয়েক পা এগিয়ে ঘুরল।··অবশ্যি সানুবাবু আছেন কি না জানিনে। আপনার ভাগ্য। উনি কখন বাড়ি আসেন, কখন থাকেন—বলা ভারি কঠিন। দেখছি।

লোকটা হাসতে হাসতে চলে গেল। রাহুল একটা সেকেলে প্রকাণ্ড চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে রইল। বেশ বনেদীয়ানার ছাপ রয়েছে ঘরে। বড় বড় ছবি, মস্তো ভারি পর্দা, মেহগিনিরঙ আসবাবপত্র—সব মিলিয়ে একটা আভিজাত্যের ভাব। এই বাড়ির ছেলে সানু। শীলা তার বউ হবে!

ফিরে এল লোকটা।·· আপনার বরাত ভালো। ছোটবাবু রয়েছেন। আসছেন এক্ষুনি। আপনি বসুন।

ফের সে চলে গেল। একটু পরেই সান্নু এল। মুখটা হাসিতে উজ্জ্বল। বিশাল হাত বাড়িয়ে বলল, হ্যাল্লো।

রাহুল বলল, আপনার নাকি যাবার কথা ছিল সকালে। অরুণদা বলছিল।

সান্নু ওর দু-কাঁধে হাত রেখে বলল, আপনি নিজে চলে এসেছেন—এতে যে কী আনন্দ হচ্ছে বলার নয়! জানেন, আমি কতবার আপনাকে দেখে এসেছি!

রাহুল হেসে বলল, জানি।

আলগোছে রাহুলের ডানহাতটা তুলে ধরে সান্নু বলল, এখনও সারে নি? নন্দটার দিন ঘনিয়ে এসেছে, বুঝলেন? শালা সব তাতেই ছুরি বের করতে শিখেছে। অথচ একটা বেড়ালের জোরও শালার নেই। বসুন—উঁহু,···

সে ভ্রূ কুঁচকে কী ভেবে নিল যেন। তারপর বলল, চলুন—আমার ঘরে গিয়ে বসি। নিরিবিলি না হলে জমবে না। রিয়েলি রাহুলবাবু, সেদিন নিজের ব্যবহারে এত অনুতপ্ত আমি, কী বলব।

রাহুল ওকে অনুসরণ করল। সান্নুকে মুহূর্তে তার এত আপন মনে হয়েছে।

সাত

ঘরটা বাড়ির উত্তর প্রান্তে একতালায়। দরজার বাইরে লম্বাচওড়া ছাদ-বিহীন বারান্দার মতো লাল সিমেন্টের মসৃণ চত্বর। তার শেষে ধাপ নেমে গেছে পুকুরে। পুকুরটা মোটামুটি বড়ো। মাঝখানে একটা বিরাট স্তম্ভ উঠেছে জল ছাড়িয়ে। তার ওপর ফোয়ারা। ধূসর আর কালচে রঙের ছোপধরা প্রকাণ্ড পদ্মফুলের গড়ন সেটা। কেন্দ্রশীর্ষে সাদা পাথরের উলঙ্গ পরী। বোঝা যায় ফোয়ারাটা কবে মরে গেছে। চারপাশে গাছপালা আর জলের মধ্যে সেটা নির্জন সমাধির মতো স্তব্ধ। রোদ সরে গিয়ে বিস্তৃত ছায়া ঢেকে আছে সেখানে। শিরশির করে জল কাঁপছে। একপাল দেশি-বিদেশি নানান চেহারার হাঁস কী জন্যে ঝিমুচ্ছে সিঁড়ির ওপর। সান্নু অনর্গল কথা বলছিল। ময়নাচকের কথা। তাদের পূর্বপুরুষদের কথা। ভবানীবাবুর সঙ্গে পুরুষ-পরম্পরা তাদের শত্রুতার কথা। একসময় সে উঠে বলল, চলুন—বরং বাইরে বসা যাক্। প্লীজ রাহুলবাবু, বসার জায়গা আমরা নিজেরাই নিয়ে যাই। এবাড়ির চাকরবাকর সব শালা মন্ত্রীমহারাজ। ডাকলে সাড়া ছায় না।

দুজনে দুটো হাল্কা চেয়ার নিয়ে বেরোল। ঘরে অবশ্য আসবাবপত্র বলতে ওই ধরনের গোটাকয় চেয়ার, গদীছেঁড়া একটা সোফাসেট—আর একটা সেকেলে খাট। কিছু বাকসের গাদা ছেঁড়া চাদরে ঢাকা আছে কোণের দিকে। পা ছড়িয়ে বসে সান্নু বলল, আমি বাউণ্ডুলে পাপীতাপী লোক—থাকি একলষেঁড়ে হয়ে এদিকটায়। ভিতরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি বড্ড কম। তবে হাঙ্গামা বাধলে তখন সান্নুর ডাক পড়ে। তখন বাড়িতে আমার খাতির যদি ছ্যাখেন মশাই, চক্ষু ছানাবড়া হবে।

রাহুল বলল, আপনার বাবা-মা কদ্দিন আগে মারা গেছেন ?

বাবা ? দাঁড়ান বলছি। সে চোখ বুজে কী হিসেব করে বলল, বছর বাইশ হবে। বুড়ো তো এখানে থাকত না—এখানে রেসের মাঠ কোথায় ? বিলিতি বার আর মেমসায়েব কোথায় ?···সে হেসে উঠল। পরক্ষণে গম্ভীর হয়ে বলল, মা বছর পাঁচেক আগে গেল। যাই বলুন—সতীলক্ষ্মীরা একটানা পতিশোক কদ্দিন বা সইতে পারে !

রাহুল বলল, বাবা-মার ওপর খুব অভিমান আছে আপনার—তাই না সান্নুবাবু ?

কে জানে কী আছে ! সান্নু বিকৃত মুখে বলল।···আসলে আমার চয়েসটাই হয়তো আলাদা। বাবা-মা সম্পর্কে আলাদা চয়েস নিয়ে যে ছেলেরা জন্মায়—তারা হয়তো কষ্ট পায়। যাক্ গে দুনিয়ায় মনের মতো কোনটাই বা আছে ? এই যে আমি—আমি শালাই কি নিজের চয়েস অনুযায়ী হতে পেরেছি বা পারছি ? তবে অন্য সব হয়তো গড়েপিটে মনের মতো করা যায়—বাবা-মাকে তো যায় না। কী বলেন ?

ফের সে হো হো করে হেসে উঠল। রাহুল বলল, বিয়ে করেন নি কি সেইজন্যেই ?

সান্নু তার দিকে তাকাল।

রাহুল একটু ইতস্তত করে বলল, একটা গুজব শুনছিলুম। বলব ?

সান্নু শিস দিয়ে দুলতে দুলতে বলল, আলবৎ বলবেন।

অরুণদার বোনকে আপনি বিয়ে করছেন ?

সান্নু কিছুক্ষণ চোখবুজে দুলে চলল। তারপর তাকাল। চোখে কৌতুক জলজ্বল করছে তার। বলল, মেয়েটিকে তো আপনি দেখেছেন। কী মনে হয়েছে ?

কী মনে হবে ?

অরুণ শালাকে কিচ্ছু বিশ্বাস নেই। ওর ইট খোলার মজুরনীগুলোর সঙ্গে খুব দিল-লেনা-দেনা আছে। লম্পটের হদ্দ ব্যাটা। এখন কথা হচ্ছে—তার নিজের বোন নয়। এমনকি স্বজাতও নয়। ও শূদ্রটুদ্র বটে—মেয়েটা বামুন। আমার খালি মনে হয়, বেচারা শালাকে শালা গোপনে নষ্ট-টষ্ট করে বসেনি তো?

রাহুল নিষ্পলক তাকালো ওর দিকে। তারপর বলল, অরুণদা লম্পট তা সত্যি। কিন্তু শীলা শিক্ষিতা মেয়ে। পারসোনালিটি আছে। সেটা ভুলে যাওয়া কি ঠিক হবে?

রাইট, রাইট!…সানু তার লোমশ হাতটা চেয়ারের হাতলে আঘাত করল। ..শীলা খুব সহজ মেয়ে নয়। র‍্যাদার সফিসটিকেটেড মনে হয়। আপনি কী বলেন?

রাহুল পুকুরের দিকে ঘুরে বলল, খুব বেশি মিশিনি। তাই জানিনে।

সানু ঝুঁকে এল তার দিকে।..বিয়ের কথা আমি কিন্তু তুলিনি—তা জানেন? অরুণই তুলেছে। সেজন্যেই তো আমার সন্দেহ। আপনাকে বলতে বাধা নেই। অরুণকে আমি বলেছি—ঠিক আছে। বিয়ে আমি করছি। কিন্তু তার আগে যেকোন কায়দায় শীলার একটা হেলথ্ সার্টিফিকেট চাই। ডাক্তার আমি ঠিক করে দেব। অরুণ রাজী হয়েছে। মশাই, আমি আজকাল-কার মেয়েদের এতটুকু বিশ্বাস করিনে। তার ওপর আজকাল কত সব কনট্রাসেপটিভ বেরিয়েছে।

সানুর একটা উজ্জ্বল সুন্দর চেহারা মনে তৈরী হয়ে গিয়েছিল—এতক্ষণে হঠাৎ সেটা মুহূর্তে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল। বিকৃত কিম্ভূত একটা চেহারা পেল সানু চ্যাটারজি। মনটা তেঁতো হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। রাহুলের ইচ্ছে হল—এক্ষুনি ওর মুখে একদলা থুথু ফেলে চলে আসে। কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিল।

সানু চাপা গলায় সকৌতুকে ফের বলল, ডাক্তার যদি সার্টিফিকেট ছায় যে শী ইজ ষ্টিল আনটাচ্‌ড্ বাই অপজিট সেক্স—এখনও তার কুমারীত্ব অটুট আছে, আমি তক্ষুনি টোপর পরব। এটা মশাই, সরকারের আইন করে বিয়ের সর্ত করা উচিত। বলবেন, মেয়েদের বেলা তো ওটা না হয় হল—পুরুষের বেলা?

রাহুল ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে বলল, আমি কিছু বলছিনে।

সানু জোর হেসে বলল, দেখছেন কাণ্ড? এখনও চা এল না। বসুন—একমিনিট আসছি।

সে চলে গেলে রাহুল একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। অরুণ ওই ডাক্তারি পরীক্ষার কথাটা বলেনি। চেপে গেছে। শীলা কি জানে? অবশ্যই জানেনা। তার অজানতে কোন ছলে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। কী জঘন্য ব্যাপার! তবে একটা কথা বোঝা যাচ্ছে যে অরুণই এ বিয়েতে উৎসাহী হয়েছিল। আর সান্নুরও শীলাকে খুব মনে ধরে গেছে।...

একটু পরে ফিরে এল সে। তার সঙ্গে ট্রে হাতে একটা লোকও এল। কিছু বিস্কুট আর চা মাত্র। সান্নু কোলের ওপর ট্রে রেখে নিজেই চা বানাল।

চা খেতে খেতে সান্নু বলল, বাই দা বাই—কাল রাতের ব্যাপার। যে জন্যে আজ সকালে আপনার কাছে যাবো ভাবছিলুম। নদীর ধারে কারা নাকি আপনাকে গলা কাটতে চাচ্ছিল। সত্যি?

রাহুল মাথাটা দোলাল মাত্র। একটু শুকনো হাসিও দেখা দিল ঠোঁটে।

সান্নু বলল, মণিশঙ্কর বলছিল। সকালে এসেছিল সে। তার সন্দেহ—এ কাজ নাকি নন্দর। নন্দ নাকি সেদিনের রাগ ভুলতে পারছে না।...যাই হোক, আমি উল্টোকথা বললুম ওকে। বললুম—শংকরদা, এ তোমারই কাজ নয় তো? বেচারা বিদেশি ছেলে—নতুন এসেছে এখানে।...

বাধা দিয়ে রাহুল প্রশ্ন করল, শংকরবাবুর কী স্বার্থ আছে আমাকে খুন করে?

সান্নু ভ্রূ কুঁচকে মৃদু হেসে এবং অভ্যাসমত দুলতে দুলতে বলল, আছে নিশ্চয়। তার আগে একটা কথা জিগ্যেস করি। স্পষ্ট জবাব দেবেন কিন্তু।

দেব। বলুন।

কাল রাত্রে মণিশঙ্করের ওখানে এমন কিছু কি নজরে পড়েছিল আপনার—হুইচ ইজ কোয়াইট স্ট্রেঞ্জ?

না তো।

কিচ্ছু দ্যাখেন নি—যাতে ওকে সন্দেহ করা যায়?

কিসের সন্দেহ?

সান্নু চাপা গলায় বলল, হি ইজ এ গ্যাংষ্টার। এলাকার যত রাহাজানি, ডাকাতি আর খুনোখুনি হয়—তার লিডার সে। আমার মুসকিল হচ্ছে যে মণিশঙ্কর আবার দাদার বিশেষ বন্ধু নয়—আরও বেশি কিছু।

রাহুল বলল, শুনেছি—আপনি ওকে ব্ল্যাকমেইল করেন।

সান্নু বলল, হুঁঃ! করি। আরে মশাই, সে কি লুকিয়ে করি নাকি?

অরুণদাকেও করেন শুনেছি।

ও তো একটা বকধার্মিক। শূওরের ধাড়ী। শালার ইটখোলাটায় যদি পুলিশ হামলা করে, ঢিঢি পড়ে যাবে। ওদিকে একটা বাঁশবন আছে দেখেছেন? সেখানে রিজেকটেড ইটের পাহাড় জমে রয়েছে। সে-ইট অরুণ বেচে না। অথচ রোডস্ ডিপার্ট রিজেক্ট করলেও ইটগুলো মশাই প্রথম শ্রেণীর ইট। ক'বছর ধরে পড়ে আছে সেগুলো। ডবল দর বললেও কাকেও বেচতে চায় না। কাশব্যানা ঝোপঝাড় গজিয়েছে ওখানে। সাপ-খোপের আড্ডাও হয়েছে। একদিন আমার খুব সন্দেহ হল। ডিটেলস বলব না—কোন একটা ব্যাপার দেখেছিলুম রাত্রিবেলা—তাতেই সন্দেহ হল। গিয়ে ওকে বললুম, আমার হাজার বিশেক ইট চাই। বাড়ি করব নিজের। দাদার সঙ্গে পোষাচ্ছে না। শুনে অরুণ হন্তদন্ত চিমনিভাটার দিকে এগোল। আলবাৎ দেব। এ ক্লাস ইট টাটকা পুড়িয়ে দেব—স্পেশাল তৈরী। আমি বললুম—উঁহু, ওই বাঁশবনের ঝড়জল খাওয়া ইটের কাছে আর কোনটা লাগে নাকি? চলো—ওখানে গিয়ে দেখি। অরুণের মুখ গেল শুকিয়ে। সে নানা বাহানা ছলছুতো সুরু করল। আমিও নাছোড়বান্দা। শালা ঘুঘু দেখেছ—ফাঁদ দ্যাখোনি। ও সাপখোপের ভয় আমায় দেখিও না। আমি বেদের রাজা। ব্যস্। একজায়গায় নতুন ষ্ট্যাক আর দোমড়ানো ঝোপঝাড় দেখে হাত লাগালুম। অরুণ পরিত্রাহি চ্যাঁচায়। যেন শালার গলায় ছুরি চালাচ্ছি। উরে ব্বাস! বেরিয়ে পড়ল গুঁড়োদুধের টব! বেবিফুড।··উরে হালুয়া! অরুণ পায়ে ধরল। কান্নাকাটি —সাধাসাধি!···

দম নিয়ে সানু বলল, আমি যদি অন্যলোক হতুম রাহুলবাবু, তাহলে সেদিনই আমার মুণ্ডুটা সাবড়ে ফেলা হত। সেটা খুব সহজ কাজ নয়। আমার ষ্টেনগান আছে—দুদশজন চেলা আছে। অবশ্যি তারা কেউ নন্দর মতো গুণ্ডা-বদমাস নয়। ভদ্রলোকের বাড়ির শিক্ষিত ছেলে সব। হাতে আর্মস পেলে মানুষ বদলে যায় মশাই। না—ডিটেলস বলব না। শুধু জানবেন যে আমি পলিটিকস করি না—বিশ্বাসও নেই ওতে। আমার দলের ছেলেদের অবশ্য সেটা আছে। ওদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক শুধু এটুকু যে ওরা ডাকলে আমি ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াই আর আমি ডাকলে ওরা আমার পিছনে এসে জোটে। এইমাত্র।

রাহুল একটু অবাক হয়ে বলল, আপনার চেলা যাদের বললেন—তারা নিশ্চয় আপনার দাদার পার্টির লোক?

সানু রহস্যময় হাসল। বলল, হ্যাঃ। তবে—ওই যে বললুম, দাদা আমাকে

ডাকলে আমি যাব না। নেভার। তখন দাদা চালাকি করে। হ্যাঙ্গামার দরকার হলে ওদের ডাকে—ওরা ডাকে আমাকে। ব্যস, দাদার উদ্দেশ্য সিদ্ধ। কিন্তু আমি তো জানি—কার খাতিরে যাচ্ছি।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে ততক্ষণে। আকাশে নক্ষত্র ফুটেছে। বাড়ির এদিকে কোন আলো নেই। হয়তো আছে—জ্বলেনি তখনও। হাঁসগুলো কখন উঠে গেছে সিঁড়ি থেকে। কোথাও কোন শব্দ নেই। রাহুল বলল, উঠি তাহলে।

সান্টু বলল, একটু বসুন। সেদিন আপনার সাহস আর শক্তির পরিচয় পেয়ে খুসি হয়েছিলুম খুব। কারণ আমি নিরাহ টাইপের ভীতু বোকাসোকা ছেলেদের একটুও পছন্দ করেনি। তাছাড়া আপনার হাতের মার দেখে তক্ষুনি চিনেছিলুম, আপনি ওস্তাদ ছেলে। আপনার প্রেমে পড়ে গেছি মশাই।·· সান্টু হো হো করে হাসল।···যাক্‌গে—এখন কথা হচ্ছে, শংকরই সম্ভবত আপনাকে সাবড়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু কেন?

রাহুল বলল, তাহলে তিনিই বা কেন শেষমুহূর্তে বাঁচালেন? পৌঁছে দিলেন বাবার ওখানে?

সান্টু বলল, শালা ঘাগী মাল। জানে মারতে চায়নি আসলে—বেশ বোঝা যাচ্ছে, আপনাকে জোর ভয় পাইয়ে দিতে চেয়েছিল। সবটা সাজানো ব্যাপার। ওর উদ্দেশ্য ছিল—শীগগির আপনি ময়নাচক থেকে পালিয়ে যাবেন!

কিন্তু কেন?

প্রশ্নতো আমারও। কেন? সেজন্যেই বলছিলুম, কাল কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার দেখেছিলেন নাকি ওখানে?

কিছু দেখিনি তো।

সান্টু ফিসফিস করে বলল, কিছু মনে করবেন না প্লীজ। আপনার ছোটমার সঙ্গে লোকটার একটা ইলিসিট কানেকসান আছে। অনেকেই জানে ব্যাপারটা। হয়তো মাষ্টার মশাইও জানেন। কিন্তু বেচারা তো শয্যাশায়ী রোগা মানুষ। রাহুলবাবু, আপনার ছোটমার সঙ্গে কি মণিশঙ্করকে তেমন কোন অবস্থায় দেখেছিলেন?

রাহুল বলল, না। আমি তো মোটে দুবার গেছি ওখানে। সেও সকালবেলা।

সান্টু একটু ভেবে বলল, আমি আপনার হিতৈষী। যাকে আমি পছন্দ করি, তার জন্যে জান দিতে পারি। একটা কথা বলব—রাখবেন?

বলুন।

আপনার ছোটমার ওখানে কখনো যাবেন না। আর যদি পারেন, বাবাকে নিয়ে শীগ্‌গির চলে যান এখান থেকে। বহরমপুরে বাড়ি আছে তো আপনাদের ?

নাঃ। আমি বহরমপুরে থাকতুম। বাড়ি তো গ্রামের দিকে। ঘরটর পড়ে গেছে। না বানালে নিজে যাই কী করে ? আর সেখানে গিয়ে করবই বা কী ?···রাহুল শুকনো হাসল।

সান্থু বলল, তাহলে এক কাজ করুন। এখানেই জায়গা দিচ্ছি—দাম লাগবে না। বাড়ির মালমশলা যা লাগবে—সব অরুণশালা দেবে। ওর বাপ দেবে।

দেখি।·· বলে রাহুল উঠল।

সান্থুও উঠে দাঁড়াল।··টর্চ আনেন নি ? উঁহু—আনলেও আপনাকে একা যেতে দেওয়া ঠিক নয়! চলুন, আপনাকে রেখে আসি। সাইকেল আছে—রডে বসে যেতে পারবেন তো ?

রাহুল বলল, থাক্‌। আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আমি একা যেতে পারব।

পাগল!·· সান্থু বলল।·· আপনি মণিশঙ্করকে চেনেন না। ওর ভিতরের চেহারা দেখলে ভয় পাবেন রাহুলবাবু। আমি ভিতরে-বাইরে এক—ও শালা উল্টো। বাপ্‌স্‌ আমাকেই ছমছমানি লাগে! চলুন। রাত্তিরে এখানেই থাকতে-খেতে বলতুম—ফ্রাঙ্ক্‌লি স্পিকিং ব্রাদার—এ বাড়িতে মানুষ নেই। ভূতের রাজত্ব। বউদিটা আছে—তার তো দেমাকে পা পড়ে না। রোস, দেখাচ্ছি মজা। বিয়েটা হয়ে যাক্‌। তারপর পাইপয়সার বখরা ছাড়ব না। আলাদা বাড়ি তো বানাবই। অরুণশালা আমার বাড়ি করে দেবে। বোন দেবে—যৌতুক দিতে হবে না ?·· সে হাসতে হাসতে পা বাড়াল।

রাহুল বলল, চলুন। কিন্তু আমি নিরস্ত্র নই সান্থুবাবু।

সান্থু পিছন ফিরে চাপা গলায় বলল, রিয়েলি ? কী মাল ? 'রেঞ্জ্‌', না 'টিপস্‌' ?

অটোমেটিক।

কই দেখি ? বলে সে দ্রুত ঘরে সুইচ টিপে আলো জ্বালাল।

রাহুল রিভলবারটা বের করে ওর হাতে দিল। কিছুক্ষণ উল্টেপাল্টে দেখার পর সান্থু বলল, চীনেটীনে মনে হল! কোথায় পেলেন ? আপনি মশাই রাজা তাহলে! দাঁড়ান আমার যন্ত্রপাতি দ্যাখাচ্ছি।

রাহুল অবাক হয়ে গেল। তুটো অটোমেটিক রিভলবার আর একটা ষ্টেনগানের মালিক সান্থ চ্যাটারজি। নিঃশব্দ হাসিতে তার মুখটা ফেটে পড়ছে। একটু অস্বস্তি এল রাহুলের। কেন কে জানে—তার গা ছমছম করে উঠল। সে বলল, বেরিয়ে পড়া যাক্।

সাইকেলে এগোচ্ছিল তুজনে। যেতে যেতে হঠাৎ রাহুল বলল, নন্দর সঙ্গে অরুণের বিবাদ কিসের? আমি অবশ্য অরুণদার কাছে একরকম শুনেছি।

সান্থ বলল, অরুণ আর লোক পায়নি—রেখেছিল নন্দকে। কী না ক্যাসিয়ার বাবু! নন্দ মোটা টাকা মেরে সরে পড়েছিল। চাইতে গেলেই উল্টে পিট্টি লাগায়। ··হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে সান্থ বলল, এক কাজ করবেন? চলুন না মুক্তকেশীতে যাই।

রাহুল বলল, না না। কেন?

সান্থ বলল, উঁহু—চলুন। আপনার ছোটমাকে দেখিয়ে আসি যে আমি এখন আপনার জানের দোস্ত। এটা আপনার সেফটির জন্যে দরকার। ওরা টের পাক্। তা না হলে এখানে স্বচ্ছন্দে বেড়াবেন কেমন করে? তাছাড়া হয়তো মণিশঙ্করকেও পেয়ে যেতে পারি ওখানে। তাহলে তো খাসা হবে। তুজনেই দেখুক, সান্থ চ্যাটারজির সাইকেল থেকে রাহুলবাবু নামছেন! হ্যাঁ?

প্রস্তাবটা সঙ্গত মনে হল রাহুলের। সে কোন কথা বলল না আর। হাই-ওয়ের তুপাশে সারবদ্ধ দোকানপাট। আলো হল্লা জেল্লা আছে। মাঝে মাঝে বাস লরী রিকশা টেম্পো ভ্যান সাইকেল আনাগোনা করছে। তবে দিনের চেয়ে গতিবিধিটা কম। অল্পস্বল্প ভিড় আছে। বেশ গরম পড়েছে আজ। একটুও হাওয়া দিচ্ছে না। তাই কারো হয়তো ঘরের দিকে পা বাড়াতে ইচ্ছে করে না। মুক্তকেশীর সামনে রাস্তার তুধারে অনেক ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে যথারীতি। ড্রাইভাররা খেয়ে বিশ্রাম করছে—কেউ খাটিয়ায়, কেউ ঘাসের ওপর গড়াচ্ছে। রাহুল লক্ষ্য করল একদল পাঞ্জাবী ড্রাইভার গোল হয়ে বসে মদ খাচ্ছে আর হইহুল্লা করছে।

একেবারে হোটেলের বারান্দায় পা রেখে সাইকেল থামাল সান্থ। রাহুল নামবার আগেই সে ডাকল, হ্যাল্লো ম্যাডাম! হেয়ার ইজ সান্থ চ্যাটারজি।

থামের ওদিক থেকে গঙ্গা বেরিয়ে এল। থমকে দাঁড়াল। মুখটা থমথমে। পরমুহূর্তে হাসিতে ভরে উঠল।···সান্থদা! এস। ওকে কোথায় পেলে?

সাইকেলটা সশব্দে উঁচু বারান্দায় ঠেস দিয়ে রেখে সান্নু বলল, হুঁ—তোমাদের হারানিধি খুঁজে আনলুম। কই, কী খেতে দেবে দাও।

আহা, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবার খাওয়া যায় নাকি? ভিতরে এসে বসবে তো?···গঙ্গা মিষ্টি হেসে হাতের রুমালে ঠোঁটটা একবার মুছে নিল।

সান্নু উঁকি মেরে বলল, আসামী যে অসংখ্য আজ। মেনু কী?

গঙ্গা বলল, মেনুর খবর তো সবসময় জিজ্ঞেস করো—খেতে বললে তখন পেট ভার। এস, বসোদিকি আগে।

একটা তক্তাপোষে এক বুড়ো ভদ্রলোক বসে রয়েছেন। সামনে বাকসো। কিছু খাতাপত্র। বোঝা যায়, গঙ্গার লোক। ঘেঁাতন নামে ছোকরাটি রাহুলকে দেখে কী কারণে একবার দাঁত বের করে হেসে গেল। খাওয়ার ব্যবস্থা মেঝেয় পিঁড়ি আর আসন পেতে। গা ঘিন ঘিন করছিল রাহুলের। সান্নু বলল, নাঃ, এখানে বসব না। ভিতরে মাষ্টারমশাইকে দেখে আসি। এস রাহুল।

সান্নু তাকে তুমি বলছে, সেজন্যে নয়—রাহুল অবাক হল গঙ্গার কথায়। গঙ্গা গম্ভীর মুখে বলল, সান্নুদা? ওঁর অবস্থা আজ খারাপের দিকে। এখুনি ডাক্তারবাবু এসেছিলেন। বলে গেলেন—আজ রাতটা সাবধানে থাকতে। বলা যায় না! কিন্তু আমি ওদিক দেখব—না এখানটা সামলাবো। মাসকাবারের খাইয়ে আছে সব।··

গঙ্গা একটু থেমে মুখ নামিয়ে বলল, বিকেলে ছেলেকে দেখতে চাচ্ছিলেন। তাই ওর খোঁজে অরুণের ওখানে গেলুম। দেখা হল না।

রাহুল সান্নুর হাত ধরে টানল। চলুন, ভেতরে যাই আমরা।

গঙ্গা বলল, তাই যাও তোমরা। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

একা পড়ে আছেন বাবা! রাহুল ক্ষুব্ধভাবে বারান্দা থেকে সরু করিডোরে ঢুকল। সান্নু তাকে অনুসরণ করল। হৃষিকেশের ঘরের ভিতর আলো জ্বলছে। দরজা ভেজানো আছে। ভিতরের বারান্দার বাঁদিকে গঙ্গার ঘরের দরজা সেটাও ভেজানো আছে।

দরজা খুলে রাহুল ছেলেবেলার গলায় ডাকল, বাবা!

হৃষিকেশের কোন সাড়া নেই। চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। বুকের ওপর দুটো হাত। একটু ঝুঁকে পড়ল রাহুল। দেখল হৃষিকেশের একটা চোখের কোণায় জলের ফোঁটা। নাকে জমাট কয়েকফোঁটা রক্ত। ঠোঁটের দুদিকে চাপ চাপ ফেনা। সে দ্বিতীয়বার একটু জোর চিৎকার করল, বাবা!

হৃষিকেশের শ্বাসপ্রশ্বাস স্তব্ধ। গা বরফের মতো ঠাণ্ডা। রাহুল আস্তে

আস্তে হাঁটু তুমড়ে বসল। তারপর বাবার বুকে মাথা রেখে সশব্দে কেঁদে উঠল। সানু বিকৃত মুখে পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। হতবাক। নিস্পন্দ। এবার সে এগোল। হৃষিকেশের হাতের মুঠোয় ও পুরিয়াটা কিসের?

কতক্ষণ পরে গঙ্গা এসে কী বলতে গিয়ে সেও থেমে গেল। স্থির দাঁড়াল।

হৃষিকেশ তাঁর ষাটবছরের ভালমন্দভরা জীবনটা নিয়ে কখন চুপিচুপি পালিয়ে গেছেন চিরকালের মতো। মনে হচ্ছিল আর তাঁর কাছে কেউ কৈফিয়ৎ নিতে পারবে না এবং খুব সহজে তাঁকে ক্ষমা করা যাবে।

কিন্তু আরও কিছু ছিল।

আবিষ্কার করতে সামান্য সময় লাগল সেই ভয়ঙ্কর বীভৎস দৃশ্যটাকে। গঙ্গার ঘরে ধবধবে পরিপাটি বিছানায় আরেকটি নিষ্ঠুর মৃত্যুর স্বাক্ষর। রণ্টু!

হৃষিকেশ তাকেও সঙ্গে নিয়ে গেছেন? এবং তখন মনে হল, হৃষিকেশ পালিয়ে গিয়েও নিস্তার পাবেন না। একটা কৈফিয়ৎ তাঁর পক্ষে জরুরী থেকে যাবে। কোনমতে আর তাঁকে ক্ষমা করা যাবে না।

গঙ্গার ভয়ঙ্কর চিৎকারে ময়নাচকের রাতের আকাশ আলোড়িত হচ্ছিল। সে চিৎকারকে শোকের কান্না বললে হয়তো ভুল করা হবে। সে একটা শব্দময়ী মারাত্মক জিঘাংসা।

আট

বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেল তারপর।

রাহুল অরুণের বাড়িতে থেকেছে যথারীতি। কিন্তু কোনরকম শাস্ত্রীয় বিধির ধার ধারে নি। অরুণ, তার বউ, কিংবা সানুর অনুযোগেও না। শ্রাদ্ধ-শান্তির ব্যাপার ছিল। সেটাও এড়িয়ে থাকল সে। একটা ঘোরতর নির্লিপ্ততা তাকে গ্রাস করেছিল। বারবার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছিল একটা বিশাল শূন্যতা। সে শুধু ভাবছিল, কী হবে! ময়নাচকের দুষ্টচক্র খতম করে তার লাভ কতটুকু? তারপরও আরেক দুষ্টচক্র গজাবে না তার কোন গ্যারাণ্টি আছে? আর এ পৃথিবীতে যুগেযুগে এইসব বিষফোঁড়া গজায়। গজাবে চিরকাল। সে কি ত্রাণকর্তা অবতার? না রাজেনবাবু, পাঁচ হাজার টাকা পাওয়াটাও খুব সুখের কিছু নয়। টাকা নানাভাবে পাওয়া যায়। আজ আমার

কাছে টাকাও তার দাম হারিয়ে ফেলেছে। মানুষ মারার সুখ আর সুখ নয়। আমাকে ক্ষমা করুন রাজেনবাবু। এখানে পা দেওয়ার পর সব সংকল্প অভিসন্ধি বাসনাকামনাগুলো যেন অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে এখন এমন যায়গায় পৌছে গেছি, সেখানে শুধু চারদিকে থরে থরে সাজানো উদ্দেশ্য-হীনতা। খুব শীগ্‌গির এখান থেকে চলে যেতে হবে আমাকে। টের পাচ্ছি, আমি আর কারো কাজে লাগব না। এমন কি নিজের কাজেও না। এ অবস্থা অসহ্য। হাঁফিয়ে উঠেছি। আমি পালিয়ে বাঁচতে চাই।···

অথচ চলে যাবার কথা ভাবলেই মনে হচ্ছে, কী যেন বাকি থেকে গেল। রন্ধ্রহীন শূন্যতার দেয়াল জোরে সরাতে পারলে সেটা পরিষ্কার দেখা যেত। যাচ্ছে না। শুধু মনে হচ্ছে, বাবার আত্মহত্যার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়া উচিত ছিল ময়নাচকে, অথচ ফুরিয়ে গেল না হয়তো। অদ্ভুত এ এক অবস্থা! একটা গুরুতর অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল রাহুলের মনে।

অবশেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে এল সে। এক সকালে ঘুম থেকে উঠে ঠিক করে ফেলল, আজই চলে যাবে। বহরমপুর যাবে না। অন্য কোথাও। বরং কলকাতা—অথবা আরো দূরে। বোম্বে। হ্যাঁ, বোম্বেতে তার এক পরিচিত ভদ্রলোক থাকেন। একবার কথায়-কথায় তিনি তাকে বোম্বে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কী যেন কারবার আছে জিতেনবাবুর—জিতেন বোস নাম ওঁর। একজন কর্মঠ লোক দরকার ছিল। উত্তেজিতভাবে সে ব্যাগ থেকে নিষ্ফল নোটবুকটা বের করল। কিছু ঠিকানা লেখা আছে তাতে। জিতেনবাবুর ঠিকানাটা কি লিখে রাখেনি? কোথাও খুঁজে পেল না নামটা। বেরঙা পাতা-গুলো পুরনো কিছু হরফসমেত ব্যঙ্গ করল তাকে। তবু সে শেষ পাতা অব্দি উল্টে দেখতে গিয়ে একটা ভাঁজকরা ছোট্ট চিঠি খুঁজে পেল। বাবার শেষ চিঠিটা! অন্যগুলোর মতো এটাকেও ছিঁড়ে ফেলেনি দেখে তার অবাক লাগল। কেন রেখে দিয়েছিল? মনে পড়ল না তার। চিঠিটা খুলে পড়ল।···রাহুল, সম্প্রতি জনৈক পরিচিত ব্যক্তির মারফত তোমার সবিশেষ কীর্তিকলাপ জানিতে পারিলাম। আর তোমার সহিত কোন সম্পর্ক রক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব বোধ হইতেছে। জানিলাম, আমার রাহুল নামে কোন সন্তান নাই। ···তবে শেষ সুযোগ হইতে তোমাকে বঞ্চিত করিতে চাহি না। এই চিঠি পাইবার পক্ষকালের মধ্যে তুমি যদি ময়নাচকে আমার নিকট চলিয়া এস—তোমাকে ক্ষমা করিতে পারি।···

আসেনি রাহুল। এলে কী ঘটত? সে একটু ভেবে দেখল। হয়তো

এসে পড়লে বড়জোর গঙ্গার সঙ্গে বাবার বিয়েটা হত না। তার নিজের কি পরিবর্তন ঘটত? মনে হয় না। কারণ, অন্ধকারের আস্বাদ যে পেয়েছে, সে সারাজীবন অন্ধকার চাইবে এবং ময়নাচকে প্রচুর অন্ধকার।···

একটু হাসল সে। এখন বাবার প্রসঙ্গ অর্থহীন। অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু কী দুর্বুদ্ধি! হিতেন বোসের ঠিকানাটা কেন লিখে নেয়নি? খুব আফশোস হচ্ছে। যাক্ গে, কলকাতা যাওয়া যায়। চেনা জানা লোকের অভাব নেই। কার কাছে যাবে, ঠিক করার জন্যে নোটবইতে চোখ রাখল সে।

সেই সময় শীলা এল। নোট বুকটার দিকে ঝুঁকে বলল, হিসেবের খাতা নাকি?

রাহুল অস্ফুট হেসে বলল, কতকটা। শীলা, আজ আমি চলে যাচ্ছি।

শীলা তার পাশে বসে পড়ল। আমল দিল না কথাটা। বলল, তোমার হাতটা এখনও সারল না? ব্যাণ্ডেজ খুলে দেখছ না কেন?

রাহুল নোটবইটা রেখে ডানহাতটা তুলে বলল, ঠিক মনে পড়িয়ে দিয়েছ তো। ভুলেই গিয়েছিলুম হাতের কথা। তাছাড়া, আর হাতের ব্যবহার হচ্ছে না কি না—তাই মনে থাকে না।

শীলা বলল, থামো। আমি খুলে দিচ্ছি। ইস্, কী বাঁধন বেঁধেছ!

সে সযত্নে খুলে ফেলল। ঘা প্রায় শুকিয়ে গেছে। রাহুল ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট শিশি বের করল। বলল, দেখছ কাণ্ড? 'নেবাসালফের' শিশিটা রয়েছে আস্ত। এ্যাদ্দিন রোজ লাগালে মিরাকল্ ঘটে যেত। শীলা, পাওডার ছড়াও এক্ষুনি! সব ভুলভাল হয়ে গেছে।

শীলা শিশি খুলে পাওডার ছড়িয়ে দিতে দিতে বলল, চলে যাবে না কী বলছিলে?

হুঁ। এক্ষুনি বেরোব।

কোথায়?

সে শুনে কী হবে! আমি আর থাকব না এখানে।

তার মানে?

আর কদ্দিন তোমাদের কষ্ট দেব, বলো!

শীলা একটু চুপ করে থেকে শান্তভাবে বলল, আমি কী বলব! তোমার ইচ্ছে।

শীলা!

উঁ?

তোমার বিয়েটা অব্দি থেকে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ভালো লাগছে না।

শীলা তাকাল নিষ্পলক। কোন কথা বলল না।

রাহুল ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, কিছু ব্যাপার আছে—তোমাকে না জানিয়ে পারছিনে শীলা। বেশ মজার ব্যাপার—হাস্যকর। সেজন্যেই জানাতে চাই।

শীলা নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

রাহুল চাপা স্বরে—কিছু চপলতাও ছিল, বলল, সানুবাবুর একটা অদ্ভুত বাতিক আছে। সে একালের মেয়েদের বিশ্বাস করে না। সোজা কথায়—তার ধারণা, কনট্রাসেপটিভের যখন এত ছড়াছড়ি, কুমারীত্ব ব্যাপারটাও নাকি দুর্লভ হয়ে উঠেছে। অতএব তার ইচ্ছে—অরুণবাবুর বোনের একটা ডাক্তারী সার্টি-ফিকেট চাই আগে। তারপর বিয়ের কথা। এদিকে অরুণদা···

শীলা ভ্রূ কুচকে বিকৃত মুখে বলে উঠল, ডাক্তারি সার্টিফিকেট ? তার মানে ?

রাহুল সকৌতুকে বলল, বুঝতে পারছ না ? সে তোমার নিষ্পাপ কুমারীত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে চায়।

শীলার মুখটা লাল হয়ে গেছে। সে সব্যঙ্গ বলল, নিষ্পাপ কুমারীত্ব ! কিন্তু ডাক্তারবাবুরা কি মনেরও সার্টিফিকেট দিতে পারেন নাকি ? মনে মনে যদি আমি নিষ্পাপ না থাকি ?

রাহুল সামান্য আকর্ষণ করে ওর গালের কাছে মুখ রেখে বলল, জানি বাবা জানি—তুমি আমার সঙ্গে মনে মনে পাপ করেছ। কিন্তু মনটনের ধার সানুবাবু ধারে না। সে বউ বলতে যদি বউর বডিটাই বোঝে, তাকে দোষ দেওয়া যায় না। সবাই তো মেয়েদের বডিটডি পাবে বলেই বিয়ে করে। আর সবাই চায়, বউর বডিটা প্রথম উপভোগ করবে সে নিজে। এর নাম কিনা পুরুষত্ব।

শীলা সরল না। বলল, ও ! তাই বুঝি কিছুদিন থেকে দাদা প্রায়ই বলে —তুই রোগা হয়ে যাচ্ছিস রে। চল্, একদিন বড় ডাক্তার-টাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। হ্যাঁ—কাল রাতেও তো বলছিল দাদা ! বউদিও খুব বলল।

তুমি রাজী তো ?

উঁ ?

ডাক্তারী পরীক্ষায় ?

শীলা ঘুরে বসল। ওর চোখদুটো জ্বলতে থাকল। নাসারন্ধ্র কাঁপছিল। সে রাহুলের চোখের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, তুমি এর পরও বলছ আমি কচি খুকির মতো সোজা ডাক্তারের টেবিলে শুয়ে পড়ব ?

না বললে নিশ্চয় পড়তে !···রাহুল হেসে উঠল।

পড়তুম। না জেনে বিষ খাওয়ার ওপর কারো হাত থাকে না।··শীলাকে অস্থির দেখাল। তার কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল।···ছোটলোক ! ইতর ! চামার !

কিন্তু সানুবাবু লোকহিসেবে বেশ ভালো। পয়সাকড়ি আছে।··রাহুল আরও কি বলতে যাচ্ছিল, শীলা তার বুকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ফুলেফুলে কাঁপতে থাকল সে। রাহুল বলল, আঃ শীলা, ছাড়ো। কাঁদে না ! কে এসে পড়বে এক্ষুনি—সেদিনের মতো। এই শীলা ! কথা শোন। বিয়ে তো তোমাকে করতেই হবে—যেখানে হোক। এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। তাছাড়া অরুণদার জন্যে তোমার স্যাক্রিফাইস করাটাও তো উচিত। সে তোমাদের কত করেছে-টরেছে। এ একটা মামুলী ব্যাপার মাত্র। শীলা !

শীলা কান্নাজড়ানো গলায় বলল, তোমার লজ্জা করছে না বলতে ? গলা কাঁপছে না ? বেশ—তবে আমাকে তোমার পিস্তলটা দিয়ে যাও।···বলে সে সোজা হল।·· মানুষ মারা শেখাব বলেছিলে, দরকার নেই। আমি নিজে পারব।

রাহুল টের পেল তার মধ্যে কী একটা শক্তি জেগে উঠেছে আস্তে আস্তে। তার রক্ত চঞ্চল হচ্ছে ক্রমশ। সে শীলার চোখেচোখে তাকিয়ে বলল, সানুর হাতে মার খেয়েছিলুম। কিন্তু পাল্টা মার দিতে আজও পারিনি। উৎসাহ পাচ্ছিলুম না।·· অথচ একটা কিছু করা দরকার। সত্যি শীলা, হার স্বীকার করে বেঁচে থাকাটা আমার স্বভাবের বাইরে। কিন্তু কী করব ? আমার আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না আর। শীলা, ইচ্ছে করছে যাবার আগে সানুকে হারিয়ে দিয়ে যাই—অন্তত একটা জায়গায়। সে হয়তো মোক্ষম মার হবে ওর পক্ষে। কিন্তু···

শীলা দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরল উদ্‌ভ্রান্তের মতো। দুচোখে কিসের আগুন ধকধক করে উঠল। চুলগুলো বিস্রস্ত হল। সে থরথর করে কাঁপছিল। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, কেন পারবে না ? আমি যদি ডাকি তোমাকে ? আমি নিজে তোমাকে ডাকছি।· সে ফিসফিস করে উঠল।·· বউদি নেই। ডাক্তারের ওখানে গেছে। নেত্য রান্নাঘরে। দাদা বেরিয়েছে। কেউ আসবে না।

ভিতরের দরজাটা সাবধানে বন্ধ করে এল রাহুল। তারপর জানালাগুলো। ঘরটা আবছা আঁধারে ভরে গেল। কোথাও কোন শব্দ নেই। শুধু চাপা কিছু শ্বাস প্রশ্বাসের ধ্বনিপুঞ্জ।···

চলে যেত ঠিকই—কিন্তু আর সম্ভব হল না। কারণ সকালের সেই বিস্ফোরণের পর রাহুল আবিষ্কার করল, শূন্যতা আর উদ্দেশ্যহীনতার চাপচাপ অবরোধ কোথাও সরে গিয়ে কিছু অর্থময়তা কিছু উদ্দেশ্য উঁকি দিচ্ছে। গঙ্গা বলেছিল,···তোমারও তো পায়ের নিচে মাটি দরকার। কেন তুমি ভবঘুরে হয়ে বেড়াবে ?···আর পাঁচটা স্বস্থ মানুষের মতো ঘরসংসার করো।

গঙ্গার কথাগুলো বারবার তার মনে ভেসে আসছিল। পায়ের নিচে যে মাটি দরকার—তা কি শীলার ভালবাসা ? কৈশোরে একদা গঙ্গার দেহে দেহ মিশিয়ে সে যে-সুখের স্বাদ প্রথম পেয়েছিল, তার মধ্যে আর যাই হোক, ভালবাসা ছিল না। তা ছিল নিষিদ্ধ প্রান্তরে খেলার গোপন আনন্দ—তার মধ্যে অস্থিরতা বেশি, উত্তেজনাই পরম, তার নিচে কোন বুনিয়াদ ছিল না। শুধু জেনেছিল, কামনা নামে একটা ব্যাপার মানুষের রক্তে থাকে। কামনার সুখটা সে একটু একটু চিনেছিল। দুঃখের দিকটা জানা হয় নি। জানা হল অনেক বছর পরে। অথচ সে তো শুধু কামনাই ! ভালবাসা নয়। ভালবাসা আলাদা জিনিস। তার অচেনা কিছু। এতদিনে একটা সকাল কামনার সঙ্গে ভাল-বাসাকে নিয়ে এল। আর ভালবাসার এত অশেষ দুঃখ ! দুঃখ দিতে জানে ভালবাসা।

চলে যাওয়াটা আবার ভেবে দেখবার বিষয় হয়ে উঠল রাহুলের কাছে। একটা দুঃখ সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে—যেখানে যাক, যতদূরে যাক্ সে। বার বার মনে হবে, মাত্র একবার সত্যিকার ভালবাসার খপ্পরে সে পড়েছিল। তার মধ্যে পবিত্রতা আর সৌন্দর্যের ছিল আভাষ। দেহের মধ্যে দিয়ে দেহাতীত একটা সত্তাকে ছুঁয়েছিল সে। হায়, তাকে নিবিড়ভাবে পাওয়া যায়নি—সে যেখানেই যাক, ভাববে। অস্থির হবে।

বিকেলে সাইকেলে চেপে সানু হাজির হল সেদিন।···কী, আর যে পাত্তা নেই ! শোক দুঃখ কি চিরকাল বয়ে বেড়ায় মানুষ ? বাবারা কেউ বাঁচে না। চলো ঘুরে-টুরে আসা যাক্। এই গরমে চুপচাপ শুয়ে থাক কী করে ? এ্যাঁ ?

অরুণ ছিল ইটখোলার দিকে। হয়তো দূর থেকে আসতে দেখেছিল সানুকে। এসে গেল সঙ্গে সঙ্গে।···এস, এস। আজই ভাবছিলুম, তোমার কাছে যাই একবার।

সানু ভ্রূ কুঁচকে বলল, কী ব্যাপার ?

অরুণ বলল, না—তেমন কিছু না। এমনি। মানে তোমার বউদি বলছিল —ও আসেটাসে না আর। অসুখ-বিসুখ হল নাকি।

সান্থু বলল, নাঃ। আমার অসুখ-বিসুখ হয় না। ভালো কথা—অরুণদা, এক্ষুনি শ'দুই টাকা দাও তো। শীগ্‌গির! বড্ড দরকার। আর ইয়ে—শীলা কোথায়?

অরুণ হন্তদন্ত হয়ে ডাকল, শীলা, শীলু! এদিকে একবারটি আসবে?

শীলার কোন সাড়া না পেয়ে সে ভিতরে গেল। সান্থু চোখ নাচিয়ে রাহুলকে বলল, দেখলে শালা আমাকে কী ভয় পায়! এক্ষুনি টাকা এসে যাবে। শীলাও এসে পড়বে। দুনিয়াটা এমনি জায়গা রাহুল—বুঝলে ভাই? সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না।

রাহুল শুকনো হাসল মাত্র।

সান্থু ফিসফিস করে বলল, গত রাত্রে ফের তিনতিনটে ট্রাক উজোড় হয়ে গেছে জানো?

রাহুল কৌতূহলী হয়ে বলল, কী হয়েছে?

সান্থু ফ্যাঁচ করে হাসল।·· মুক্তকেশী হোটেলটা যে দি সেণ্টার অফ দা রিং, পুলিশ কল্পনা করতেও পারে না। যদ্দিন ওটা থাকবে—তদ্দিন এই সব চলবে। লক্ষ্য করেছ, যত ট্রাকড্রাইভারের আড্ডা হল ওখানে! তোমার ছোটমা-টি যা জিনিয়াস, ভাবা যায় না!

রাহুল বলল, কাল রাতে রাহাজানি হয়েছে আবার?

সান্থু দুহাত ভর করে বুক চিতিয়ে দিল। বলল, হ্যাঁঃ! আমি হাওয়ায় গন্ধ পাই। দেখেশুনে আমারও ইচ্ছে করছে, ওদের দলে ভিড়ে যাই। পারিনে —কী হবে! এত ঢাকগুড়গুড় লুকোচুরি রক্ত জল করা আমার পোষায় না। আসলে ব্যাপারটা তো চুরি—নাকি? আমি চুরি চামারি ঘেন্না করি হে। চাইলেই যখন টাকা পাই, তখন ছেনালী করে কী হবে? ভিতরে বাইরে এক-রকম থাকাই আমার পছন্দ। শংকরটার মতো ছেনালি···হঠাৎ সে রাহুলের কানের কাছে মুখ আনল।···শংকরের দিনকাল যা পড়েছে। তুমি বাপের ছেলে না কী হে? মাগীটাকে শায়েস্তা করতে পারছ না? হাজার হোক, বাবা বিয়ে করেছিলেন শাস্ত্রমতে। রক্ষিতা তো নয়। তোমার একটা কর্তব্য আছে —না নেই!

রাহুল ক্ষুব্ধভাবে কী বলতে যাচ্ছিল, শীলা এসে ঢুকল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হল রাহুল। শীলা হাসল।·· কেন ডেকেছেন?

সান্থু বরের মতো লাজুক হাসল।···আরে আসুন, আসুন। একটু গল্পগুজব করা যাক্। অনেকদিন আসা হয় নি। বউদি কেমন আছে?

ভাল।···শীলা নির্বিকার বলল।···আমিও ভাল আছি। আর কী জানতে চান, বলুন?

সানু একটু অপ্রস্তুত হল।···অতিথির প্রতি আপ্যায়নটা কি ঠিকমতো হচ্ছে? মনে হচ্ছে, হঠাৎ আপনার কাছে কী অপরাধ করে বসে আছি। বুঝলে রাহুল, এই ভদ্রমহিলা সানু চ্যাটারজিকেও থতমত খাইয়ে ছ্যায় দাপটে। বাপ্‌স্‌, বুক ঢিপঢিপ করছে।

সে কৌতুক দিয়ে শীলাকে পরাহত করার চেষ্টা করছে, রাহুল তা টের পেল। রাহুল শীলার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, বসো। ভদ্রলোক এসেছেন। একটু গল্পগুজব করা যাক্। কাল রাতে কী যেন হয়েছে বললেন সানুদা?

শীলা লক্ষ্মীমেয়ের মত বসল কোণের দিকে একটা চেয়ারে। সানু তার দিকে তাকালে দেখত, ঠোঁটের কোণে প্রচ্ছন্ন কী বিদ্রূপ উঁকি দিচ্ছে।

সানু বলল, ব্রীজের ওখানে ফের তিনটে ট্রাক ফর্দাফাঁই। এত চুপি চুপি হয়েছে যে একশোগজ দূরের সেন্ট্রিরা টু শব্দটি পায় নি। বোঝ ব্যাপারখানা। এদিকে···

সেই সময় অরুণ এসে ওকে ডাকল।· একটু বাইরে চলো সানু, কথা আছে।

দুজনে বাইরে গেল। কিছুক্ষণ ফিসফিস করে কিছু কথা হল। তারপর সানু একা ফিরল। রাহুল টের পেল যে অরুণ ওকে টাকা দিয়ে গেল। সে শীলার দিকে চোখ টিপে হাসল। শীলা ভ্রূ কুঁচকে মুখ ফেরাল অন্যদিকে।

রাহুল বলল, আমরা চা পাবো তো এখন? শীলা, শুকনো মুখে আড্ডা জমে না।

শীলা উঠতে যাচ্ছিল—সানু বলল, চা-ফা হবে। রাত্রির কাণ্ডটা শোন।

শীলা বলল, আহা, চা খেতে খেতেই শোনা যাবো। আসছি।

সে চলে গেলে সানু অভ্যাসমত পা দোলাতে দোলাতে বলল, এই শীলা মেয়েটি এজন্যেই আমার বেষ্ট চয়েস রাহুল। দারুণ গিন্নিপনা আছে। তার ওপর চেহারায় এমন দীপ্তি যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। আমি শালা বড় ভাগ্যবান। অবশ্য···সে ফিসফিস করে বলল—অবশ্য এমন ভাল জিনিষকে অরুণচন্দ্র তলে-তলে ফাঁসিয়ে রেখেছে কি না কে জানে!

রাহুল ঠাণ্ডা স্বরে বলল, সে তো হেল্‌থ সার্টিফিকেটেই ধরা পড়বে। ভাবনা কিসের?

সানু কিন্তু রীতিমত গম্ভীর। সে বলল, সেই সমস্যা। কিন্তু রাহুল, ইট

ইজ স্যিওর এ্যাণ্ড সার্টন—শেষ অব্দি ভেবে ঠিক করেছি—ইফ শী ইজ রিয়েলি টাচ্‌ড্‌ বাই সামবডি, তবু আমি ওকে বিয়ে করব। এ আমার জেদ। আরে ভাই, বললে কী হবে—পৃথিবীতে কোথাও কি খাঁটি জিনিস আছে—নাকি থাকে? ভালমন্দর ভেজাল দিয়ে সবকিছু তৈরী। যদি শীলার কুমারীত্ব নষ্ট হয়ে থাকে, হোক—কিছু যায় আসে না।

রাহুল বলল, তাহলে ডাক্তারী পরীক্ষা নিশ্চয় করাচ্ছেন না।

নাঃ। ওটা একটা কথার কথা বলেছিলুম মাত্র। সানু খিকখিক করে হাসল।···অরুণটা একটা ছোটলোক। তাছাড়া ব্যাটার প্রাণের দায়ও বটে। তাই স্বীকার করে নিয়েছি। এমন ইনসালটিং সর্ত কোন ভদ্রলোক মাথা পেতে নিতে পারে? নেভার। অতএব অরুণশালা কী মাল, বুঝে গ্যাখ।

রাহুল বলল, হুঁ। তাহলে শীলাকে বিয়ে করতে আর তো বাধা নেই।

তা নেই। ভাবছি কালপরশুর মধ্যে দিনটিন ফাইনাল করে ফেলব। আসলে হয়েছেটা কী জানো? আমার বউদিটার ব্যবহারেই অবশেষে ঝুলে পড়তে হল। যা থাকে কপালে। ওকে মুখের ওপর বলে এসেছি, তোমার চেয়ে সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী সদ্বংশের মেয়ে আমি এ সপ্তার মধ্যে বউ না করে ফেল তো আমি বেজন্মা। শশাঙ্ক চ্যাটারাজির ঔরসে আমার জন্মোই হয় নি। মাগীকে দেখিয়ে দেখিয়ে বউ নিয়ে বাড়ি ঢোকা চাই। এক ডজন ব্যাণ্ড পার্টির অর্ডার দেব। কান্দী থেকে বাজী পোড়াতে মালাকার আনব। দাদার গাড়ি আছে—আমার নেই। তো কী হয়েছে? কাটোয়ার গুরুদাস আঢ্যির ছেলে আমার বুজম্‌ ফ্রেণ্ড্‌। কলকাতায় থাকে। মস্তো ক্যাডিলাক আছে তার। শালা হাইওয়ে দিয়ে প্রিঁ প্রিঁ করে চলে আসবে। হইচই ফেলে দেবে সানু চ্যাটারাজ!

সানুকে অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিল। তার মুখটা লাল—ফেটে পড়ছে যেন। রাহুল বুঝল, পারিবারিক চাপা ক্রোধটা ঠেলে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু আর কৌতুক অনুভব করছিল না রাহুল। প্রচ্ছন্ন অস্বস্তি ভাবে আড়ষ্ট করছিল ক্রমশ। সে মুখ ফসকে বলে ফেলল, সব বুঝলুম। কিন্তু শীলা—শীলা যদি রাজী না থাকে!

সানু চমকে তাকাল। কেন? সে রাজী নয়—এমন কথা তো শুনিনি। আর তার অরাজীর কারণ কী আছে? আমি স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ তো বটে। খেঁদাপেঁচাও নই—কী বলো তুমি? আমার ক্যাশ টাকা প্রচুর না থাকলেও সম্পত্তি আছে। সংসারী হলে তখন সব ছেড়েটেড়ে টাকা-পয়সার দিকে মন দেব। আশা করি, সৎপথে থেকেও ভাল কামাতে পারব। পারব না?

ওর কথায় একটা অসহায় কাকুতি ছিল। রাহুল গুম হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর শুকনো হেসে বলল, না। এমনি বললুম। শীলার ভাগ্য তো বটেই।

সানু চাপাস্বরে বলল, তুমি একটু সাহায্য করবে রাহুল ?

বলুন না। নিশ্চয় করব।

শীলা—ধরো যদি রাজী নাও থাকে, মেয়েদের ব্যাপার তো—বুক ফাটে মুখ ফোটে না—তুমি ওকে বুঝিয়ে বলবে? তোমাকে তো ও মনে হয়—খুব খাতির করে।

আমার বলায় কি কাজ হবে ? আমি তো বাইরের লোক। আজ আছি—কাল নেই। তাই হয়তো খাতির করে। খাতির দিয়ে তো বেশি দূর এগোন যায় না।

সানু সবেগে মাথা নাড়ল।...উঁহু হুঁ। তোমার ভীষণ সেবাশুশ্রূষা করেছে শুনেছি।

তাতে কি হয়েছে ? বাইরের লোক এসে অসুস্থ হয়ে পড়লে বাড়ির মেয়েরা একটু আধটু লক্ষ্য রাখে। এটা নিয়ম।

সানু চুপচাপ বসে রইল। ভ্রূ কুঁচকে কী ভাবতে থাকল। ইতিমধ্যে শীলা এসে গেল চা নিয়ে। চা রেখে সে চলে গেলেও সানুর ধ্যানভঙ্গ হল না যেন। রাহুল বলল, চা নিন সানুদা।

সানু হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা নিল। কিন্তু তার অন্যমনস্কতাটা ঘুচল না। রাহুল বলল, কী ভাবছেন ?

উঁ ?

অত ভাববার কী আছে। বিয়ে তো হচ্ছেই। অরুণ যখন শীলার গারজেন—অরুণ কথা দিয়েছে, ব্যস—আর কোন কথা নেই।

তা তো নেই। বলে সানু ঘুরল।...রাহুল, তোমাকে একটা কাজের ভার দিচ্ছি। পারবে ? তোমাকে আমি বিশ্বাস করি।

বেশ তো। বলুন।

তুমি শীলাকে আমার অসাক্ষাতে জিজ্ঞেস করবে, ওর কী মত। তারপর...

আমাকে যদি না বলে ?

আরে বাবা, যাহোক একটা কিছু জবাব দেবে তো সে ! সেটাই আমার জানা দরকার। অ আ ক খ—যা হোক কিছু তো বলবে।

রাহুল হেসে বলল, যদি মুখ না খোলে একেবারে ?

সানু হেসে উঠে উরুতে থাপ্পড় মারল।···ব্যস। মৌন সম্মতি লক্ষণং। সেটাও একটা খবর।

আপনি নিজেই জিজ্ঞেস করুন না। আমি বাইরে যাচ্ছি।

সানু স্যাঁচ করে জীভ কেটে বলল, ধ্যাৎ! সে হয় নাকি?

বাকি চা-টুকু গিলে সে উঠে দাঁড়াল।···চলো, সন্ধ্যেবেলাটা একটু ঘুরে আশা যাক। হ্যাঁ, ভাল কথা। ভুলে গিয়েছিলুম। তোমার ছোটমা আজ সকালে বলছিল—তোমার বাবার কিছু বাকসো-প্যাঁটরা আছে। পুরনো আমলের জিনিস সব। তোমাদের ফ্যামিলির নিজস্ব। ওগুলো সে রাখতে চায় না। ইচ্ছে করলে তুমি ফেরৎ নিতে পারো।

রাহুল মুহূর্তে অস্থির হয়ে উঠল। তাই তো! তার মায়ের কত সব স্মৃতি—দাদুর কত কিছু এবং বাবারও অনেক জিনিস রয়ে গেছে। গ্রাম ছেড়ে আসবার সময় সবই তো ওঁরা নিয়ে এসেছিলেন। ওইসবের মধ্যে তার নিজের ছেলেবেলারও অনেক কিছু থাকা সম্ভব। হয়তো কোন পোষাক-আসাক—কোন ছবি।

ছবি। মা-বাবার ছবি। স্কুলে বাবাকে বিদায়সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল—তারও ছবি আছে।

রাহুল কোন কথা না বলে উঠল। সানু বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে রাহুল ডাকল শীলাকে। দরজাটা বন্ধ করে দিতে হবে, এবং অস্ত্রটা তো নেবেই।···

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে হাইওয়েতে এল। তারপর কিছুদূর হেঁটে মুক্তকেশী পৌঁছল। সানু বলল, এক কাজ করো। তুমি ততক্ষণ কাজ গুছিয়ে নাও। আমি একপাক ঘুরে আসি। টাকার দরকার। শঙ্করকে পাকড়াব। জাস্ট একঘণ্টার মধ্যে ফিরব। তারপর রিকশো ডেকে মালপত্র যা নেবার নিয়ে ওখানে পৌঁছে দেব। কেমন?

সানু চলে গেল। রাহুল একটু দাঁড়িয়ে ইতস্তত করার পর হোটেলের বারান্দায় উঠল। ঘোঁতন বলল, মা ভেতরে আছেন। যান না।

সাত বছর আগে গঙ্গাকে দেখেছিল। চঞ্চল হাসিখুসি বেপরোয়া। উদ্দাম বন্যতাই ছিল তার জীবনের ছন্দ। শুচিতা-অশুচিতা পাপপুণ্য ধর্মাধর্মের বাইরে ছিল তার অবস্থিতি। নিঃসংকোচে সে নিজের সবকিছু—দেহ বা মন, বাজী

রেখে খেলতে পারত। বুক খুলে খুব সহজে সে তার নতুন স্তনের তিলটা দেখাতে পারত। বলত, চুষে ছাখো না—দুধ পাবে না একফোঁটা। পাবেই না। আমি যে কক্ষনো মা হবো না!

সাত বছর পরে এসে আরেক গঙ্গাকে দেখেছিল। ধীর শান্ত গম্ভীর। পুরো জোয়ার এসে গেলে নদীর যে থমথম স্থিরতা—তা ছিল তার মধ্যে প্রকাশিত। তার যৌবন নিজের কাছে গোপন প্রাচুর্যের প্রতীক—কৃপণের ধনের মতো লোহার সুকঠিন আলমারিতে গঙ্গা যেন নিজের দেহকে রাখতে শিখেছে। সে পাপপুণ্যের সুস্পষ্ট সীমারেখা চিনেই মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে একহাতে পাপ অন্যহাতে পুণ্যকে ছুঁয়ে থেকেছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, সে মা হয়ে গেছে। তার স্তনে অভাবিত দুধের উৎস খুলে গেছে সংসারী প্রৌঢ় পুরুষের কামনার দাঁতে—আর সে পুরুষকে সে হয়তো একদা পিতৃসম দেখেছিল। তাই সব মিলিয়ে সে ছিল বিদ্রোহিনী গঙ্গা। কিন্তু পূর্ণতা দিয়ে সব বিদ্রোহ সব প্রক্ষোভ সে ঢেকে রাখতে জানত।

আজ এক গঙ্গাকে দেখল রাহুল। চমকে উঠল বিস্ময়ে এবং ঘৃণায়।

ভেবেছিল, দেখবে শান্ত সৌম্য শোকনম্রা বিধবাকে—হয়তো স্বামীর নয়, ছেলের শোকে বিধ্বস্ত—ভাঁটার নদীর মতো শূন্য আর গভীর। ক্ষীণ স্মিত জলধারায় রোদ চিকচিক করছে বিষণ্ণতার মতো। তার দুপাশে জমে থাকবে পুঞ্জীভূত অনুশোচনার ক্লেদ।

কিন্তু এ কী গঙ্গা! তার কোথাও কোন অনুশোচনা—কোন রিক্ততা—কোন হারানোর দুঃখ নেই। ফিকে রঙের ভয়েল সাড়ি জামা, দুহাতে মোটা রুলি, গলায় চেন লকেট, কানে বেলকুঁড়ি, কপালে একচিলতে বেগুনি রঙের টীপ—নাগরী গঙ্গার দুচোখে কামনা বাসনার প্রবল উচ্ছলতা। তার দেহটা প্রগলভ হয়ে উঠেছে। তেইশ বছরের যৌবনকে দারুন ঝাড়পোঁছ করে, ঝড় ঝাপটার ধুলো বালি মুছে, দেহের আলমারিতে সাজিয়ে নিয়েছে এবং এখন সহজেই সে কপাট খুলে থাকে থাকে সাজানো হরেক জিনিস দেখাতে সংকোচ বোধ করে না যেন।

চোখ জ্বলে উঠেছিল রাহুলের। খোলামেলা মুক্তির বিশাল মাঠে একা হেঁটে চলেছে মুক্তকেশী গঙ্গা। ভবানীবাবু তাঁর মেয়ের নাম মুক্তকেশী রেখেছিলেন। তখন কি জানতেন এ মেয়ে একদা সত্যি সত্যি মুক্তকেশী হবে—ভয়ঙ্করী এবং বিবসনা—অযুত পুরুষের মুণ্ডুমালা যার গলায় শোভা পায়?

গঙ্গা আয়নার ভিতর রাহুলকে দেখেছিল। বলল, এস। তোমাকে ডেকেছিলুম।

রাহুল দাঁড়িয়ে রইল।

গঙ্গা বলল, বসো—দাঁড়িয়ে কেন? একটু দেরী করে এলে দেখা পেতে না। একবার বেরোচ্ছিলুম। যাক্ গে—আর যাচ্ছিনে কোথাও। তুমি এসে গেছ। আরে, বসো।

বিছানাটা একটু ঠিকঠাক করে দিল সে। রাহুল তবু দাঁড়িয়ে আছে দেখে গঙ্গা বলল, এটা নতুন বিছানা। বসতে পারো।

অর্থাৎ ভেবেছে যে রণ্টু যে-বিছানায় মরে পড়েছিল, সেটা বলে রাহুল বসতে চাইছে না। রাহুল অবশ্য বসল। তারপর বলল, বাবার কীসব জিনিসপত্র আছে?

গঙ্গা সামান্য দূরে বসে বলল, হ্যাঁ—ওই তিনটে বাকসো। বিছানাপত্তর তো সব ফেলে দেওয়া হয়েছে। অনর্থক এ বাকসোগুলো রেখে কী করব। যার জিনিস, সে এসে নিয়ে যাক্।

রাহুল বলল, কী আছে-টাছে ওতে?

গঙ্গা ভ্রূ এবং নাকের ডগা কুঁচকে বলল, আমি দেখিনি। ওগুলো খুলতেও অবশ্য দেখিনি কোনদিন। অন্যের জিনিসে আমার কোন আগ্রহ নেই। সে অস্ফুট হাসল।

রাহুল উঠে গিয়ে পুরনো ময়লা ঢাকনা দেওয়া ওপরের বাকসোটা খুলে ফেলল। তালা দেওয়া নেই। তালা নিচের দুটোয় অবশ্য আছে। ডালা খুলতেই কেমন একটা গন্ধের ঝাঁঝ তার নাকে এসে লাগল। কী যেন মনে পড়ে গেল গন্ধটার অনুষঙ্গে—আবছা কী স্মৃতি! কোন সকাল দুপুর অথবা বিকেলের—রোদ-ছায়া-নীলিমায় ঘেরা পৃথিবীর একটা পাড়াগেঁয়ে জীবনের কিছু মুহূর্ত—জানালার বাইরে দেখা ধুধু গঙ্গার বালুচর, ঝাউবন, কাজল জল, তার মা এক গুচ্চের খাতাপত্র বই, ছেঁড়াখোঁড়া জামা, কৌটো, টুকিটাকি জিনিস কতরকম। হরিণের শিঙ একটা। একটুকরো চন্দনকাঠ। একটা পুঁতির মালা। ছোট্ট হাতুড়ি।...

বইগুলি তার ছেলেবেলার স্কুল পাঠ্য। খাতাগুলোও। এটা বুঝি বাবার সেই সিল্কের পাঞ্জাবি! ওটা কি তার চেককাটা লাল শার্টটা! একটা অসমাপ্ত সোয়েটার—নেভীব্লু রঙের, কিছু উলের গুটি। মা বলেছিলেন, ওখানে গিয়ে ধীরে-সুস্থে তুলব। এখন তো মোটে খরা। শীত আসতে ঢের দেরী।...

কতক্ষণ তন্ময় হয়ে পড়েছিল সে। গঙ্গার কথা ভুলে গিয়েছিল। হঠাৎ চমকে উঠল। তার নগ্ন ঘাড়ের কাছে শ্বাসপ্রশ্বাসের ঝাপটায় সে একটু ঘুরল—গঙ্গা ঘনিষ্ঠভাবে পিছনে দাঁড়িয়ে আছে এবং কাঁধের ওপর দিয়ে জিনিসগুলো দেখবার চেষ্টা করছে। রাহুলের পিঠে—হয়তো মনের ভুল—গঙ্গার সামান্য চাপ—সে অস্বস্তিতে অস্থির হল চকিতে। গঙ্গা বলল, ওগুলো কোথায় নিয়ে যাবে ভাবছ ?

রাহুল দেখল, সরতে হলে ডাইনে বা বাঁয়ে ছাড়া আর জায়গা নেই—সে বাকসের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘরে আবছা অন্ধকার। বাইরে সূর্য ডুবে গেছে একটু আগে। সে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, আলো জ্বালবে ?

জ্বালছি। গঙ্গা যেন হাঁফাতে হাঁফাতে বলল কথাটা।··কিন্তু কোথায় নিয়ে যাবে শুনি ? অরুণের ওখানে ?

রাহুল বলল, হ্যাঁ আপাতত তাই। তারপর ···

তারপর ?

কিচ্ছু ঠিক নেই !—বলে রাহুল বাকসোটা বন্ধ করল। সরে এল একটু।

সে তো নেই, জানি। ঠিক করে নিতেই বা দোষ কী ?—গঙ্গা হাসল—ভ্রূ কুঁচকে ডান ভ্রূটা একটু তুলে ফের বলল, এক কাজ করলেই পারো। শীলা বেচারাকে আর মিছেমিছি না তাতিয়ে বিয়ে করে ফেলো না কেন ? শুনেছি, বেথুয়াডহরিতে ওর বাবার বাড়িটা এখনও আছে।

রাহুল কোন জবাব দিল না। গঙ্গা বলল, অবশ্যি সানু গোলমাল করে ফেলতে পারে। কিন্তু তোমরা দুজনে যদি চুপচাপ কেটে পড়ো, ও কী করবে ? বলো তো—আমিই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

রাহুল বলল, কী ব্যবস্থা করবে ?

গাড়ির। চাই কি সানুর দাদার জীপটাও মিলে যেতে পারে। সানু নাকের ওপর ঘা থাক্‌ না।

সানুর দাদা তো বিখ্যাত লোক—তার সঙ্গেও তোমার ভাব আছে ?···রাহুল তার বিদ্রূপটা আর লুকোতে পারল না।

আছে।···গঙ্গা কিন্তু গম্ভীর।···থাকা খারাপ ভাবছ কেন ? ভবানীবাবু খুব সামান্য লোক ছিলেন না। তাঁর ফ্যামিলির সঙ্গে চাটুয্যেদের যোগাযোগ থাকবে এতে অবাক হবার কিছু নেই। হোটেলওয়ালি হয়েছি বলেই তো বংশ-মর্যাদা চলে যায় না। যা ছিল—তা আছে। তুমি ভুলে যেও না—আমার

দাদু ছিলেন চাটুয্যেদের মতোই একসময়ের জমিদার।…বলে গঙ্গা উঠে সুইচ টিপে আলো জ্বালল।

রাহুল বলল, দেখি—সানুদা কখন আসে।

কোথায় যাচ্ছ?

রিকশো ডাকতে হবে। সানুদার অপেক্ষা শুধু।

হাত ধরে টেনে গঙ্গা বলল, বসো—কথা আছে। আসছি।

রাহুল বসল না। বলল, কী কথা?

গঙ্গা কেমন হাসল।…তোমার বয়স কোনদিন হয়ত বাড়বে না। সেই যা দেখেছিলুম, আজও তাই। বসো না, এখুনি আসছি। চা খেতে ইচ্ছে করছে না?

না। এক্ষুনি খেয়ে এলুম।

আমারও তো ইচ্ছে করতে পারে। মনে পড়ে? সেই যে ওবাড়ার ছাদে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যেবেলা দুজনে চা খেতুম—আমার কোঁচড়ে গরম মুড়ি থাকত। আঃ, কী সব দিন ছিল!

গঙ্গা চলে গেল। রাহুল কেমন অবশ বোধ করল। অবশ্য সানু না আসা অব্দি তার থাকা উচিত। একা বেরোতে গা ছমছম করে আজকাল। মনে হয়, রিভলবারটা মরে গেছে কখন। সে আজ পুরোপুরি নিরস্ত্র। নিরস্ত্র কিংবা কুরুক্ষেত্রে কর্ণের মতো।

বারান্দায় টিমটিমে আলো। বাবার ঘরে তালাবন্ধ রয়েছে। হঠাৎ রাহুলের মনে হল—গঙ্গা কি একা এ ঘরে থাকে? সম্ভবত ঘোঁতন ছোকরাটাও থাকে। তা না হলে তো তার ভয় পাওয়া উচিত এঘরে শুতে। দুদুটো ভয়ঙ্কর মৃত্যু ঘটেছে এখানে। এই ঘরে রণ্টু মরে পড়ে ছিল। এই খাটটাতে। গা শিউরে উঠল রাহুলের। ভূতপ্রেতের ভয় তার নেই। কিন্তু এখন এ মুহূর্তে এই শূন্য বাড়িটা হাঁ করে তাকে গিলতে আসছে যেন। সে প্যান্টের পকেটে হাত ভরে রিভলবারটা বের করল। চারিদিকে তাকাল। মনে হল—সামনে পিছনে ইতস্তত কিছু অদৃশ্য আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাকে লক্ষ্য করছে। কিছুতেই এই ভয়টা তাড়াতে পারল না সে।

পায়ের শব্দ শুনে দ্রুত অস্ত্রটা পকেটে ভরে ফেলল সে। গঙ্গা এক কেটলি চা আর একটা ঠোঙা হাতে ঘরে ঢুকল হাসিমুখে।… দিনগুলো কী-ভাবে কাটাচ্ছি, আমিই জানি। এত একা লাগে মানুষের, কখনো ভাবিনি। সারা রাত জেগে থাকি। ভয়ে চমকে উঠি। এত কান্না পায় তখন…সে আলমারি খুলে কাপপ্লেট বের করতে থাকল।

রাহুল বলল, চা-ফা আমি খাবো না কিন্তু।

গঙ্গা আমল দিল না তার কথায়। বলল, কী করব—এর নামই তো ভাগ্য। একসময় তোমাকে বলতুম—আমার কী মজা, কী মজা! মা হবো না। কারো ঘর করব না। মনে পড়ছে রাহুল?

রাহুল মাথা দোলাল শুধু।

আমার প্রত্যেকটি কথা মনে আছে। ভুলিনি। ওই নিয়েই তো আছি—তাছাড়া আর কী আছে আমার?

রাহুল বলল, অল্প করে দাও—ব্যস!

চায়ের কেটলিটা নিজের কাপে উপুড় করে গঙ্গা বলল, একটুও বদলাওনি তুমি। সেদিনও ঠিক এমনি বলতে।

রাহুল বিরক্ত হয়ে বলল, সেদিনকে টেনে আনছ কেন? ছেড়ে দাও।

গঙ্গা চটুল গলায় বলল, আমি আনছি কি? চলে আসছে। এ্যাদ্দিন মাঝে জগদ্দল পাথর ছিল—তাই লজ্জা দুঃখ ঘেন্না ছিল। এখন তো আব আটকানো যাচ্ছে না রাহুল।

রাহুল বিকৃত মুখে বলল, সত্যি বড় অবাক লাগে তোমাকে। তুমি কী!

গঙ্গা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, তেলেভাজাগুলো গরম আছে। নাও—কই হাঁ করো—খাইয়ে দিই। মনে আছে? সেবার তোমার মুখে—রাহুলের চোখের দিকে তাকিয়ে সে অস্ফুট হেসে থামল। বলল, ঘাট হয়েছে। পিছনটা চাপা থাক্। কই হাঁ করো।

রাহুল সব্যঙ্গ বলল, ছোটমা তার কর্তব্য করছে না তো?

গঙ্গা পলকে বদলে গেল।···কে ছোটমা?

তুমি।

না। তোমার ছোটমা মরে গেছে।···গঙ্গা হিসহিস করে উঠল। আর রাহুল, সেই পিছনটা যদি তুমি চাপা দিতে বলো—তাহলে এই পিছনটাই বা আমি চাপা দিতে বলব না কেন? নিশ্চয় বলব। আমি তোমার ছোটমা ছিলুম না—কোনদিনও ছিলুম না! তুমি আমাকে ঘেন্না করতে হয় করো—কিন্তু ক্ষেপিও না।

গঙ্গার চোখে জল দেখে অবাক হল রাহুল। সে সংযত স্বরে বলল, আদিম যুগে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ছিল। তখন মেয়েরাই ছিল, নাকি সমাজের লিডার। তাদের হুকুমেই পুরুষকে ওঠবস করতে হত। লিডার মেয়েটি ইচ্ছেমত পুরুষ বেছে নিয়ে তার সঙ্গে বাস করত। সন্তান জন্মাত। মা—তার মানে সেই

লিডার তখন করত কি জানো ? সন্তানদের ভিতর শক্তিমানদের বেছে নিত—যৌন সংসর্গ করত। ফ্রি সেক্স কাকে বলে—হয়তো তোমার চেয়ে কেউ বেশি জানে না গঙ্গা। কিন্তু আমরা যে অনেক দূরে চলে এসেছি।

গঙ্গা কী বুঝল কে জানে—সে শ্বাসক্লিষ্ট স্বরে বলে উঠল, ছোটলোক তুমি। ইতর! অসভ্য!

তার নাসারন্ধ্র কাঁপতে থাকল। সে মুখ ঘুরিয়ে বসল। রাহুল বলল, মিছে-মিছি গাল দিচ্ছ গঙ্গা। তুমি—আমার মনে হচ্ছে, সেই আদিম যুগ থেকে কী ভাবে চলে এসেছ এখানটায়। তোমাকে এখানে মানায় না।

গঙ্গা কিছুক্ষণ কোন জবাব দিল না। চায়ের কাপটা হাতে ধরা রইল। তারপর কঠিন আর ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বরে বলল, আমি তোমার মা নই। ভুলে যেও না কথাটা।

রাহুল বলল, তা ঠিক। কিন্তু গঙ্গা! তোমার সত্যিকার চেহারা কী আজও আমি জানতে পারলুম না। তুমি কী? কী তোমার ইচ্ছে? খুলে বলবে?

গঙ্গা ঘুরে তাকাল।···যদি বলি, তোমাকেই চাই! যদি বলি, তোমার ওপর রাগ করেই একটা অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলুম—তোমাকে কত ঘেন্না করি, তা বলতে চেয়েছিলুম!

মিথ্যা কথা!···রাহুল গর্জে উঠল।···সব তোমার ছেনালি।

গঙ্গা চায়ের কাপটা মাটিতে ছুঁড়ে উঠে দাঁড়াল। কাপটা সশব্দে ভেঙে গেল। সে অস্ফুট গর্জে বলল, আমার ছেনালি! ছেনাল বুঝি ছাখোনি তুমি। অরুণের বোনটা বুঝি খুব সতীসাধ্বী মেয়ে! বুকে বুক মিশিয়ে ছেনালপনা করতে তো কারো বাধে না!

রাহুল ক্ষিপ্রহাতে রিভলবারটা বের করল। তাক করল গঙ্গার দিকে। গঙ্গা চুপ করে গেছে। ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে সে থরথর করে কাঁপছে। আর সেই মুহূর্তে হঠাৎ মণিশঙ্কর এসে ঢুকেছে। সে চমকে উঠে চেঁচাল, সর্বনাশ! রাহুলবাবু, রাহুলবাবু! না—না—না।

রাহুল চাপা গর্জে উঠল, হাণ্ডস আপ রাস্কেল! আজ দুটোকেই খতম করব।

থতমত খেয়ে মণিশঙ্কর দুহাত তুলে দাঁড়াল।

একটা কিছু ঘটে যেতে পারত। মাথাটা ঠাণ্ডা করে নিতে কয়েকটা দণ্ডপল দরকার মাত্র—কিন্তু সানুও এসে পড়ল।

এসেই সে হো হো করে হেসে উঠল।···আরে, এ যে যাত্রার আসর একে-

বারে! এই রাহুল! রাখতো তোমার ইয়েটা। ওই টয়পিস্তল দিয়ে আসর জমে না।

রাহুল বেরিয়ে গেল।

সান্নু পিছনে গিয়ে বলল, কী হয়েছিল বলতো খুলে?

রাহুল করিডোরে দাঁড়িয়ে বলল, রিকশো ডাকছি। আপনি বাকসো তিনটে এনে দেবেন সান্নুদা?

সান্নু বলল, লে হালুয়া! এসেই ঝগড়াঝাঁটি। ঠিক আছে। রিকশো ডাকো।

নয়

সারারাত ঘুম আসছিল না রাহুলের। ঢিবির ওপর খোলামেলা জায়গায় অরুণের বাড়িটা। এ ঘরে জানালাও আছে অনেকগুলো। বাইরে গাছপালার শব্দ শুনে বোঝা যাচ্ছিল বাতাস বইছে উত্তাল। তালগাছের বিশাল শুকনো পাতাগুলো খড়খড় শব্দে নড়ছিল। অস্থিরতার আভাষ পাওয়া যাচ্ছিল নিসর্গে। অথচ ঘরের ভিতর যেন এতটুকু বাতাস নেই। কোণের টুলে টেবিলফ্যান আছে। সেটা হঠাৎ অকেজো হয়ে পড়েছে। সেটাও রাহুলের মেজাজ খারাপের কারণ হতে পারে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে সেই কালো ত্রিভুজের তৃতীয় বাহুটি অরুণ নয়—সম্ভবত সান্নুর দাদা নীরেন চ্যাটার্জি। অরুণ নিতান্ত জিম্মাদার—ষ্টকিষ্ট। যাই হোক, এবার অনায়াসে রাহুল একে একে তিনটি বাহুকে খতম করে রাজেনবাবুর কাছে গিয়ে পুরস্কার নিতে পারে। কিন্তু আবার তার মাথায় এল, সে ত্রাণকর্তা নয়। ময়নাচক হাইওয়ে নিরাপদ করার জন্য তার জন্ম হয়নি। রাহুল অন্যদিক থেকে ব্যাপারটা দেখার চেষ্টা করল। মণিশঙ্কর আর গঙ্গার মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক আছে। গঙ্গা তার পরলোকগত বাবার স্ত্রী। কাজেই মণিশঙ্করকে খুন করলে বাবার পক্ষে থেকে একটা নৈতিক কর্তব্য পালন করা হয়। তাছাড়া মণিশঙ্কর তাকে সন্দেহ করে। সে চায় না যে রাহুল এখানে থাকে। রাহুল আরও থাকবার চেষ্টা করলে এরপর হয়তো সে রাহুলকে সত্যি খতম করতে চাইবে। এদিকে গঙ্গা—গঙ্গারও বেঁচে থাকার অধিকার নাই। বাবার ওই ভয়ঙ্কর আত্মহননের জন্যে

দায়ী গঙ্গা। রণ্টু—নিষ্পাপ দুধের বাচ্চা—তাকে বাবা একরকম খুনই করেছেন, এবং তার কারণও গঙ্গা। অতএব গঙ্গার চরম শাস্তি পাওনা হয়েছে। বাকি রইল নীরেন চ্যাটার্জী। তার সঙ্গে রাহুলের কোন যোগাযোগ নেই। তাকে খুন করার উৎসাহ পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ গঙ্গা বা মণিশঙ্কর না থাকলেও কিছু যায়-আসে না, নীরেন চ্যাটার্জিই যখন মূল খুঁটি—বদমাইসির র‍্যাকেট সমানে টিঁকে যাবে।…গা ঘামতে থাকল রাহুলের। ছেড়ে দিল প্রসঙ্গটা। শীলার কথা ভাবল সে। সান্থুর কথা। সান্থু বিয়ে করবেই। হয়তো জোর করে বিয়ে করবে শীলাকে। রাহুল কি সত্যিসত্যি শীলাকে ভালোবাসে? তুমি কি শীলাকে ভালবাসো রাহুল? নিজের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সে।

তারপর কিছুক্ষণ বাইরের নিসর্গে মন রাখল। বাতাসের শব্দ শুনল একমনে। তারপর দেখল শেষ প্রশ্নটা তার মাথার ভিতর সাপের মত ফণা তুলে বসে রয়েছে। ভালোবাসা কি তাই—যা বেঁচে থাকে কিছুক্ষণের সংসর্গে, চিন্তা-ভাবনার অভ্যাসে, দেহের অভ্যাসে? দূরে গেলে যা মরে যায়! তখন বয়স কম—তবু গঙ্গাকেও ঠিক এমনি লেগেছিল। কত আপন, কত কাছের এবং মোহসঞ্চারিণী! তারপর ঠিকই ভুলে গেল। প্রকৃত ভালোবাসা কী—তা হয়তো জানা হয়নি তার। যা সময় ও দূরত্ব—অর্থাৎ দেশ-কালের ধার ধারে না।…পরক্ষণে হাসল।—ফেট! তা অবাস্তব অসম্ভব। ক্ষণিকতার মধ্যেই ভালবাসার বেঁচে থাকা। তার আয়ু খুব ক্ষীণ। শীলা আর সে হয়তো যথা-নিয়মে ফের দূরে সরে যাবে পরস্পর। তারপর আর কোন কষ্টই হবে না কারো।

…হবে না? তাহলে কেন গঙ্গা তাকে এত উত্তেজিত করল—এখনও করে চলেছে সমানে? আর, গঙ্গাও কেন বারবার তার মতোই আজও স্মৃতির কথা তোলে—ভোলে না কিছু, ভোলেনি? সংস্কারের শক্ত পাঁচিল চুঁইয়ে এপার-ওপার শিশিরের ফোঁটার মতো ভিজে দুঃখ, টলটলে ঘৃণা, স্যাঁতসেঁতে সবুজ শ্যাওলার মতো হাল্কা কামনার রঙ চোখে পড়ছে পরস্পর? একদিন শীলার জন্যেও তাই হবে। যে পুরুষ বা মেয়ের দেহকোষগুলো প্রাণবন্ত শুধু নয়—সজাগ, প্রতিরোমকূপে একটা করে চোখ—চেতনার তীব্রতায় যারা আজীবন জর-জর থাকে—প্রকৃতির অদ্ভুত ফসল সেইসব পুরুষ ও মেয়ের জীবনে কামনা যত সুখ আনে, তত আনে দুঃখ। রাহুলও তাদের একজন। হয়তো গঙ্গাও। রাহুল, তুমি ঠিক সেই রকম। গঙ্গা, তুমিও তাই।…রাহুল সিগ্রেট জ্বালল আবার। মাথার ভিতরটা শুকনো লাগছে। একটা অসহায় আকুতি তার

ভিতর ছটফট করে উঠেছে। ভয়ঙ্কর শূন্যতার সামনে এসে তাকে দাঁড়াতে হচ্ছে বারবার। কী করবে সে? রাহুল তুমি কী করবে?··· ············অবশেষে সে উঠে বসল। তক্তাপোষটা মচমচ করে কাঁপল। বালিশের নীচে থেকে রিভলবারটা বের করল। ময়নাচকে আসার রাত্রে একটা কার্তুজ খরচ হয়েছিল— বাকিগুলো পোরা আছে সেই থেকে। রিভলভিং কেসের সেই শূন্য খাপটা আর পূর্ণ করল না। দুটো কি তিনটে কার্তুজই যথেষ্ট। রাজেনবাবুর জন্যে নয়— নিজের জন্যে আর গঙ্গার জন্যেই এটা জরুরী।

······দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চুপি চপি খালি পায়ে সে বেরুল। খালি গায়ে, পরনে প্যান্টটা মাত্র। অসম্ভব হাল্কা লাগছে শরীর। শুক্লপক্ষ সুরু হয়েছে সবে। চাঁদ অনেক আগে ডুবে গেছে। অন্ধকার আছে। সে হাইওয়েতে উঠল না—মাঠের দিকে নামল। অনেকটা ঘুরে একটা বাগান পেরিয়ে মুক্ত-কেশীর পিছনের দিকে পৌঁছল। খিড়কির দিকে ছোট্ট ডোবা। ডোবার পাড়ে পাঁচিল। পাঁচিলে লতাপাতার ঘন বিনুনি। সামান্য শব্দ হল। সে উঠোনে নামল। বারান্দায় উঠল। বারান্দার দিকে জানালাটা খোলা। ঘরে মৃদু নীলচে আলো টেবিলল্যাম্পের। গঙ্গা—মণিশঙ্কর! পাশাপাশি শুয়ে আছে। রক্ত ছলাৎ করে উঠল। রিভলবার তুলে প্রথমে লক্ষ্য করল গঙ্গাকে। ট্রিগারে চাপ দিল! কোন শব্দ নেই। ফের জোরে চাপ দিল! নিস্ফল। রিভলভিং কেসটা ঘুরিয়ে দিল আঙুলের চাপে। ফের ট্রিগার টিপল। আওয়াজ হল না। জ্যাম হয়ে গেছে! রাহুল থরথর করে কাঁপতে থাকল। গঙ্গা চোখ খুলেছে। তাকিয়ে আছে তার দিকে। ভয়ঙ্কর হিংস্র চাহনি। অব্যক্ত আর্তনাদ বেরুল রাহুলের গলায়।

চোখ খুলল সে। শীলা তার গায়ে চিমটি কাটছে। ধুড়মুড় করে উঠে বসল রাহুল। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

শীলা হেসে বলল, গোঁ গোঁ করছিলে শুনে ছুটে এলুম। স্বপ্ন দেখছিলে? কী স্বপ্ন?

স্বপ্ন দেখছিল। বাইরে ভোর হয়েছে। ধূসর আলোয় পাখ-পাখালি ডাকছে। রাতের উদ্দাম হাওয়াটা আর নেই। ঘামে সারা শরীর চবচব করছে। ঠোঁট মুছে সে তাকাল শীলার দিকে। তারপর বালিশ তুলে রিভলবারটা বের করল। দেখে নিল কয়েক মুহূর্ত। তারপর······

শীলা হাঁ হাঁ করে উঠেছিল। রাহুল জানালা দিয়ে অদূরে ইটের পাঁজাটা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে বসল। বিস্ফোরণের আওয়াজে বুক কেঁপে উঠল শীলার। বারুদের কটু গন্ধ ভেসে এল। রাহুল একটু হেসে রিভলবারটা ফের যথাস্থানে লুকিয়ে ফেলল। বলল, পরীক্ষা করে দেখলুম। অনেকদিন চুপচাপ আছে তো! আর শীলা, মাঝে-মাঝে হঠাৎ ভয় হয়, ওটা অকেজো হয়ে পড়ল বুঝি। ওকে ছাড়া আমি কি বাঁচতে পারি?

অরুণ পর্দা তুলে লাল ঘুমঘুম চোখে বলল, শব্দ হল কিসের?

শীলা বলল, কে পটকা ফাটাল কোথায়। ঘুমোও গে না।

অরুণ চলে গেল। এইটেই ওর ঘুমের সময়। কাজেই এত ভোরে এই নির্জন জায়গায় কে পটকা ফাটাবে—এত হিসেবের অপব্যয় করা তার ইচ্ছে নয়। একটা কৈফিয়তই যথেষ্ট।

শীলা বলল, স্বপ্নটা কী বললে না তো? আর আচমকা গুলি ছুঁড়লেই বা কেন, শুনি?

রাহুল বলল, আচ্ছা শীলা—তুমি তো বেশ জানো আমার স্বভাব-চরিত্র। আমি খুনজখম করে বেড়াই। আমি—

শীলা বাধা দিয়ে বলল, যতক্ষণ চোখে দেখিনি—ততক্ষণ তোমাকে খুনী বলব কেন?

চোখে দেখাটাই তো সব নয়।

নয়। কিন্তু তোমার মধ্যে খুনীর আদল নেই। তোমার স্বভাবে নেই।

কিন্তু এই রিভলবারটা কেন তাহলে?

বারে! আমার একটা সখের ছুরি আছে। তাতে কী প্রমাণ হয়?

শীলা, অত সরলতা ঠিক নয়। চেহারায়-স্বভাবে সবকিছু ধরা পড়ে না মানুষের।

তর্ক থাক! স্বপ্নটা কী বলো শুনি।

তার আগে অন্য একটা কথা শোন, শীলা। যদি বলি, আমি এখানে এসেছিলুম একজন ভাড়াটে খুনী হিসেবে! এসেছিলুম তিনজন মানুষকে খুন করতে। কিছু পুরস্কারের লোভে!

শীলা ঠোঁট উল্টে বলল, আমি বিশ্বাস করিনে।

আমার কথায় একটুও মিথ্যে নেই, শীলা। সত্যি বলছি—বিশ্বাস করো।

ধরো, করলুম। কাদের খুন করতে এসেছো? কে তারা?

মণিশঙ্কর ঘোষ, মুক্তকেশী রায় ওরফে গঙ্গা আর নীরেন চ্যাটার্জি।

ধ্যাঃ! কেন?

ওরা হাইওয়ে রাহাজানির তিনটি মূল খুঁটি।

তুমি পুলিশের লোক নাকি? আই বি এজেণ্ট?...শীলা খিলখিল করে হাসল।

না। বলেছি তো আমি একজন ভাড়াটে খুনী।

তা খুন করছ না কেন? হাত কাঁপছে?

রাহুল একটু ঝুঁকে পড়ল।...সেটাই সমস্যা। ধরো যদি সত্যি কাজটা করেই ফেলি—তুমি, শীলা—তুমি কি আমাকে তারপরও ভালোবাসতে পারবে? ঘেন্না করবে না?

শীলা নিষ্পলক তাকিয়ে রইল তার দিকে। কয়েক মুহূর্ত পরে সে আস্তে আস্তে বলল, ওকথার কী জবাব দেব? বরং আমার একটা কথা তোমাকে বলা দরকার। তুমি ছাড়া কাকেও বলা যাবে না। আজ সারারাত জেগে ঠিক করলুম, আমি এখান থেকে চলে যাব। সবাইকে লুকিয়ে চলে যাব। আমি জানি, তুমি কথাটা কাকেও বলবে না। তাছাড়া—তোমাকে বললুম, পাছে কিছু ভুল বোঝো আমাকে।

রাহুল চমকে উঠে বলল, কোথায় যাবে?

আপাতত বেথুয়াডহরি। বাবার বাড়িটা আছে। একটা লোক দেখাশোনা করছে। সেখানেই উঠব। বউদির অসুখ বলে এ্যাদ্দিন ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু আমাকে পালাতেই হবে।

রাহুল একটু চুপ করে থেকে বলল, অরুণদা একটু বিপদে পড়ে যাবে হয়তো।

শীলা ধরাগলায় বলল, দাদা আমাকে একরকম ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছে। লোকটা হয়তো অসৎ, অনেক দোষত্রুটি আছে—কিন্তু ও যা করেছে, কেউ করে না। সেইজন্যেই কষ্ট হয়। কিন্তু আর সম্ভব নয়। আমার জীবনটা কেন এমনি করে তার জন্যে নষ্ট করে ফেলব?

রাহুল চুপ করে রইল।

শীলা ম্লান হেসে মুখ নামিয়ে বলল, তুমি এসে আমাকে ভীষণ লোভী করে ফেলছ হয়তো। কত অসম্ভব স্বপ্ন দেখছি। কত অদ্ভুত সব আশা!

রাহুল তার একটা হাত ধরল। বলল, আমারও তাই, শীলা। তোমার মতো। স্বচ্ছন্দে সহজভাবে বাঁচতে ইচ্ছে করে। অথচ...

শীলা মুখ তুলল।...অথচ কী?

কোন উৎসাহ পাইনে। সব মনে হয় উদ্দেশ্যহীন। কেন এমন হচ্ছে, কে জানে!

কিছুক্ষণ দুজনে চুপচাপ থাকার পর শীলা বলল, ইচ্ছে হলে তুমিও আমার সঙ্গে যেতে পারো। তোমার যদি ভালো লাগে!

রাহুল হাতটা ছেড়ে দিল। বলল, দেখি। তুমি কখন যাবে, ভাবছ?

যেকোন দিন—যেকোন সময়। কাটোয়ায় একটা ট্রেন পাব সেই সন্ধ্যার দিকে। বহরমপুর হয়ে যেতে হবে। দুপুরের ট্রেন ধরা অনিশ্চিত। বাসেই ঘণ্টা চার লেগে যায়।

বরং নবদ্বীপ হয়ে গেলে তো সোজা!

তাও দেখব।

রাহুল শুকনো হাসল।···অরুণদা আমাকে দুষবে না তো? ভাববে না তো যে আমিই তোমাকে ফুসমন্তর দিয়েছি?

শীলা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সে তুমি সামলে নেবে। বসো চা আনি। মুখটুখ ধুয়ে ফেল ততক্ষণ। ভেবে নাও কথাটা। আজ পুরো দিন আর রাত্রিটা অব্দি তোমাকে ভাববার সময় দিলুম। আলটিমেটাম।···নীরব হেসে চলে গেল সে।

রাহুল বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। এমনি করে পালিয়ে যেতে তার বাধছে। না—স্ক্যাণ্ডালের জন্যে নয়। বাধাটা অন্য কোথাও। কালো ত্রিভুজটা বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে তার। চেষ্টা করেও ওটা ভুলে থাকা যায় না। প্রশ্নটা কী অদ্ভুত! এত সাজানো গোছানো ঝকঝকে স্বপ্ন সে এর আগে এক-বারও দ্যাখেনি। একটুও টের পায়নি যে আগাগোড়া সবটুকুর পিছনে একটা নিপুণ কারিগরি রয়ে গেছে।

কিন্তু স্বপ্নটা যদি বাস্তব হত, হাল্কা হতে পারত কি? স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস নিতে পারত সে? আবার একটা কালো ত্রিভুজ তার সামনে ভেসে এল। শীলার চলে যাওয়াটা ঢেকে ফেলল।···

অস্থির রাহুল দু তিনবার চিঠিটা লিখবার চেষ্টা করল আর ছিঁড়ে ফেলল। রাজেনবাবুকে লিখতে চাচ্ছিল সে।···আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনাদের সেই মারাত্মক কালো ত্রিভুজের খোঁজ আমার হাতে। কিন্তু আমি পারছিনে। বড্ড ক্লান্ত। একফোঁটা শক্তি নেই আর। আজ স্বপ্ন দেখলুম, রিভলবারটা জ্যাম হয়ে গেছে। এ কাজ আমার নয়। তিনটি নাম দিচ্ছি। এবার নতুন কাকেও

পাঠান—যে খুব শক্ত-সমর্থ, বিবেচনাহীন, বেপরোয়া মানুষ। নয়তো আপনাদের আইনের সাহায্য নিন। নামগুলো হচ্ছে…

শেষবার ছিঁড়ে ফেলে সে উঠল। হার স্বীকারের সংকোচে আড়ষ্ট হল সে। ভেবে দেখল, অন্য কোথাও হলে কাজটা করতে একটুও পিছপা হত না—হাত কাঁপত না। কিন্তু ময়নাচকে এসে সে আজ ভারি অসহায় হয়ে পড়েছে যেন। শুধু মনে হচ্ছে, কী লাভ তার ? বারবার বাবার কথাটা মনে ভাসছে—তুমি তো ত্রাণকর্তা নও !

অথচ এখান থেকে প্রতিশ্রুত রক্ত না ছুঁয়ে চলে যাওয়া মানে ভীতুর মতো, কাপুরুষের মতো লেজ গুটিয়ে পালানো। কাকে তার এত ভয় ? গঙ্গাকে ? গঙ্গা…গঙ্গা…গঙ্গা ! কালো ত্রিভুজ ! মুক্তকেশী গঙ্গা ! শব্দগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে ভীমরুলের মতো তার মগজকে ঘিরে ধরল।

তখন সে বেরুল। প্রস্তুত হয়েই বেরুল। দেখে নিল, স্বপ্ন না বাস্তব এই বেরিয়ে পড়া—এই ছোট্ট রাস্তাটা, গাছপালা, ঘরবাড়ি, হাইওয়ে, খরদুপুরের নিঃঝুম হয়ে ওঠা ঝিম ধরা ময়নাচক আর মাথার ওপর গনগনে সূর্য, রোদের ধারাবাহিক বিস্ফোরণ, ঝাঁঝাল হাওয়া, হিংস্র দহনজ্বালা।

হাইওয়েতে উঠে চমকে দাঁড়াল হঠাৎ। সানুকে মনে পড়ে গেল। একবার যাবে তার কাছে ? সব খুলে বলবে ? পরক্ষণে মনে হল, সেটা ঠিক হবে না। সানুর ব্ল্যাকমেলিং বন্ধ হয়ে যাবে—তাই সানু এতে একটুও সাহায্য করবে না তাকে। উপরন্তু খাম-খেয়ালী গোঁয়ার সানুর হাতেই তার বিপদ ঘটতে পারে। তাছাড়া সবচেয়ে মারাত্মক কথা—সানুর দাদাও তো তার অন্যতম শিকার ! না—এটা ভীষণ ভুল করা হবে।

রোদের তাপে গা জ্বালা করছিল যেন। সামনের ডিসপেন্সারিটার পাশ দিয়ে একটা গলিপথ বেরিয়ে গেছে পুরনো ময়নাচক গ্রামের দিকে। দুধারে ঘন বাঁশবন। সে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। সাত বছর পরে রাস্তাঘাট অনেক ভুল-ভাল হতে পারে। তবে যদ্দূর মনে পড়ছে, বাঁশবনটার শেষে একটা প্রকাণ্ড দীঘি আছে। উঁচু পাড়গুলো ঘন গাছপালা আর ঝোপঝাড়ে ভরতি। পাড় ধরে কিছু পশ্চিমে এগোলে কয়েকটা পোড়ো বাড়ি পড়তে পারে সামনে। ভবানী-বাবুদের জ্ঞাতিদের বাড়ি। তারা সব কে কোথায় রয়েছে। ধ্বসে গেছে বাড়ি-গুলো। ডাইনে মন্দির, বাঁয়ে একটু এগোলে গঙ্গার বাড়ির পিছনের ডোবা পুকুরটা। খুব পরিষ্কার দেখা হয়নি—তাহলেও পিছনটা নির্জন। স্বপ্নের মধ্যে ওদিক দিয়েই গিয়েছিল সে। বাস্তবে কী ঘটবে জানা নেই। তবু চেষ্টা করা

যেতে পারে। রাতের দিকে হলে অবশ্য এত ভাববার কিছু ছিল না। কিন্তু আর অপেক্ষা করার ধৈর্য তার নেই।

হঠাৎ মনে হল, অমন করে লুকিয়ে যাবার দরকার কী? হাইওয়ে দিয়েই তো বুক ফুলিয়ে গঙ্গার কাছে যাওয়া যায়। সেদিন হঠকারিতার বশে যাই ঘটুক, গঙ্গা তাকে অস্বীকার করবে না—খুসি হবে। কারণ, গঙ্গা তাকে এখনও ভোলেনি। নির্লজ্জা গঙ্গা যেন সাত বছর আগের দিনগুলোকে টেনে এনে বর্তমানের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চায়—অব্যাহত রাখতে চায়। সুতরাং একটুখানি অভিনয় করতেই হবে। গা ঘিনঘিন করবে। সংস্কারে বাধবে। হৃষিকেশের শরীরের ছায়া পড়েছিল যার উপর, তাকে মা না ভাবুক, ভাবতে না পারুক—তবু সংস্কার বলে একটা কঠিন সত্য আছে। তাকে হটিয়ে দিতে পারবে তো?...

'মুক্তকেশী'র সামনে এসে অবাক হল সে। হোটেল বন্ধ। ব্যাপার কী? অত পুলিশ কেন ওখানে? উল্টোদিকের দোকানগুলোতে জায়গায় জায়গায় ভিড় জমে রয়েছে। সবাই তাকিয়ে আছে 'মুক্তকেশী'র দিকে। চাপা গলায় কথাবার্তা বলছে। সে পিছিয়ে এল উল্টাদিকের চায়ের দোকানটায়। সেই সময় সানুর কণ্ঠস্বর কানে এল। এই যে রাহুল এখানে!

সানু চায়ের দোকানের ভিতর বসে আছে। পাদুটো টেবিলে তুলে বুকে দুটো হাত বেঁধে দুলছে সে। রাহুল কাছে গিয়ে বলল, কী হয়েছে সানুদা?

সানু তার দিকে তাকাল না। চোখ বুজে জবাব দিল, তোমার ছোটমা গঙ্গারাণী খুন হয়েছে।

রাহুলের মনে হল, তার শরীরটা কতক্ষণ—হয়তো অনিশ্চিত অজ্ঞাত দীর্ঘ সময় ধরে একটা অতলস্পর্শী শূন্যতার মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে অবশেষে কোথায় এসে ঠেকল। অনুভূতিহীন নিঃসাড় বোধশূন্য হয়ে সে তাকিয়ে আছে সানুর দিকে। সানু তখনও চোখ খোলেনি। দুলছে আর দুলছে।

সানু নির্লিপ্ত স্বরে ফের বলল, কখন খুন হয়েছে, কেউ টের পায়নি। বিছানায় স্বাভাবিক ভাবে মানুষ যেমন শুয়ে থাকে, শুয়েছিল। ঘোঁতনা মেঝেয় শোয়, ও থাকে খাটে। ঘোঁতনা উঠে গেছে। চা এনে ডেকেছে। সাড়া পায়নি। মাথার কাছে চা রেখে চলে গেছে—রোজ যেমন করে। তখনও কিছু সন্দেহ করে নি ব্যাটা। ইদানীং গঙ্গা নটার আগে ঘুম থেকে উঠত না। হোটেলের দিকে আসত দশটায়—আপিস যাওয়ার মতো। তারকবাবুর ওপর হোটেলের

ভার পড়েছিল—তোমার বাবার অসুখের পর থেকে। বুড়োটা বিশ্বাসী লোক। খুব একটা দরকার না পড়লে গঙ্গারাণীকে ঘাঁটাত না। ভাবত, শোকটোক পেয়েছে বড্ড—সামলে উঠুক।…ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে একটু হেসে সানু বলতে থাকল।…দশটা বেজে গেল, উঠল না—তখন ঘোঁতন পায়ে হাত দিয়ে ঠেলেছে। পা ভীষণ ঠাণ্ডা আর হলদে—ছোঁড়াটা পুলিশকে বলছিল, শুনলুম। হঠাৎ তার চোখ চলে যায় বালিশে—মুখটা একপাশে গোঁজা। মাথায় হাত দিয়ে মুখ সোজা করতে গিয়ে সে চেঁচিয়ে ওঠে। গলায় আঙুলের দাগ নীল হয়ে বসেছে। গলা টিপে মেরেছে ওকে।

রাহুল অবশ জিভে কোনমতে উচ্চারণ করল, কে মেরেছে?

আমি নই।…বলে সানু তার দিকে একবার তাকাল—ঠোঁটে হাসির ঝিলিক। হাসিটা ম্লান—অপরিচ্ছন্ন।…গঙ্গারাণী ছিল আমার সোনার হাঁস। যাক্ গে—যে মরেছে, সে তোমাকেই সম্ভবত ট্র্যাপ করতে চেয়েছিল। কারণ কাল সন্ধ্যায় তুমি একটা কীর্তি করে বসেছিলে। এটা পুলিশ জানে না। আর জেনেও তাদের লাভ নেই। খুনীকে তারা ধরে ফেলেছে। ঘোঁতনার বুদ্ধি আছে। মণিশঙ্কর কাল রাতে—অনেকটা রাত তখন, গঙ্গাকে ঘুম থেকে তুলেছিল। ঘোঁতনের হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। দুজনকে বিছানায় বসে কথা বলতে ছাখে। ঘোঁতন ফের ঘুমিয়ে পড়ে। এখানেই একটা মজার ব্যাপার আছে। যখন সকালে সে বাইরে বেরোয়, ছাখে দরজাটা খোলা আছে।…

সানু একটু চুপ করে থেকে বলল, তাহলেও হয়তো মণিশঙ্করের কিছু হত না। ও যা বদমাস, শেষঅব্দি তোমাকেই জড়াত। কিন্তু সে সুযোগ পেল না। কারণ—রিয়েলি, ইট ইজ কমপ্লিটলি আনবিলিভেবল। আমার দাদাকে এ ব্যাপারে উৎসাহী দেখলুম ভীষণ। মাইরি, দাদারই স্ত্রীকে যেন মণিশঙ্কর মার্ডার করেছে। উ রে হালুয়া! দাদাও গঙ্গারাণীর ভরাগাঙে ডুব দিচ্ছিল! দুচোখের দিব্যি, একটুও টের পাইনি। ভাবতুম—নিতান্ত কড়ির কারবার নিয়ে যোগাযোগ। আজ দাদার চেহারা দেখে তাক লেগে গেছে। ঝড়ো কাক যেন। বউদিকে একটু ইসারা দিলে যা লেগে যাবে, ভাবা যায় না!…সানু খিকখিক করে হাসল।

রাহুলের ভিতর হঠাৎ কোত্থেকে একদমক চাপা দীর্ঘ অবরুদ্ধ কান্নার চাপ এসে গেছে—কিসের এ কান্না—কেন—তা সে জানে না; একে সামলাতে সে দাঁতে দাঁত চেপে মুখটা ঘুরিয়ে নিল। তার ভিতর দাপাদাপি সমানে চলতে লাগল তবু। তার মনে হল—এক্ষুনি কোন নির্জন জায়গায় গিয়ে বমি করার

মতো উদ্দাম না কাঁদলে সে বুক ফেটে মরে যাবে। এ কি তার পরাজয়ের দুঃখ, নাকি গঙ্গার জন্যে শোক? সে বুঝতে পারল না।

সে উঠে দাঁড়াল। একবার দেখতে ইচ্ছে করছিল হতভাগিনী গঙ্গাকে। সে বলেছিল, পায়ের নিচে তোমার মাটি দরকার। মাটি দেব তোমাকে। আরও পাঁচটা মানুষের মতো ঘরকন্নার সুখ নাও, রাহুল। কেন অমন করে জীবনটা নষ্ট করবে তুমি?...হয়তো তার কথায় সত্যের আবেগ ছিল, কামনাটাও ছিল শুদ্ধ আর যথার্থ, আন্তরিকভাবেই কথা বলেছিল গঙ্গা। যদি রাহুল থেকে যেত তার কাছে—গঙ্গার ভাষায় 'শুধু একজন এবাড়ির মানুষ' হয়ে থাকত—তাহলে গঙ্গাকে সে বাঁচাতে পারত। হয়তো কালো ত্রিভুজ থেকে সরিয়ে আনতে পারত। অন্তত এই নিষ্ঠুর অসহায় মৃত্যু বরণ করতে হোত না তাকে।

কিন্তু কেন তাকে খুন করল মণিশঙ্কর? নীরেন চ্যাটারজির সঙ্গে কি গঙ্গার দেহটা নিয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হয়েছিল গোপনে? অন্তত সানুর কথায় তার আভাষ পাওয়া যাচ্ছে।

রাহুল উঠে দাঁড়িয়েছে দেখে সানু বলল, রাহুল! তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল হল। একটা জরুরী কথা ছিল তোমার সঙ্গে।

রাহুল বলল, বলুন।

উঁহু। এখানে বলার মতো নয়।...সানু পা নামিয়ে সোজা হল। একটু ভেবে নিয়ে বলল, আজ সন্ধ্যার পর দুজনে একবার বেরোব। তুমি তৈরী থেকো। ডেকে নেব অরুণের ওখান থেকে। কোথাও যাবে না কিন্তু। ভীষণ জরুরী ব্যাপার। অলরাইট?

রাহুল অন্যমনস্কভাবে বলল, আচ্ছা।

সে বেরিয়ে পড়ল। পথে আসতে আসতে তার মনে হল, সানুকে অমন অপ্রসন্ন আর নার্ভাস দেখাচ্ছে কেন? সোনার হাঁসের একটা মারা পড়ল, অন্যটা পুলিশের হাজতে—তাই কি?

অরুণ সাইকেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে আসছিল। রাহুলকে দেখে নামল সে।...সর্বনাশ! তোমার কোন ঝামেলা হয়নি তো? এইমাত্র শুনলুম সব। ভয় পেয়ে গেলুম—তোমার আবার...

রাহুল শুকনো হেসে বলল, না। আমার কী হবে? মণিশঙ্করকে ধরেছে।

অরুণ পাশেপাশে হেঁটে আসছিল। বলল, হ্যাঁ—এ আমি জানতুম। নীরেনবাবু ইদানীং গঙ্গার সঙ্গে মেলামেশা আরম্ভ করেছিল। কানাঘুঁষো শুনছিলুম অনেক। এই তো গতকাল ওঁকে ঠাট্টা করে বলছিলুম—দাদা,

আপনার পলিটিকাল কেরিয়ার আছে, সম্মানী মানুষ—দেখবেন যেন···নীরেনবাবু বলল, ধ্যাৎ! মণিশঙ্কর রটাচ্ছে নাকি। ওর কি মাথা খারাপ হল অরুণ? যে ডালে বাসা, সেই ডাল কাটতে বসেছে কেন?···যাক্ গে বাবা। আমি কাল সব ফয়সালা করে ফেলেছি, রাহুল।

রাহুল বলল, কিসের?

অরুণ জবাব দিল, তুমি কতক জানো, কতক জানো না। সেই চোরা মালপত্তর হে। সব দায় খালাস করেছি। আর বাবা কারো সাতে পাঁচে নেই আমি। এবার সান্নু আসুক না টাকা চাইতে—সোজা বলে দেব যা পারো করো—আর একপয়সাও দেব না। আমি চোর, না চোরের দাদা! তাছাড়া ওর দাদা নীরেনবাবুও বলেছে, আর এক পয়সা যেন না দিই ওকে। নীরেনবাবু জানত না সান্নু আমার কাছে চাপ দিয়ে টাকা আদায় করে। আর একটা মজার কথা সান্নু ওঁকেও দাদা বলে রেহাই দিত না, জানো? ব্ল্যাকমেইল করে আসছিল। নীরেনবাবু আর আমি কাল দুজনে মিলে একটা আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিংএ এসেছি। সান্নুকে ঠাণ্ডা করতে হবে।

রাহুল চমকে বলল, অ্যাঁ?

হাসল অরুণ।···চমকে উঠছ কেন? খুনটুন নয়—ভেবে দেখলুম, শীলার বিয়ে তো দিতেই হবে। এখন সান্নুর দাদা নিজে যখন সান্নুর সঙ্গে বিয়ের কথা তুলল—তখন কথাটা ভাববার মতো। অতবড় বংশ, অমন ফ্যামিলি, অত রবরবা। সান্নু বদমাস মাতাল বটে, নীরেনবাবু যা বললে, ঠিকই বললে—বউ ঝুলিয়ে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে সব। এমন চান্সটা ছাড়া ঠিক হবে না ভাই। তুমি কী বলো?

রাহুল বলল, হ্যাঁ—সে তো ভালই।

অরুণ সোৎসাহে বলল, এ খুব ভালো হল। ওর দাদা নিজে গ্যারাণ্টার রইল। তাছাড়া—আরেকটা ব্যাপার তুমি জানো না। সান্নুটা কী পাজি ভাবা যায় না। এ্যাদ্দিন বলছিল, বিয়ে করবে—তবে আজকালকার মেয়ে,—খিকখিক করে হেসে অরুণ বলল, শালা একটা বদ্ধ পাগল। বলে হেলথ-সার্টিফিকেট চাই! শীলা শুনলে ক্ষেপে যেত। তা—

রাহুল বলল, সেটা আর চায় না সান্নু?

না। ওর সুমতি হয়েছে। শীলার মতো সচ্চরিত্রা সরল মেয়েকে ভগবান রক্ষা করবেন না—এ হয় নাকি?

অনর্গল কথা বলতে বলতে অরুণ পথ হাঁটছিল। ইটখোলার কাছে এসে

বলল, কী কাণ্ড! আমি তোমার সঙ্গে ফিরে আসছি যে! দেখছ? মাথাটা গোলমাল হয়ে গেছে। যাই—একবার তোমার ছোটমার ওখানে। কর্তব্য তো আছে একটা। তুমি গিয়ে ঘুমোওগে—যা গরম পড়েছে! ফ্যানটা সেরে এনেছি ছাগ গে। আরাম পাবে।

অরুণ চলে গেল।

রাহুল বন্ধ দরজায় কড়া নাড়লে শীলা লাল চোখে দরজা খুলে দিয়েই রাহুলের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। বোঝা গেল, ওখানেই সে ঘুমোচ্ছিল এতক্ষণ। ফ্যানটা জোরে ঘুরছে টুলের ওপর। কাত হয়ে শুল সে। চুলগুলো উড়ে মুখ ঢেকে ওপাশে নেমে যাচ্ছে ঝাঁকেঝাঁকে। কয়েকমুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। মাথাটা ঘুরছে এতক্ষণে। দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। শরীর টলছে। সে ভিতরের দরজাটা বন্ধ দেখল এদিক থেকে। তখন শীলার পাশে গিয়ে বসে পড়ল। ডাকল, শীলা!

শীলা সাড়া দিল না দেখে সে তার বুকের উপর ঝুঁকে ফের ডাকল, শীলা কি সত্যি ঘুমুচ্ছ?

উঁ?

খবরটা শুনেছ?

হুঁ।

তোমার কি খুব ঘুম পাচ্ছে?

হুঁ।

কী মুসকিল! দিনদুপুরে এত ঘুম কেন?···রাহুল ওর কাঁধে হাত রাখল। ···শীলা, আমিও ঘুমুবো। রোদে ঘুরে ভীষণ ক্লান্তি লাগছে।

শীলার সাড়া না পেয়ে সে ঘরের ভিতরটা দেখে নিয়ে ফের বলল, একটা মাদুরটাদুর নেই এ ঘরে?

শীলা জড়ানো স্বরে বলল, শোও না এখানে।···তারপর একটু সরল সে।

রাহুল বলল, শীলা, আমরা স্বামী-স্ত্রী নই। ওঘরে বউদি আছেন। নেত্য আছে।

শীলা তবু চুপ।

রাহুল একটু হেসে বলল, শীলা, আরও খবর আছে। অরুণদা এইমাত্র বলল, সানুর দাদাও তোমার সঙ্গে সানুর বিয়েতে খুব উৎসাহী হয়েছে। অরুণদ

ভারি খুসি। এ বেচারাকে যে কথাটা দিয়ে বসেছিল, তা ভুলেই গেছে। কাজেই, এভাবে তোমার পাশে শোওয়া যায় না। আগুন ধরে যাবে শীলা।

শীলা বিরক্তভাবে আগের মতো জড়ানো ভারি গলায় বলল, জানি বাবা জানি। বড্ড বকতে পারো। শোও চুপচাপ।

রাহুল একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার জলতেষ্টা পেয়েছে। জিভ থেকে বুক অব্দি শুকনো লাগছে। একটু জল খাওয়াতে পারো?

শীলা সামান্য ঘুরল। চোখ খুলল না। ঠোঁটে নিশ্চুপ হাসির আভাষ ধরা পড়ছিল। সে দুহাত বাড়িয়ে রাহুলের গলাটা জড়াল। তারপর ওর মুখটা নিজের মুখের কাছে টেনে নিল। ঠোঁটে ঠোঁট রেখে ফিস ফিস করে বলল, জলতেষ্টা—না, অন্য কিছু?

রাহুলের কিছু ভাল লাগছিল না। শীলার নিশ্বাসের গন্ধ, তার বুকের চাপ—অনিবার্য যৌনতার আক্রমণ—অথচ রক্ত যেন জমাট হয়ে গেছে শরীরে। তার মনে হল, এখন এসব অশোভন—ভারি অসঙ্গত। প্রস্তুতিহীন আকস্মিক উপদ্রব। কিন্তু একটা গভীরতর ভিন্ন প্রকৃতির আবেগ তার বুকের মধ্যে আস্তে আস্তে দুলে উঠেছে। শান্তির আশ্রয়ের জন্যে আত্মা মাথা কুটতে সুরু করেছে। শূন্যতার জ্বালা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে কোন কঠিন মাটি—যে মাটিতে ছায়া আছে, তার পক্ষে কাম্য হয়ে উঠেছে। আর সেই প্রবলতম কামনা তার মুখটা শীলার ঠোঁট থেকে শীলার বুকের দিকে নিয়ে গেল। ব্লাউজের বোতামটা হিংস্রহাতে খুলে ফেলে সে তার দুটি কুমারী স্তনের মধ্যে শিশুর মতো মাথা ঘষতে থাকল।

কতক্ষণ পরে শীলা চমকে উঠেছে। দুহাতে রাহুলের মুখটা তুলে ধরে সে দেখল, এই দুর্দান্ত তরুণ খুনী যেন কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর নিষ্ঠুর আঘাতে রক্তাক্ত—কারণ তার চোখ এবং গালে ওই ভিজে ছোপগুলো অশ্রু বলে মনে হল না শীলার—সেগুলো হয়তো রক্তই।

শীলা শুধু বলতে চাইল—আমি আছি। তার চোখের ভাষায় ধরা পড়ছিল ওই কথাদুটো। টেবিলফ্যানটা উদ্দাম ঘরঘর ঘূর্ণীর একটানা শব্দে নিঃঝুম দুপুর বেলাটাকে কী একটা অর্থপূর্ণ সুরে ভরিয়ে দিচ্ছিল।

দুজনে পরস্পরকে অশেষ প্রত্যাশায় আঁকড়ে ধরে রইল।

দশ

সেই দুপুরেই ওরা ঠিক করে ছিল—দুজনেই চলে যাবে ময়নাচক থেকে। সানুর সঙ্গে জরুরি কথাটা সেরে ফিরে আসবে রাহুল। শুয়ে পড়বে সকাল সকাল। রাত গভীর হবে। অরুণ দেরীতে ঘুমোয় বলে শীলা অপেক্ষা করবে। তারপর এ ঘরে চলে আসবে। দুজনে বেরিয়ে পড়বে। পথে যেতে যেতে কোথাও না কোথাও ট্রাকে একটা লিফ্‌ট পেয়ে যাবে। রাহুলের কাছে টাকা নেই—শীলার কিছু আছে। আপাতত ওতেই বেথুয়াডহরি পৌছন যায়। পৌছতে পারলে একটা ব্যবস্থা হবেই।

সানু এল ঠিক সন্ধ্যায়। মুখটা গম্ভীর। একটু অবাক হয়েছিল রাহুল। কিন্তু পরে ভাবল, হয়তো দু দুটো সোনার ডিমদেওয়া হাঁস হাত ছাড়া হয়ে বেচারা মনমরা হয়ে গেছে। সে পায়ে হেঁটে এসেছিল। বলল, এস।

রাহুল তৈরী হয়ে অপেক্ষা করছিল। কী কথা বলবে তাকে সানু? হয়তো হাইওয়ের রাহাজানি—কিংবা অরুণের বামাল সামলানো নিয়ে কোন নতুন তথ্য। হয়তো সে তাকে দলে টানবে। রাহুলের মন চঞ্চল। সে হাতড়াচ্ছিল।

অবশ্য সে যখন চলেই যাচ্ছে এখান থেকে, তখন ওইসব কথা শোনার জন্যে সানুর সঙ্গে যাওয়াটা অনর্থক। রাহুল টের পেল—কৌতূহল আর চাঞ্চল্যটার উৎস হয়ত অন্যখানে। শীলার সম্পর্কে কি কিছু বলবে সানু? হ্যাঁ—সেটাই জেনে রাখা খুব জরুরী মনে হচ্ছে। নিরাপদ ভবিষ্যত নিয়ে ময়নাচক থেকে শীলার সঙ্গে চলে যাওয়া দরকার। তা না হলে আবার হয়তো জড়িয়ে পড়বে বিশৃংখলায়—রক্তে হিংসায় জিঘাংসায়।

রাহুল বেরুল। আকাশে নবমীর চাঁদ। ধুলো মাখানো স্তিমিত জ্যোৎস্না —আলো আছে অথচ সব ছায়াময় মনে হয়। পথে কথা বলছিল না সানু। রাহুল জিগ্যেস করল, কোথায় যাচ্ছি সানুদা?

সানু জবাব দিল, বেশিদূরে নয়। মাঠের দিকে।

ব্যাপারটা কী বলবেন তো?

ইনটারেসটিং। তোমার 'টিপস্‌টা এনেছ তো?'

রাহুল দাঁড়াল।···কিন্তু ওটা কী হবে?

সানু তার হাত ধরে টানল।···নিরস্ত্র বেরোতে নেই।

ফের কিছুদূর চুপচাপ হাঁটল দুজনে। হাইওয়েতে উঠে ব্রীজ যেদিকে—তার উল্টো দিকে চলতে থাকল সানু। তারপর বলল, রাহুল, তোমার মালকাল খাওয়া অভ্যেস নেই?

রাহুল বলল, তেমন না। সামান্য।

আজ আমরা মাল খাবো।

আমার বমি হয়ে যায়, সানুদা। থাক্ গে।

পাগল! জমবেই না তাহলে।···সানু আবগারী দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।···দিশি না—বিলিতিই। মদনটা বিলিতিও রাখে লুকিয়ে। সব শালা চোরের রাজত্ব হে। ওয়েট—আমি আসছি।

রাহুল একটু চিন্তিত হল। ঝোঁকের বসে বেশি খেয়ে ফেললে রাতের প্রোগ্রামটা ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া শীলার পক্ষে সহনীয় না হতেও পারে। মেয়েরা নাকি খুনীর সঙ্গে শুতে ভয় পায় না—মাতালকে ভয় পায়। খুনীর চেয়ে মাতালকেই ঘেন্না করে বেশি।

প্রকাশ্যে বোতলটা দোলাতে দোলাতে নিয়ে এল সানু। অন্য হাতে দুটো মাটির ভাঁড়, একটা ঠোঙায় কিছু চাট। বলল, তুমি আমার চেয়ে বয়সে ছোট—শালা এ্যাদ্দিন বিয়ে করলে তোমার মতো দু-দশটা ছেলের বাবা হতুম। তবু তুমি আমার পেয়ারের ইয়ার। অনেকদিন থেকে ইচ্ছে ছিল, তোমাকে নিয়ে একটু ফুর্তি করি। হচ্ছিল না। চলো।···

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল রাহুল। খামখেয়ালি সানুর আসলে মনটা কেমন দমে গেছে—তাই মৌজ করতে চায়। এটা স্বাভাবিকও। গঙ্গার বীভৎস লাসটা দেখার পর বেচারা মুষড়ে পড়েছে। রাহুল দেখলে, সেও মুষড়ে পড়ত।

কিছুদূরে হেঁটে বাঁদিকে আগাছার জঙ্গলে ভরা পোড়া জমিতে নামল সানু। রাহুল তাকে অনুসরণ করল। জায়গায়-জায়গায় বেশ ফাঁকা আছে। একটা কাছিমের খোলের মতো ডাঙা জমি। অজস্র ফণিমনসা আর কেয়াঝোঁপ। ফাঁকা জায়গাগুলোতে কোথাও শুকনো কিছু ঘাস, কোথাও খোলা শক্ত মাটি জ্যোৎস্নায় চকচক করছে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে এদিক-ওদিক ঘুরে জায়গা পছন্দ করল সানু। তারপর একখানে বসে বলল, এখানটাই ভালো। অল্পস্বল্প ঘাস আছে—পাছা আরাম পাবে।

আরাম করে বসে সে দাঁত দিয়ে ছিপি খুলল। ভাঁড় দুটো ভরতি করল।

তারপর বিনাভূমিকায় একটা ভাঁড় তুলে, ইসারায় রাহুলকেও নিতে বলে, সে অস্ফুটকণ্ঠে উচ্চারণ করল—'চিয়ারস!' গিলে ফেলল মদটুকু। বিকৃত মুখে বলল, র খাওয়াই ভালো। জল মেশালে ব্যথা বাজে।...আরে, কী হল?

রাহুল ভাঁড়টা হাতে নিয়ে ভাবছিল। এবার চোখ বুজে গলায় ঢেলে দিতেই হু হু করে জ্বলে উঠল বুক অব্দি। দম আটকে যাবার উপক্রম হল। কাসতে কাসতে চোখে জল এসে গেল তার। তারপর হাসতে লাগল।

ভালো না?...সানু বলল সিগ্রেট জ্বেলে। তার পায়ের কাছে ছুটো চারমিনারের প্যাকেট পড়ে আছে।...নাও, সিগ্রেট খাও। মৌজ আসবে।

রাহুল নীরবে সিগ্রেট নিল। ঠোঙা থেকে ভিজে ছোলা তুলে মুখে দিয়ে সিগ্রেট জ্বালল সে। বাতাস বইছিল—কখনও দমকে-দমকে, কখনও মৃদু। সামান্য দূরে গাছপালা আর আশেপাশে ঝোপঝাড়গুলো দুলছিল। সাদা কেয়াপাতার বড় ঝাড় রহস্যময় ভঙ্গীতে কাঁপছিল—চকচক করছিল।

সানু বলল, আমি খুব বেশি খাইনে আজকাল। একসময় ভীষণ খেতুম। পরে ভেবে দেখলুম, রাজ্যের লোক স্ফূর্তি করতে পায় না। গরীবগুরবো ছোঁক ছোঁক করে বেড়াচ্ছে চাদ্দিকে—শালা এ কোন দেশে বাস করছি! ওদের জন্য একটা কিছু করা দরকার।

রাহুল সকৌতুকে বলল, কী করলেন শেষ অব্দি?

সানু বোতল থেকে ফের ভাঁড় ভরে নিয়ে বলল, হল কই? নানান ঝামেলা আমার। জানো? বরাবর ইচ্ছে ছিল, গরীবের ভালো করব। ওদের হয়ে লড়ব। দরকার হলে দাদার সঙ্গে যুঝব। ধুস! কী সব গোলমাল হয়ে গেল।

রাহুল বলল, সে কি একা আপনার বলে সম্ভব সানুদা? পার্টি করতে হয় তাহলে।

মদটা গিলে সানু খোত খোত করে উঠল—মুতে দাও! ছ্যার ছ্যার করে পেচ্ছাপ করে দাও। সব চেনা আছে। সব নীরেন চ্যাটা'র দলে। চ্যাটা! কী পদবীখানা দিলুম দেখছ?

রাহুল আর খেতে পারবে না। ওইটুকুতেই তার মাথাটা চনমন করছে। উত্তেজনা অনুভব করছে সে। ভাবছিল, কীভাবে এড়ানো যায়। কিন্তু সানু সেদিকে তৎপর। তার শূন্য ভাঁড়টা ভরে দিয়ে বলল, হাত চালাও। মৌজ না এলে কিস্যু হবে না। ব্রেন খোলতাই করো আগে। নাও, হাত ওঠাও।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে ফের গিলতে হল। ক্ষিপ্রহাতে ছোলা তুলে চিবুতে থাকল সে। এত তেঁতো বিস্বাদ জিনিস খেয়ে মানুষ কী স্ফূর্তি পায়! কিন্তু

ততক্ষণে মদের কাজ অল্প অল্প শুরু হয়ে গেছে। সে ভাবল, আজ কী পরিপূর্ণ আনন্দের দিন তার। শীলার সঙ্গে সে চলে যাবে। শীলা আছে তার। আর এই তুখোড় আশাবাদী লোভী সানু চ্যাটারজি বুককপাল চাপড়ে হয়তো কাঁদবে। রাহুল খিকখিক করে হেসে উঠল। বলল, সানুদা, মাগীটাকে দেখেছিলে নাকি?

সানু বলল, কোন মাগী?

মুক্তকেশীর খানকিটাকে?

হ্যাঁঃ। তবে কষ্ট হল বড্ড। আমি শালা কত খুনখারাপি করেছি—তবে মেয়েমানুষ মারিনি কখনো। তোমার দিব্যি। দরকারই হয়নি। কোন শালী তো সানু চ্যাটারজির সঙ্গে একহাত লড়তে আসেনি—তাই।

ফের ঢকঢক করে মদ গিলল সে। রাহুল বলল, যদি আসত কেউ?

সানু হাসল।...এলে? এলে বুক পেতে দিতুম। নে—নে, এ বাঞ্চোৎ হৃদয়খানা তুলে নে এক খাবলায়। মাইরি রাহুল, ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই মেয়েমানুষ। ঔঃ! এ বেষ্ট্ প্রোডাকসান অফ্ নেচার। এই রাহুলচন্দ্র, কখনও মেয়েমানুষ চেখে দেখেছিস রে?

রাহুল বলল, হ্যাঁঃ।

কেমন লাগে?...সানুর কুতকুতে চোখদুটো জ্যোৎস্নায় চকচক করল।

ভালো?

শুধু ভালো?...সে ফের মদ ঢালল। গিলে নিয়ে বলল, আঃ। কে যেন বলেছিল রে—ফ্রায়েলটি! দাই নেম ইজ মেয়েমানুষ।

রাহুল ঝোঁকের বশে তার খালি ভাঁড়টা এগিয়ে বলল, দিন।

খা। আজ তুই শালা আমার জানের দোস্ত।

রাহুল বলল, তো দোস্ত ভি কভি কভি দুষমন বন্ যাতা হ্যায়।

সানু ওর দিকে তাকাল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল, জরুর।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর সে সিগ্রেট ধরাল। সশব্দে থুথু ফেলল। রাহুল বলল, শীলার সঙ্গে আপনার বিয়ে কবে হচ্ছে?

সানু জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে মদ খেল। ঢুলতে থাকল।

রাহুল বলল, সানুদা।

হুঁঃ।

আপনার দাদাও তো এতে রাজী। অরুণদা বলছিল।

সানু কোন জবাব দিল না। ফের মদ গিলল। থুথু ফেলল বিকৃত মুখে। রাহুল একটু অস্বস্তি বোধ করল। বলল, হঠাৎ কী হল? সানুদা।

হুঁঃ।

বিয়েটা কবে হচ্ছে?

কার বিয়ে?

বারে! আপনার।

সানুর জবাব নেই। সে ঘাড় ঘুরিয়ে যেন চাঁদ দেখল একবার। তারপর ধাবমান ঘোড়ার মতো মুখ উঁচু করে রইল কিছুক্ষণ। যেন দম নিচ্ছিল। ঝাকড়-মাকড় চুলগুলো কপাল থেকে সরিয়ে সে ফের মদ ঢালল। খেল। থুথু ফেলল যথারীতি। তারপর প্যাণ্টের বেল্টটা সামান্য ঢিলে করে জড়ানো স্বরে বলল, টিপসটা এঁটে বসেছে। খুলে রাখি।

কালো রিভলবারটা বের করে পাশে রাখল সে। পা ছড়িয়ে বসল। দেখা-দেখি রাহুলও নিজের অস্ত্রটা বের করে পাশে রাখল। এতক্ষণে কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল তার। অস্বস্তিটা দূর করতে অনিচ্ছাসত্ত্বে সে নিজের হাতে ভাঁড়টা ভরে নিল। দেখল বোতলটা প্রায় তলায় ঠেকে গেছে। মদটুকু গিলে সে সিগ্রেট জেলে বলল, অভ্যেস নেই। বেশ নেশা হয়ে গেছে।

সানু বলল, দাঁড়াতে পারবি তো?

রাহুল অবাক হয়ে বলল, কেন? এক্ষুনি তো ফিরছি না। নেশা ছুটলে তখন।

উঁহু। ছাখ্‌ দিকি, দাঁড়াতে পারছিস্‌ নাকি?

ধেৎ! কেন?

আবে শালা। যা বলছি, কর।

এই সানুদা, গাল দেবেন না মাইরি। আমার রাগ চড়ে যাবে।

চড়ুক না বে মাগীমুখো বেহদ্দ। ওঠ্‌, ছাখ্‌, পায়ে জোর আছে নাকি।

রাহুল হো হো করে হেসে উঠল।...খুব জোর আছে। কেন, শুনি?

আবে শালা, লড়াই দিতে পারবি নাকি ছাখ। উঠে দাঁড়া।

নির্ঘাৎ মাতালের কাণ্ড। রাহুল উঠে দাঁড়াল। সে টলছিল। বেশ নেশা হয়ে গেছে। সবকিছু টলমল করছে। জ্যোৎস্না যেন কুয়াশায় ঢেকে গেছে। সবকিছু থেকে যেন সংযোগ হারিয়ে ফেলেছে সে। সানুকে মনে হল অনেক দূরের মানুষ। সে বলল, এই তো দাঁড়ালুম।

অস্তর নে।

হেঁট হয়ে সকৌতুকে খিকখিক করে হেসে রিভলবারটা নিল সে। তারপর বলল, নিলুম। লড়াইটা হবে কার সঙ্গে?

সানু বলল, সবুর। লেট মি সি মাই পজিসান।···বলে সে তার অস্ত্রটা হাতে নিয়ে সামনে দাঁড়াল। দুলতে থাকল গরিলার মতো। চোখ দুটো চকচক করে উঠল তার। শ্বাসপ্রশ্বাস পড়তে থাকল সশব্দে। সে বলল, ইয়েস। ওক্কে। আই অ্যাম ফিট।···বুকে থাপ্পাড় মেরে সে চাপা গর্জাল ফের। ···ইয়েস, মাই নেম ইজ সানু চ্যাটারজি—দা সান অফ দা ডেভিল অফ ময়নাচক। আমি···আমি কে? যম—যমদূত। আমি সানু চ্যাটারজি। আমার উরুতে পাইপগানের গুলি লেগেছিল। আমার কাঁধে ছুরি মেরেছিল। হজম করেছি। আমি দা সন অফ দা ডেভিল—সানু চ্যাটারজি এই ময়নাচকে যাকে বলেছি, ওঠ, সে উঠেছে। যাকে বলেছি বস্—সে···যাঃ শালা! কী বলছিলুম! হ্যাঁ—সানু চ্যাটারজি বলছিল। কাকে বলছিলুম? বহরমপুরের এক শালা পুঁচকে—খানকি-বাচ্চাকে!

রাহুল ক্ষেপে গিয়ে বলল, এই শালা সানুদা! চুপ। যা তা বললে ভাল হবে না।

আবে চোওপ শালা!···বাঁ হাত তুলে সে বলল।······প্রিন্স অফ ময়নাচক ইজ ষ্ট্যাণ্ডিং বিফোর ইউ। হুঁ-সি-য়ার! তুমি বিল্লিকা বাচ্চা—হুঁ—হুঁসিয়ার থাকবে।

রাহুল বলল, মাতলামি করলে আমি চলে যাব কিন্তু।

সানু বলল, না—তুই যাবি না। আই সে—সানু চ্যাটারজি বলছে তোর যাওয়া হবে না। নেভার—কভি নেহী। তোর বাবা এসেছিল এখেনে—যেতে পারেনি। তুইও পারবিনে।

সানুদা, এই মাতলামি করার জন্যে ডেকে নিয়ে এলে?

মাতলামি? নো—নেভার। ডুয়েল লড়বার জন্যে। ইয়েস—কাম অন।

কী হচ্ছে! আমি চলে যাচ্ছি।···বলে রাহুল পা বাড়াল। একটু ঘুরল সে।

সানু লাফ দিয়ে সামনে এসে বলল, খবর্দার। তুই লড়বি। তোর হাতের টিপস আছে। আর আমার হাতেও···উ? কী আছে বললুম। এই খানকি-বাচ্চা, কী আছে রে? হুঁ—আমার হাতেও এই টিপস্ আছে। দোনো হাম অটোমেটিক। আও—কাম অন।

রাহুল ঘেমে উঠল। কেন এমন করছে সানু? রাহুলেরও নেশা হয়েছে খুব—কিন্তু সে প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সচেতন রাখছিল। তার দম আটকে আসছিল। তবু সে মাথা ঠাণ্ডা রেখে সানুকে সামলানোর চেষ্টা করল। বলল,

আঃ দাদা! প্লীজ—কেলেঙ্কারী করবেন না। রাস্তার এত কাছে, কে কী ভাববে।

নো-ওপ্! তুমি খানকির বাচ্চা—তুমি আমার প্রাণের শীলাকে নষ্ট করেছ। তুমি তাকে বুকের ওপর ফেলে চুমো খেয়েছ। ইয়েস—ইউ······

রাহুল চমকে উঠে বলল, ছিঃ, কি বলছেন? চলুন—বাড়ি চলুন সানুদা। আপনার শরীর ঠিক নেই।

শাট আপ্। গর্জে উঠল সানু।···গঙ্গা আমাকে কাল রাত্তিরে বলেছে সব। তোর মরা বাপের মরা ছেনাল মাগ বলেছে। তুই শীলাকে ইয়ে করেছিস।

না—না!·· রাহুল অস্ফুট চিৎকার করল।

আলবৎ করেছিস। শীলা আমার বউ—তুই তাকে রেপ করেছিস। গঙ্গা বলেছে।

রাগে উত্তেজনায় রাহুল বলল, আমি যাচ্ছি। মাঠে একলা নাচানাচি করুন।

সে পা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সানু তার পায়ে লাথি মেরে বলল, যাবি কোথায় হারামীর বাচ্ছা! আয়—ডুয়েল লড়। সানু চ্যাটারজি কাপুরুষের মতো তোর জান নিতে চায় না। কাম অন। তিন গোনার সঙ্গে সঙ্গে—

রাহুল পড়ে গিয়েছিল। উঠে দাঁড়িয়ে সে মুখোমুখি হল সানুর। সানু পিছিয়ে গিয়ে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে। রিভলবারটা তুলে তাক করে রয়েছে। সেই সময় অদূরে হাইওয়েতে গাড়ির শব্দ হল। শব্দটা হঠাৎ ফুরিয়ে গেল। মুহূর্তে রাহুলের চোখ খুলে গেল। ময়নাচকে তার আসল শত্রু—ভীষণতম প্রতিদ্বন্দী শক্তি এতদিনে গর্ত থেকে বেরিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আশ্চর্য, এতদিন এটা বুঝতে এত ভুল হয়েছিল তার। এত দেরী লাগল! কিন্তু আর কিছু করার নেই। সে থরথর কেঁপে উঠল। কান্নাভরা ভাঙা গলায় বলল, সানুদা—সানুদা! আমাকে ক্ষমা করুন। আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি ময়নাচক ছেড়ে। প্লীজ—

সানু বলল, নো। ভয় হচ্ছে? রক্ত জল হয়ে যাচ্ছে? ওরে শালা মাগীর হদ্দ কাপুরুষ! এই তোর বড়াই বুজরুকি? গিদ্ধড়! লজ্জা করে না? থুঃ—ওয়াক থুঃ!

রাহুল বুঝতে পারল, সনু তাকে তাতাচ্ছে। বুঝতে পেরেও তার রক্তকে সে থামাতে পারল না।

থু থু থু! ···সানু থুথু ছুঁড়ে মারল তার দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে রাহুল রিভলবার তুলে বলল, কাম অন বাস্টার্ড! কাউন্ট—ওয়ান ···টু···

হঠাৎ একটা বিস্ফোরণের শব্দ হল। পর মুহূর্তে রাহুল আচ্ছন্ন চোখে দেখল সামনের দিকে টলে পড়ে গেল সানু। যেন দুবার ঝাঁকুনি খেয়েই তার দেহটা স্থির হয়ে গেল।

মানুষের মনের অতলে যে আত্মরক্ষার সহজাত বোধ আছে—তা পলকে তাকে বলে দিয়েছে যে সে ট্রিগার টেপেনি—অথচ সানুর গুলি লাগল, এবং সে ঘাড় ঘোরাতেই ডাইনে কেয়াঝোপের সামনে অস্পষ্ট একটা মূর্তি দেখতে পেল। অমনি মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল সে।

এটুকু ঘটতে অবশ্য কয়েকটা সেকেণ্ড লেগেছে। রাহুল বুকে হেঁটে চকিতে বাঁপাশের ঝোপে গিয়ে ঢুকে পড়ল। তারপর দেখল মূর্তিটা হন হন করে চলতে সুরু করেছে। দৌড়েছে সে লাফ দিয়ে দুতিনটে ঝোপ ডিঙিয়ে একটা ঝোপের আড়াল থেকে লক্ষ্য করল। লোকটা মাত্র বিশহাত দূরে দ্রুত হাঁটছে। মণিশঙ্কর ? সে তো অসম্ভব। মণিশঙ্কর পুলিশের হাজতে। তবে কে এই আততায়ী ? নন্দ ? হতেই পারে না। তাছাড়া নন্দর শরীর ছোটখাটো। তাহলে ময়নাচকে সানুর কি কোন শত্রু ছিল—যাকে রাহুল চেনে না ?

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল সে। পিছনে ঘুরে দেখল সে জ্যোৎস্নার মাঠে কাটা গাছের মতো সানু পড়ে আছে নিস্পন্দ। হঠাৎ দুঃখে রাগে জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়ল সে। মনে হল, সানু নয়—নিজেই পড়ে আছে রাহুল। আর সামনের কেয়াঝোপের কাছে গিয়ে লোকটার দিকে রিভলবার তাক করল সে। ট্রিগার টিপল।

এ কি ! আজ ভোরে গুলি ছুঁড়েছিল অরুণের ঘরের জানালা দিয়ে। অথচ এখন কোন শব্দ হল না। ট্রিগারটা নড়ল না একটুও। আঙুলের চাপে গুলির কেসটা সরিয়ে ফের ট্রিগারে চাপ দিল। কোন শব্দই হল না।

ক্রমান্বয়ে ছটি কেসই ঘোরাল। ট্রিগার নড়ল না। দর দর করে ঘামতে থাকলে সে। কাল রাতের মতো এও কি তবে স্বপ্ন দেখছে ? কাঁপতে কাঁপতে রাহুল দেশলাই জ্বালল। দূরে লোকটা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে জ্যোৎস্নার গভীরে।

দেখল ট্রিগার ভাঙা—নিচের দিক থ্যাঁতলানো। কে তার অজানতে অস্ত্রটা বরবাদ করে রেখেছে। কে সে ?

না—সানুও না, এই কাজ যার—সেই তার প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী—জঘন্য শত্রু। ময়নাচকে সারাক্ষণ সে অদৃশ্য থেকে অনুসরণ করেছে। আর শক্তিকে গোপনে থেকে অবশ করে দিয়েছে। তার সব হননেচ্ছাকে তিলে তিলে বিনষ্ট করে

ফেলেছে শেষে নিরস্ত্র করে ফেলেছে পুরোপুরি। হ্যাঁ—তার নাম শীলা। আঃ শীলা, তুমি জানো না, কী করেছ!

রাগে দুঃখে মাথার চুল খামচে ধরল সে। অকেজো রিভলবারটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। সানুর রিভলবারটা এখনও পড়ে রয়েছে তার লাসের কাছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে সে আড়ষ্ট পায়ে এগিয়ে গেল।

উবুড় হয়ে পড়ে আছে সানু চ্যাটারজির নিস্পন্দ দেহটা। জ্যোৎস্নার রাত্রে নির্জন মাঠে একটা দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা। রাহুল চঞ্চল হয়ে উঠল। তাকে এক্ষুনি এখান থেকে পালাতে হবে। যে লোকটা একে খুন করে পালিয়ে গেল, তার ফাঁদের মুখে সে এখন রীতিমত বিপন্ন। সানুর শক্তিমান রিভলবারটা দ্রুত কুড়িয়ে নিল রাহুল। তার চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। নিরুচ্চার একটি প্রতিজ্ঞার কঠিনতা তাকে গ্রাস করল সঙ্গে সঙ্গে।

রাহুল চলতে চলতে দেখল, নেশা কেটে গেছে। পা টলছে না আর। হাইওয়ে ডিঙিয়ে ওদিকে মাঠে সে চলার গতি বাড়িয়ে দিল ক্রমশঃ।

অরুণের ইটখোলায় পৌঁছে মাথা ঠাণ্ডা করে নিল সে। অরুণের আদরের কুকুরটা একবার ডেকেই চুপ করে গেল। বাইরের ঘরের দরজা খোলা। অরুণ একা বসে কী লিখছে নিবিষ্টমনে। রাহুলের পায়ের শব্দে ঘুরে বলল, কোথায় গিয়েছিলে? কখন থেকে তোমার অপেক্ষা করছি। শীলার কাছে শুনে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলুম—সানুটা একটা জানোয়ার। তার পাল্লায় পড়লে তো···

রাহুল বসে পড়েছিল। বাধা দিয়ে শান্তভাবে বলল, আচ্ছা অরুণদা, সানুর সঙ্গে তার দাদা নীরেন চ্যাটারজির সম্পর্ক কেমন?

অরুণ বলল, কেন? সানু কিছু বলেছিল বুঝি?

রাহুল বলল, আমার কথার জবাব দাও আগে।

অরুণ একটু ভেবে নিয়ে বলল, বাইরে-বাইরে সম্পর্ক ভালই। নীরেনবাবু তার জোরেই তো এখানে রাজত্ব করেন। কিন্তু আমার ধারণা, ভিতরে ওদের পারিবারিক কী সব ভজকট আছে। সানু প্রায়ই আমাকে বলে যে নীরেনবাবু তাকে বঞ্চিত করতে চায়। বিশেষ করে নীরেনবাবুর বউ নাকি এ ব্যাপারে খুব উৎসাহী।

রাহুল বলল, অরুণদা, সানুকে তোমাদের নীরেনবাবু খুন করেছে।

অরুণ চমকে উঠল। ফ্যালফ্যাল করে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলল, যাঃ!

হ্যাঁ। এইমাত্র সানুকে সে খুন করে পালিয়েছে।···রাহুল বিকৃত মুখে বলতে থাকল।···সানু আমাকে নিয়ে মাঠে গিয়েছিল। আমার চোখের সামনে

তাকে তার দাদা গুলি করে পালাল। আমি কিচ্ছু করতে পারলুম না। আমার রিভলবারটা কে অকেজো করে রেখেছে, জানতাম না। অরুণদা, আমি সত্যি পাগল হয়ে যাব।

অরুণ হন্তদন্ত হয়ে বলল, বল কী! সর্বনাশ! রাহুল নীরেনবাবুর পক্ষে অসম্ভব কাজ কিছু নেই জানি। কিন্তু......আশ্চর্য, এ যে অবিশ্বাস্য কাণ্ড!

রাহুল বলল, সান্নুর লাসটা এখনও পড়ে আছে মাঠে। একটা কিছু করা দরকার অরুণদা। হয়তো নীরেন চ্যাটারজি আমাকেই এতক্ষণ খুনী সাজিয়ে ফেলেছে। কারণ, আমার সঙ্গে সান্নুকে সন্ধ্যায় অনেকেই যেতে দেখেছে।

অরুণ গুম হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, ঠিকই বলেছ। একটা কিছু করা দরকার।

তারপর অরুণ উঠে দাঁড়ালো।...আমার মনে হয়, এক্ষুনি থানায় খবর দেওয়া দরকার। ওদের সব খুলে বলাই ভালো। তুমি তো মূল সাক্ষী। একটু দেরী হলেই সব উল্টে যাবে। চলো, এক্ষুনি দুজনে বেরিয়ে পড়ি।

রাহুল বলল, হয়তো আমাদের আগেই নীরেন চ্যাটারজি থানায় চলে গেছে। আমাকে খুনি বানিয়ে ফেলেছে।

অরুণ বলল, তবু দেখা যাক না। ওঠ।

শীলা পর্দা তুলে ঢুকল। বলল, না—ওকে নিয়ে যেও না দাদা। তুমি একা যাও।

অরুণ অবাক হয়ে বলল, তুই কেমন করে জানলি শীলা?

শীলা বলল, আমি ওঘর থেকে সব শুনছিলুম। তুমি বরং একা গিয়ে খবর নাও।

অরুণ উদ্বিগ্নমুখে বেরিয়ে গেল।

শীলা রাহুলের সামনে এসে বলল, সান্নু তোমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল রাহুলদা?

রাহুল মুখ নামিয়ে বসেছিল। বলল, তার আগে বল তো শীলা, কেন তুমি আমার রিভলবারটা ভেঙেছ?

শীলা ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, তার জন্যে তুমি কি রাগ করেছ আমার ওপর?

রাহুল মুখ তুলে বলল, তুমি জানো না শীলা, কী করেছ!

শীলা একটু হাসল।...নিজের শক্তিটাই বড় শক্তি রাহুলদা। এতদিন মনে হত, অস্ত্রশস্ত্র হাতে না থাকলে এযুগে বাঁচা যায় না। এখন বুঝতে পারি,

আসল শক্তি অন্য জায়গায় থাকে। মানুষের মনে। যাকগে—ও নিয়ে ভেবোনা।

রাহুল হাসল।···না, ভাবিনি। কারণ আরেকটা রিভলবার আমি পেয়ে গেছি। সানুরটা। এ লাইনের নিয়মই এই, শীলা।

শীলা চমকে উঠল!···কেন ওর রিভলবার তুমি নিলে? এক্ষুনি ফেলে দিয়ে এসো। তোমার ঘেন্না করল না একটুও? ছিঃ!

রাহুল রিভলবারটা বের করে চুমু খেয়ে বলল. কে জানে! সানুকে আমি ঘেন্না করতুম, না ভালবাসতুম। হয়তো ভালই বাসতুম। তা না হলে মাঠে আজ ডেকে নিয়ে যখন ও আমাকে ডুয়েল লড়তে ডাকল, কেন ওর ডাকে সাড়া দিতে পারছিলুম না? টের পাচ্ছিলুম, ময়নাচকে আমার সেই একমাত্র ভীষণ প্রতিদ্বন্দী—তবু আমার হাত উঠছিল না। ওকে এত অসহায় মনে হচ্ছিল। হতভাগ্য সানু চ্যাটারজি!

শীলা অস্ফুটকণ্ঠে বলল, সানু তোমাকে ডুয়েল লড়তে ডেকেছিল? কেন?

রাহুল বলল, কারণ আমি নাকি তার বাগদত্তা বউকে নষ্ট করেছি!

শীলা মুখ ঘুরিয়ে বলল, ইতর! ছোটলোক!

কিন্তু তুমি তো আজ বেঁচে গেছ, শীলা! আর তো তোমাকে এখান থেকে কোথাও পালাতে হবে না। দিব্যি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারবে।

কে জানে!···শীলা অস্ফুটকণ্ঠে বলল।

শীলার কণ্ঠস্বর শুনে রাহুল চমকাল। বলল, কেন শীলা?

হঠাৎ শীলা উঠে দাঁড়াল। রাহুলের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, ছাখ, আমার মনে হচ্ছে—এক্ষুনি তোমার কী বিপদ ঘটে যেতে পারে। তোমার এখানে বসে থাকা ঠিক নয় রাহুলদা। হয়তো এক্ষুনি পুলিশ এসে পড়বে তোমাকে ধরতে। চলো, বাইরে কোথাও গিয়ে বসবে। তারপর শিগগির একটা কিছু ঠিক করে ফেলব আমরা। রাহুলদা, আর সময় নেই। ওঠ।

রাহুল বলল, অরুণদা ফিরে আসুক না।

শীলা তার হাত ধরে টানল।···না। আর একটুও দেরী নয়। চলো।

দুজনে বেরিয়ে গেল। দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল শীলা। ইটখোলার ভিতর দিকে হাঁটতে লাগল পাশাপাশি। রাহুল একটু অবাক হয়েছিল শীলার আচরণে। কিন্তু কোন কথা বলল না। জঙ্গলের ভিতরে স্তূপীকৃত ইটের মধ্যে সাবধানে ওরা এগোচ্ছিল। হাওয়া বইছিল উদ্দাম। জ্যোৎস্নায় দূরের মাঠ আর এই জঙ্গলটা রহস্যময় আর ষড়যন্ত্রসংকুল দেখাচ্ছিল।

একটা খোলা জায়গায় ঘাসের ওপর দুজনে গিয়ে বসল। কতক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। দূরের রাস্তা থেকে ভারি ট্রাক চলে যাওয়ার আবছা শব্দ ভেসে আসছে। শনশন করে ঝোপঝাড় আর গাছপালা দুলছে। শীলা আরও কাছে সরে এল। রাহুল অবাক হয়ে দেখল সে নিঃশব্দে কাঁদছে। রাহুল ওকে বুকের ওপর টেনে নিয়ে বলল, শীলা, কী হল তোমার?

শীলা ভাঙ্গা স্বরে ওর বুকে মুখ গুঁজে বলল, আমার বড্ড ভয় করছে রাহুলদা। মনে হচ্ছে সব স্বপ্ন আমার মিথ্যে হয়ে যাবে।

রাহুল বলল, কেন মিথ্যে হবে? আমি তো সানুকে খুন করিনি। তুমি দেখে নিও, সে-পাপ আমাকে লাগবে না।

শীলা চোখ মুছে বলল, একটা কথা রাখবে আমার?

বলো।

সানুর পিস্তলটা তুমি এক্ষুনি ফেলে দাও। তারপর······

তারপর?

চলো, এক্ষুনি আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই।

পালিয়ে যাবো? কার ভয়ে?

নীরেনবাবু তোমাকে ছাড়বে না রাহুলদা! নিজের মাথা বাঁচাতে সে তোমার ওপরই সব চাপিয়ে দেবে। এ আমি স্পষ্ট টের পাচ্ছি।

রাহুল একটু ভেবে বলল, হয়তো তাই। কিন্তু তা যদি হয়, তাহলে পালিয়ে গিয়েই বা কেমন করে বাঁচব? পুলিশ আমাকে খুঁজে বের করবেই। তার চেয়ে এটার মুখোমুখি দাঁড়ানো ভালো।

শীলা ব্যাকুলভাবে বলে উঠল, না না। চলো কোথাও পালিয়ে যাই আমরা—অনেক দূরে। যেখানে কেউ আমাদের চিনবে না।

রাহুল দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, যেতে পারতুম। কিন্তু আমার রক্তে কী আছে যেন শীলা। মনে হচ্ছে সানু মরে গিয়ে ফের আরেকদফা হারের মুখে ঠেলে দিয়েছে আমাকে। তাছাড়া, যেজন্যে এসেছিলুম, তা তো চুকিয়ে ফেলতে পারিনি এখনও। নীরেন চ্যাটারজি এখনও বেঁচে আছে। না শীলা, আমার কাজ শেষ হয়নি।···

সে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল।···শীলা, তুমি অপেক্ষা করো। এখান থেকে চলে আমরা যাবই। কিন্তু তার আগে শেষ কাজটা চুকিয়ে নিতে দাও।

শীলা তার হাত ধরে টানল। চেঁচিয়ে উঠল, না না। রাহুলদা, তুমি যেও না। আমার কথা শোনো—রাহুলদা!

রাহুল হনহন করে চলে গেল। তাকে একটা ভয়ঙ্কর রক্তলিপ্সু বাঘের মতো দেখাল সেই নির্জন জ্যোৎস্না রাতে। গাছপালার আড়লে সে লাফাতে লাফাতে চলে যাচ্ছে চরম শিকারের দিকে। শীলা ঘাসের ওপর স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল। এ এক দুঃস্বপ্নের রাত যেন।

রাহুল যে তার কথা রাখল না, সেই দুঃখ শীলাকে ক্রমশ নিঃসাড় করে ফেলছিল। কতক্ষণ পরে সে উঠে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে ফিরে এল ঘরে। করুণা তার পায়ের শব্দে ধুড়মুড় করে উঠে বসল। শীলাকে দেখে সে চাপা গলায় বলল, কী হয়েছে রে শীলু? কোথায় গিয়েছিলি তোরা? তখন থেকে কী সব হচ্ছে, একটুও বুঝতে পারছিনে!

শীলা আর নিজেকে থামিয়ে রাখতে পারল না। তার কাছে গিয়ে হুহু করে কেঁদে ফেলল।

করুণা অবাক।

এগার

সানুদের বাড়ির উত্তরে বাগানটার ভিতর ঢুকে পড়েছিল রাহুল। বাগানের পর সেই পুকুর। পুকুরের পাড় ধরে বারান্দা ও চত্বরওলা ঘাটের কাছে পৌঁছল সে। নির্জনতা থমথম করছে চারদিকে। এই চত্বরে বসে একদিন সানুর সঙ্গে গল্প করেছিল সে। চত্বরের শেষে দেয়ালে দরজার মাথায় টিমটিমে বাল্‌ব জ্বলছে। কেমন করে বাড়িতে ঢুকবে ভেবে পেল না সে। নীরেন চ্যাটারজিই বা কোথায় আছে এখন—তাও তার জানা নেই। কিন্তু সে আজ মরীয়া। রক্ত চঞ্চল হয়েছে খুনের নেশায়। তার সামনে এতটুকু বাধা সে আর সইতে রাজী নয়। যদি এখন শীলাও তাকে আটকাতে আসে, সে তাকে গুলি করতে দ্বিধা করবে না। একটা খর ক্রোধের ঝড় তার মাথার ভিতর বইতে স্বরু করেছে।

না—এদিক থেকে বাড়ি ঢোকা যাবে না। প্রথমে দরকার কোথায় নীরেন আছে, সেই খবরটা জানা। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। তা না হলে অনর্থ বিপদে পড়ে যাবে, উদ্দেশ্য মোটেও সিদ্ধ হবে না।

ডাইনে ঘুরে বাড়ির একপ্রান্ত ধরে চলতে থাকল সে। এদিকটা ফুল-

বাগিচা। অজস্র দেশিবিদেশি ফুলের গাছ আর ঝোপঝাড় রয়েছে। শিকারী প্রাণীর মতো সাবধানে এগোচ্ছিল সে। সামনের দিকে লনের কাছে যেখানে গাড়িবারান্দা, তার পিছনে একটা প্রকাণ্ড বুগানভিলিয়ার ঝাড় রয়েছে। পা টিপেটিপে তার ভিতর গিয়ে ঢুকল সে। ওখান থেকে সদর ঘরটা পুরো দেখা যায়।

ঘরের দরজা বন্ধ। বারান্দায় মৃদু আলো। হাওয়ায় পর্দা সরে যেতেই রাহুল দেখল ঘরের ভিতর কোন লোক নেই। গাড়িবারান্দায় নীরেন চ্যাটারজির জীপটাও দেখা যাচ্ছে না। সব নিস্পন্দ আর নির্জন। রাহুল ভাবল, বোকামি হচ্ছে। নীরেন কখন দেখা দিবে, সেই আশায় বসে থাকার কোন মানে হয় না। সে একটা চান্স মাত্র। তার চেয়ে সোজা এগিয়ে খোঁজ নেওয়া ভালো। সৎভাইকে শেষ করে এসে নিশ্চিন্ত নীরেন নিশ্চয় বিশ্রাম নিচ্ছে।

রাহুল আস্তে আস্তে বেরোল। বারান্দায় উঠল। একটু ইতস্তত করল। প্রকাণ্ড সেকেলে দরজার কপাট। কড়া নাড়লে শুনতে পাবে কি না কে জানে!

সে জোরে কড়া নাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজাটা। সেদিনের সেই লোকটাই বেরিয়ে এসে বলল, কাকে চাই?

নীরেনবাবুকে।

লোকটা রাহুলের পা থেকে মাথা অব্দি দেখে নিয়ে বলল, আপনাকে চেনাচেনা মনে হচ্ছে। কোথায় থাকেন বলুন তো? বাইরে-টাইরে? কোন গাঁয়ে বাড়ি?

রাহুল সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, নীরেনবাবু আছেন?

লোকটা কেমন গম্ভীর। মাথা নেড়ে বলল, না। একটু আগে বেরিয়েছেন। তাছাড়া রাত দশটায় কারো সঙ্গে উনি দেখা করেন না। সকালে আসবেন। অবশ্যি, কাল সকালেও ওঁর সঙ্গে দেখা হবে কি না জানিনে। একটা বিপদ হয়ে গেছে। সেই নিয়ে উনি ভীষণ ব্যস্ত।

রাহুল নিষ্পলক তাকিয়ে বলল, বিপদ? কী বিপদ?

লোকটা যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল, কেন শোনেন নি? খানিক আগে দানুবাবু খুন হয়েছেন! আপনি বরং পরশু-টরশু একবার চেষ্টা করবেন। চাকরী-বাকরীর ব্যাপার তো? পরে আসবেন—ওঁর মাথার ঠিক নেই এখন।

দরজা বন্ধ করে দিল সে। রাহুল বুঝতে পারল, জননেতার বাড়ির এই

লোকটা তাকে চাকরীপ্রত্যাশী ভেবেছে। এলাকার বেকার যুবকেরা এভাবে নীরনের কাছে যখন তখন এসে ধরনা দেয়, সে জানে।

গেটে দারোয়ান যথারীতি বসে রয়েছে। গেটটা সামান্য খোলা আছে। রাহুল বেরিয়ে গেলেও সে গা করল না। এটাই রেওয়াজ আছে এ বাড়িতে—দারোয়ানও সেটা জানে। তাই কে ঢুকল বা বেরোল এবং কে না ঢুকেও বেরোল তার মতো, দারোয়ানের তাতে কোন মাথাব্যথা নেই।

এত রাতে হাইওয়েতেও নির্জনতা ছমছম করছে। বাজারের দিকেও লোকজন কদাচিৎ চোখে পড়েছে। ব্যর্থতার ক্ষোভে রাহুল কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে হাঁটল। এ কাজে সময়ের দরকার হবে কিছুটা—সে বুঝতে পারছিল। এখন নীরেন চ্যাটারজিকে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। হয়তো এতক্ষণ পুলিশের সঙ্গে সেই মাঠে সানুর লাসের কাছে হাজির হয়েছে সে।

হঠাৎ চমকে উঠল রাহুল। কিন্তু সানুকে যে খুন করল, সে সত্যি কি নীরেন চ্যাটারজি? স্পষ্ট তো রাহুল ছাখেনি! এ তার নিতান্ত অনুমান। একটা ধারণা আরোপ করা মাত্র। সেই আততায়ী নীরেন না হতেও তো পারে!

না হতেও পারে? তবে কে সে? সানুকে খুন করার উদ্দেশ্য কী তার?

এমন তো হতে পারে যে সানুর আরও কোন ভীষণ শত্রু ছিল, অনেক ব্যাপার ছিল সানুর জীবনে—যা রাহুল আজও জানে না· বা জানা সম্ভব নয়! রাহুল কতদিনই বা এখানে এসেছে! কতটুকু জানে সানুর? হয়তো কেউ তক্কে তক্কে ছিল—আজ সুযোগ পেয়ে সানুকে খুন করে বসল।

রাহুল একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে কথাটা ভাবল। যত ভাবল, নীরেন চ্যাটারজির ওপর থেকে তার সন্দেহটা সরে গেল ক্রমশ। একথা তো ঠিকই যে আততায়ীকে সে মোটেই চিনতে পারে নি।

রাগ পড়ে গেল নীরেনের ওপর থেকে। অন্তত সানুর হত্যাকারী হিসেবে নীরেনকে সে আর গণ্য করতে পারছে না। অথচ রাজেনবাবু তাকে ময়নাচকে পাঠিয়েছিলেন যে উদ্দেশ্যে, সেদিক থেকে দেখতে গেলে নীরেনকে তার খতম করতে হয়। আবার গঙ্গার কথা মনে পড়ে গেল রাহুলের। তার বাবার কথা মনে পড়ল।

সময় দরকার। একটা সিদ্ধান্তে পৌছতেই হবে তাকে। রাহুল আবার অরুণের বাড়ির দিকে চলল। শীলা তার কাণ্ড দেখে এবার হয়তো হাসবে।……

অরুণ ততক্ষণে ফিরেছে। বাইরের ঘরে শীলা আর সে বসে আছে। রাহুল অবাক হয়ে দেখল ওরা সত্যি হাসাহাসি করছে। ব্যাপার কী? এই পরিস্থিতিতে ওরা অমনভাবে হাসতে পারছে! রাহুল ঘরে ঢোকামাত্র অরুণের হাসিটা বেড়ে গেল। শীলাও হেসে উঠল। তারপর বলল, আজ সান্নুর সঙ্গে বুঝি খুব নেশাটেশা করা হয়েছিল রাহুলদা?

রাহুল বলল, তার মানে?

অরুণ হাসতে হাসতে বলল, যাঃ! কোন মানে হয় না।

শীলা বলল, রাহুলদা এরপর খুনখারাপি আর লাস ছাড়া কিছু দেখবে না। তারপর জ্যোৎস্নার রাত—ফাঁকা মাঠ—কল্পনার রাশ ছাড়তে অসুবিধে কিসের?

রাহুল প্রায় গর্জে উঠল—কী? হয়েছে কী অরুণদা?

অরুণ হাত তুলে বলল, রোস রোস হে শ্রীমান! আগে ব্যাপারটা শোন।

রাহুল বলল, তাড়াতাড়ি বলুন—কী হল! থানায় গিয়েছিলেন?

অরুণ বলল, ফেট্! থানায় যাব কী? সান্নু মলে তো থানায় যাব? ভাগ্যিস—

বাধা দিয়ে রাহুল বলল, সান্নু মরেনি?

অরুণ হেসে বলল, ও শালা মরে? ওর মরণ নেই হে! বুলেটপ্রুফ শরীর শালার।

তার মানে?

গোড়া থেকে বলি শোন।...অরুণ সিগ্রেট ধরিয়ে আরামে টান দিয়ে বলল।...হন্তদন্ত ছুটে যাচ্ছি—এমন সময় দেখি রাস্তায় শালা সান্নু টলতে টলতে আসছে। পরিষ্কার চাঁদের আলো। দেখেই চিনে ফেললুম। দৌড়ে গিয়ে বললুম, সান্নু, তুমি বেঁচে আছ? সান্নু বলল, বেঁচে থাকব না মানে? ..জোর মাতলামি সুরু করল ও। সেই ফাঁকে প্রশ্ন করে করে যা জানলুম, তা হচ্ছে এই: সান্নু তোমার দিকে পিস্তল তুলেছিল। ঘোড়াও টিপেছিল। কিন্তু—আমার যা ধারণা, চরম উত্তেজনায় সান্নু সেই মুহূর্তেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে। আমি ভাবছি, ভাগ্যিস গুলিটা তোমাকে লাগেনি। তারপর জ্ঞান হলে সে উঠে ত্যাখে, একা পড়ে আছে। সান্নু বলল, নির্ঘাৎ আমার রিভলবারটা নিয়ে পালিয়েছে রাহুল।

শীলা রাহুলের দিকে চোখ টিপল।

রাহুল বলল, কিন্তু আমি যে আরেকজনকে দেখেছিলুম! সে ওর দিকে তাক করে দাঁড়িয়েছিল। তারপর দৌড়ে পালিয়ে গেল!

অরুণ বলল ভুল দেখেছ হে। না—লোক একজন দেখেছ, সেটা ভুল নয়। কিন্তু সে বেচারা নিরীহ ভীতু টাইপের লোক। তার সঙ্গে একটু পরেই দেখা হল। তিনি হচ্ছেন আমাদের পাঠশালার পণ্ডিতমশাই চারু চক্কোত্তি। বেচারা পায়খানা করতে গিয়েছিলেন ওখানটায়। ওটা ওঁর প্রতিরাতের অভ্যাস। হঠাৎ গিয়ে পড়ে তোমাদের রণংদেহি মূর্তি দেখে উনি থ। যেই সানুর পিস্তল থেকে গুলির আওয়াজ হওয়া, অমনি উনি কাছাখোলা অবস্থায় ভোঁ দৌড়। সবই আকস্মিক যোগাযোগ।

রাহুল বলল, কিন্তু আমি যে…

ফেট্ ফেট্। সব তুমি নেশার ঘোরে দেখে ইচ্ছেমতো ভেবে নিয়েছ। আমি শুধু ভাবছি—একবার সানুকে আর পরীক্ষা করেও দেখলে না! সঙ্গে সঙ্গে তুমিও দৌড় লাগালে। এত বোকা আর ভীতু তুমি তো ছিলে না ভাই রাহুল!

অরুণ হাসতে লাগল। শীলা বলল, খবরদার রাহুলদা কক্ষনো আর ওসব ছাইপাঁশ আর গিলবে না কিন্তু। তোমার সঙ্গে আড়ি হয়ে যাবে।

রাহুল গুম হয়ে বসে রইল। অরুণ বলল, মাতালটাকে তো ঠেলেঠুলে বাড়ি পাঠিয়ে দিলুম। না—পাঠিয়ে নয়, একেবারে নিজে গিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে এলুম গেটের মধ্যে। সেখানে ভজহরি বাবুর সঙ্গে দেখা। সে তো সানুকে দেখে হাঁ। কারণ ইতিমধ্যে চারু পণ্ডিতমশাই দৌড়ে এসে ওদের খবর দিয়ে গেছেন যে সানুকে মাঠে কে এইমাত্র খুন করে ফেলেছে। চারুবাবুও তোমার মতো ভুল দেখেছিলেন তো! তিনি ভেবেছিলেন, তুমিই বুঝি সানুকে খুন করলে। অবশ্যি তোমাকে উনি চিনতে পারেন নি। দিন হলেও চিনতে পারতেন না অবশ্য। যাই হোক খবর শুনে নীরেনবাবুরা দৌড়ে মাঠে গিয়ে হাজির। কিন্তু সানুর লাস তাঁরা পেলেন না। হন্তদন্ত সব ফিরেছেন—নীরেনবাবু, পণ্ডিতমশাই, আর সব পাড়ার লোকজন। আমি সানুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে এসে ওঁদের সঙ্গে দেখা। সব বললুম। তখন হাসির ধুম পড়ে গেল। পণ্ডিতমশায়ের কাঁপুনি থামল। বাপ্‌স!—একটু থেমে অরুণ বলল, অবশ্যি সানুর সঙ্গে তুমিই মাঠে ছিলে—তা আমি বলিনি। যাক্ গে, শোন। সানুর সঙ্গে আর মিশোনা। ওকে কিচ্ছু বিশ্বাস নেই। আর এক কাজ করো—ক'দিন বেরিওনা কোথাও। খাও-দাও ঘুমোও—নয়তো আমার সঙ্গে ইটখোলায় আড্ডা দাও। শীলু, খেতে দে রে। ক্ষিদে পেয়েছে।

অরুণ উঠে চলে গেল ভিতরে। শীলা একটু পরে উঠল। রাহুল লক্ষ্য করল. তার মুখটা এবার কেমন গম্ভীর দেখাচ্ছে। সানু বেঁচে আছে বলে?

শেষ রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল রাহুলের।

জানালাগুলো খোলা থাকায় বাইরের জ্যোৎস্না থেকে সামান্য আলোর আভাস ঘরের ভিতরে। রাহুল দেখল, শীলা তার পাশে বসে তাকে ঠেলছে। রাহুল চাপাগলায় বলল, কী ব্যাপার ?

শীলা মুখ নামিয়ে বলল, চলো—বেরোই। রাত শেষ হয়ে এল যে।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে রাহুল বলল, কোথায় ?

বা রে! কী কথা ছিল আমাদের ? আমি তৈরী। দেরী করো না—ওঠ।

সব মনে পড়ে গেল রাহুলের। হ্যাঁ, শীলার সঙ্গে তার ময়নাচক ছেড়ে আজ চলে যাবার কথা আছে। সানু মরেনি—ওর মৃত্যু নেই। ও বেঁচে থাকতে শীলাকে নিয়ে সে সুখে থাকতে পারবে না এখানে। রাহুল সাবধানে উঠে বসল। তারপর বলল, আচ্ছা শীলা, যদি আমরা অরুণদাকে বলেই যাই, তার নিশ্চয় আপত্তি হবে না।

পাগল! ··শীলা ফিসফিস করে উঠল।···দাদা যে বিপদে পড়ে যাবে সানুর হাতে। দাদা কক্ষনো যেতে দেবে না আমাকে।

কিন্তু অরুণদা যে সত্যি বিপদে পড়ে যাবেন!

তাতে আমার কী ?

এ মুহূর্তে শীলাকে কেমন স্বার্থপর মনে হল রাহুলের। সে চলে গেলে অরুণ নির্ঘাৎ সানুর খপ্পরে পড়ে যাবে। সানু হয়তো ভাবে অরুণই এদের সরিয়ে দিয়েছে। রাহুল খুব দ্বিধায় পড়ে গেল।

তাকে চুপ দেখে শীলা বলল, তাহলে তুমি থাকো—আমিই যাই।

রাহুল কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। সে শীলাকে জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নিল। চুমু খেল শান্তভাবে। শীলা বাধা দিল না। কিছুক্ষণ আচ্ছন্নের মতো পড়ে রইল দুজনে। তারপর নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে শীলা বলল, দেরী হয়ে যাচ্ছে। আমাকে যেতে দাও।

রাহুল শুধু বলল, কেন যাবে ?

দাদাকে তুমি এখনও চেনো না। ওকে আর আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। গতিক বুঝলে দাদা সানুর ঘাড়ে আমাকে ঝুলিয়ে দিতে একটুও দ্বিধা করবে না।

রাহুল ভাবছিল, সেটা মিথ্যে নয়। অরুণ খুব দুর্বলচেতা ভীতু লোক। তার পক্ষে সেটা সম্ভব! কিন্তু এমনি করে চোরের মত পালিয়ে যাবে তাই বলে ?

শীলা উঠে দাঁড়াল। রাহুল দেখল, সে একেবারে তৈরী। মেঝে থেকে একটা স্যুটকেস তুলে নিচ্ছে শীলা।

রাহুল এবার উঠল। দেয়ালের হুক থেকে ব্যাগটা তুলে নিল। বালিশের নিচে থেকে সান্নুর রিভলবারটাও নিল, পকেটে রাখল। বাবার বাকসোগুলো নেওয়া যাবে না। থাক। কী হবে!

সাবধানে শীলা বাইরের দরজাটা খুলল। প্রথমে সেই রেরোল। বাইরের জ্যোৎস্না ভোরের আলোয় ফিকে হয়ে গেছে—ধূসর অন্যরকম আলোয় পৃথিবী এখন স্পষ্টতর। কাককোকিল ডাকতে সুরু করেছে চারপাশে। রাতের উদ্দাম হাওয়াটা থেমে গেছে।

হঠাৎ অস্ফুট শব্দ করে পিছিয়ে এল শীলা। ঢিবির নিচে থেকে একটা বিশাল শরীর টলতে টলতে উঠে আসছে সামনে। লাল চোখ—বিশৃংখল শার্টের নীচেটা প্যান্টের উপর বেরিয়ে পড়েছে খানিক—বোতাম খোলা, খালি পা, উস্কোখুস্কো ঝাঁকড়া চুল, অসম্ভব একটা মানুষ! কয়েকমুহূর্ত তাকে যেন চিনতেই পারছিল না শীলা।

রাহুল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

সান্নু চ্যাটারজি পাগলের মতো হেসে উঠল—হা হা হা হা।

রাহুল আর এক মুহূর্ত ইতস্তত করল না। পকেট থেকে রিভলবারটা ক্ষিপ্রহাতে বের করল। তারপর ট্রিগারে চাপ দিল। একবার···দুবার···তিনবার।

সান্নু চ্যাটারজি গড়াতে গড়াতে ঢিবির নীচে ইটের পাঁজার ওপর গিয়ে স্থির হল। এতক্ষণে সেই ডুয়েলটা একতরফা সমাপ্ত হল। এবার সত্যি সত্যি মারা পড়ল হতভাগ্য সান্নু চ্যাটারজি। তার হাতের টিপে রাতের প্রথমদিকে ব্যর্থ হলে রাহুলই মরে যেত। হয়তো এর নামই ভাগ্য।

রাহুল শীলার হাত ধরে টানল। শীলা পুতুলের মতো পা বাড়াল। প্রচণ্ড নির্ঘোষে অরুণের ঘুম ভাঙলো কিনা টের পাবার আগেই ওরা হাঁটতে শুরু করেছে। দ্রুত হেঁটে চলল দুজনে। হাইওয়েতে পৌঁছে দুজনে পরস্পরের দিকে তাকাল। তারপর হাঁটতে থাকল। পিছনে একটা ট্রাক আসছে। রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে হাত তুলতেই সেটা থামল। ট্রাকগুলো এমনি করে বাড়তি পয়সা কামাতে অভ্যস্ত। ড্রাইভারটা শুধু প্রশ্ন করল, কোথায় যাবেন?

রাহুল একটু হেসে জবাব দিল, আপাতত রেলেষ্টেশন অব্দি।

ট্রাকটা ভোরের হাইওয়েতে প্রচণ্ড গর্জন করে ছুটে চলল। দিগন্তে তখন লাল সূর্যটা ডিমের কুসুমের মতো আকাশ ফাটিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।···

ষ্টেশনে পৌঁছতে সেই সূর্যের রঙ বদলাল। হালকা রোদ্দুর ছড়াল চারদিকে। একটা বেঞ্চে বসে ওরা চা খেতে থাকল। রাহুল একবার চাপা গলায় বলল, শীলা, ভয় করছে না তো আর ?

শীলা মাথা দোলাল। একটু হাসলও।

এবার তাহলে সামনে পড়ে আছে একটা অন্যরকম জীবন। তার কথাই শীলা ভাবছিল। আপাতত বেথুয়াডহরিতেই যাবার মতলব—তারপর···

হঠাৎ রাহুল বলল, শীলা, তোমার সিঁথিটা শূন্য থাকা আর ঠিক নয়। কে কী ভেবে বসবে। বসো, আসছি।

শীলা পরিচ্ছন্ন হেসে বলল, বেশ তো। নিয়ে এসো না সিঁদুর। কিন্তু এখন পাবে কোথায় শুনি ?

ওপাশে তো সব দোকান রয়েছে। দেখি, বলে রাহুল উঠে গেল।

ট্রেনের এখনও সামান্য কিছু দেরী আছে। একটু উৎকণ্ঠা অবশ্যই রয়ে গেছে। যত তাড়াতাড়ি ট্রেনটা আসে তত মঙ্গল। শীলার মনে শুধু সেই আসন্ন ট্রেনের চাকার শব্দ—দূর থেকে কাছে প্রতিধ্বনিময়। একটা আপ কিংবা ডাউন যেকোন ট্রেনের জন্যে শীলা এখন জীবন বিকিয়ে দিতেও রাজী। সেই ক্রমাগত ট্রেনের সঙ্গীতময় ধ্বনিপুঞ্জ তার কানে স্পষ্টতর হচ্ছে।···

শীলা চায়ের ভাঁড়টা ফেলে দিয়ে পাশের ছোট্ট বাজারটার দিকে তাকাল। সবে দোকানপাট খুলতে শুরু করেছে। রিকশোর জটলা বাড়ছে। সকালের ট্রেনের যাত্রীরা ভিড় জমাচ্ছে একটি দুটি করে। খুব বড় ষ্টেশন নয়। কিন্তু এখনও রাহুল ফিরছে না কেন ? শীলা একটু এগোল।

রাস্তায় গিয়ে সে খুঁজল রাহুলকে। তারপর চমকে উঠল। ও কী ! রাহুল ওদিকে কোথায় যাচ্ছে ? ছোট্ট বাজারের পরে বিশাল একটা মাঠের সুরু। সেই মাঠের দিকে চষা জমির ওপর দ্রুত হেঁটে চলেছে রাহুল !

কয়েকমুহূর্তের জন্যে সারা শরীর অবশ হয়ে পড়েছিল শীলার। জিভ ব্লটিং পেপারের মতো খসখসে হয়ে গেল। তারপর নিজেকে সামলে নিল সে। ঠোঁটে দাঁত কামড়ে নিষ্পলক তাকিয়ে দেখতে লাগল রাহুল চলে যাচ্ছে। ভণ্ড, মিথ্যুক, প্রতারক কোথাকার ! সিঁদুর কেনার ছল করে তুমি পালিয়ে গেলে ! শুকনো চোখ ফেটে জল এল এবার।

একবার ইচ্ছে হল দৌড়ে গিয়ে ওকে ধরে ফেলে—সামনাসামনি দাঁড়িয়ে কিছু বলে। কিন্তু পরক্ষণেই জানল, ওকে আর ধরা যাবে না। নির্জন প্রসারিত শূন্যে মাঠের বুকে এতক্ষণে ওই মানুষটার সত্যিকার চেহারা ফুটে উঠেছে।

ওর নাগাল পেতে শীলার মতো মেয়েকে আরও কতবার জন্মাতে আর মরতে হবে।

সিগনাল পড়ে গেছে ওদিকে। ষ্টেশনে হল্লা বেড়েছে। শীলা চঞ্চল হল। ময়নাচকে আর ফিরবেনা সে। অনেকদিন পরে যেন রাহুল এসে তাকে একটা মুক্তির স্বাদ দিয়ে গেছে। বেথুয়াডহরির সেই অনেক স্মৃতিতে ভরা সংসারটা আজ শূন্য আর নির্জন হলেও মনের ভিতর হাতছানি দিচ্ছিল। একটা দুঃস্বপ্নের মতো ময়নাচকের ভয়ঙ্কর জীবন থেকে সে সদ্য জেগে উঠেছে।

টিকিটের কাউণ্টারের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল শীলা। আঃ, কতদিন ছেলেবেলার স্বপ্নেভরা বেথুয়াডহরি তার যাওয়া হয় নি! ····

রাহুল অনেকখানি হেঁটে একবার দাঁড়াল। পিছন ফিরে ষ্টেশনটা দেখে নিল। শীলা দুঃখ পাবে। সে জানে। কিন্তু উপায় ছিল না। ময়নাচক থেকে এতখানি পথ সে মনে মনে তোলপাড় হয়েছে। শীলাকে কি সত্যি ভালবাসে? শীলাকে নিয়ে জীবন কাটালে কি সুখী হবে? কিসে তার সুখ—কাকে সে ভালবাসে, তা খুঁজে পাচ্ছিল না।

ষ্টেশনে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয়েছিল, কোথাও একটা গুরুতর ভুল করা হচ্ছে। তার মন বলছিল, না—না, ওদিকে নয়, ওখানে নয়। তার জীবনের শেষ কথা এই পালিয়ে গিয়ে ঘরবাঁধা নয়। অন্য কিছু।

তাছাড়া, এখন তার সরকারী পরিচয়—শুধু মাত্র খুনী। আজই ভোরে সে ময়নাচকে সানু চ্যাটারজি নামে একটা লোককে তারই রিভলবারে গুলি করে মেরেছে। সানুর দাদা নীরেন চ্যাটারজি প্রখ্যাত লোক—প্রভাবশালী। পুলিশ রাহুলকে রেহাই দেবে না। একসময় তাকে খুঁজে বের করবেই—তারপর কাঠগড়ায় হাজির করে দেবে বিচারকের সামনে। যাবজ্জীবন জেল কিংবা ফাঁসি হবে। তখন বেচারা শীলা আরও বেশি কষ্ট পাবে। জেলখাটা বা ফাঁসিযাওয়াদের বউ হওয়া শীলার মতো শিক্ষিতা ভদ্র মেয়ের পক্ষে ভারি অশোভন। সে তাকে হয়তো সত্যিসত্যি গভীরভাবে ভালবেসেছিল, তার কাঁধে ওই কুশ্রী জীবনটা চাপিয়ে দেবার অধিকার রাহুলের নেই।

রাহুল একটু হাসল। মনে মনে বলল, শীলা, সুখে থাকো। স্বচ্ছন্দে থাকো। আমার জীবনটা আমার থাক, তোমারটা তোমার। দুটোকে নিজের নিজের ছন্দে বয়ে যেতে দাও।

সে তীক্ষ্নদৃষ্টে শীলাকে খুঁজছিল অতদূর থেকে। দেখতে পেল না। ভেবে-ছিল, শীলা দৌড়ে আসবে। এলে রাহুল কী করত ?…কী করতে তুমি, রাহুল ? নিজেকে প্রশ্ন করে জোরে হেসে উঠল সে। তারপর রিভলবারটা বের করে শূন্যে নাচাতে নাচাতে পা বাড়াল। দিগন্ত-বিস্তৃত অসমতল মাঠের বুকে সোজা হাঁটতে থাকল। সামনের গ্রামে গিয়ে নিজের গ্রামটার পথ জিগ্যেস করে নিতে হবে তাকে। এখন তার সারা শরীরে শুধু গভীর তৃষ্ণা—প্রান্তপ্রবাহিনী গঙ্গার কালো জলে সে-তৃষ্ণা মেটাবে রাহুল। সে গঙ্গাও মুক্তকেশী—একদিন সেও ছিল পরম কামনার সুখদুঃখে ভরা।

তারপর ? সেই কালো জলে রিভলবারটা ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

তারপর যাবে সে বহরমপুরে রাজেনবাবুর কাছে। সোজাসুজি বলবে, একটা কবিতা শুনুন স্যার।

> অবশেষে এল সেই ঘাতক……
> শান্ত রুগ্ন ভীতু ছন্নছাড়া প্রেমিক
> শূন্য নগ্ন হাত ভিখারির প্রার্থনায় জড়োসড়ো
> রুক্ষ চুলে কামনার দুঃখগুলি হাওয়ার মতন মৃদু কাঁপে
> কামনার সুখগুলি শুধু দুটি চোখে জ্বলজ্বল করে……

